মলয়ালম একাঙ্ক গুচ্ছ

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

মলয়ালম একাঙ্কগুচ্ছ

সম্পাদক

ড. কে. রাঘবন পিল্লা

অনুবাদ

নিলীনা আব্রাহাম

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

1990 (শক 1912)

মূল্য : **20.00 টাকা**
Original Title : MALAYALA EKANKA SAMAHARAM
(Malayalam)
Bengali Translation : MALAYALAM EKANKOGUCHCHHO
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016
কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচী

ভূমিকা

একই অঙ্কে সমাপ্ত হয় এমন নাটক হল একাঙ্ক। কিন্তু কোন নাটকের এক অঙ্ককে পৃথক করে নিলে তা একাঙ্ক হয় না। প্রয়োজনীয় মুখসন্ধি, দ্বন্দ্ব ও পরিণতির সঙ্গে একই অঙ্কের সীমায় লক্ষণ ও অনুভূতিজন্যতায় পূর্ণতা প্রাপ্ত নাটককেই একাঙ্ক বলা হয়। প্রতিটি একাঙ্ক নাটক বনশাই গাছের মত। টব ইত্যাদিতে ছোট মাপে লাগানো সেই গাছ বড় বৃক্ষের মত সমান পূর্ণ ও ফলদায়ক হয়। যখন কয়েক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক অনেক চরিত্রের মাধ্যমে, অনেক খাতে প্রবাহিত হয়ে সঙ্গম-ক্রিয়ার দ্বারা সংকীর্ণ পরিণতিকে অনাবৃত করে জীবনের এক বিপুল অংশকে নিজের মুষ্ঠিগত করে নেয়, তখন একাঙ্ক এক পরিমিত খাতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তার মধ্যেও দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তার তীব্রতাও কম হওয়া উচিত নয়।

মলয়ালম সাহিত্যের আধুনিক শাখা উপন্যাস, গল্প এবং নাটকের উৎপত্তি ও ইতিহাস জানার জন্য কিছু ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। একবার কিছু ব্যক্তি এই অভিমত স্বীকারও করে নিয়েছেন। কিন্তু এখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা কিঞ্চিদধিক শিথিল হয়ে গেছে। সংস্কৃতে বিকশিত আখ্যায়িকার রূপ কি অবচেতন মন ছুঁয়ে আমাদের উপন্যাসের উপর প্রভাব ফেলেনি? তেমনি খৃষ্ট-পূর্বের অন্তিম সময়ে জীবিত নাট্যকার ভাস এবং সংস্কৃত-সাহিত্য-নভোমণ্ডলের নিত্য দীপশিখা কালিদাসের রচনাগুলি কি আমাদের নাট্যকারদের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল? আমাদের নাট্যকারদের সৃজনী প্রতিভা বিদেশের মাটিতে শিকড় প্রসারিত করেছিল, এই অভিমত দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা উচিত।

একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে এই চিন্তার দ্বারা ব্যক্ত অবস্থা অর্থপূর্ণ। দশরূপকের মধ্যে ভাণ, ব্যায়োগ, ঈহামৃগ এবং বীথি, কমপক্ষে এই চারটি হল একাঙ্ক। একথা মনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইউরোপীয় নাটকের আদি রূপ মিস্ট্রি নাটক, মিরাকেল্ নাটক এবং মরালিটি নাটক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে হয়েছিল এবং এই সাত-আট শতাব্দীর আগে একাঙ্কসহ নাটক রূপের লক্ষ্য-লক্ষণ ভারতে হয়েছিল। এই দুই বক্তব্য যদি একসঙ্গে চিন্তা করা যায় তাহলে নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশের দিকে অবনত সিদ্ধান্তের পুর্ণমূল্যায়ণ করতে হবে।

তথাপি চিন্তনীয় বিষয় এই যে, নাটকসহ আধুনিক সাহিত্যরূপের পুষ্টি এবং তার রূপভাবের বিকাশে পাশ্চাত্ত্য নাটকের পঠন ও পরিচয় অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। কিছু বিলক্ষণ তত্ত্বচিন্তা অথবা সামাজিক ঘটনাসমূহের কারণে ভারতীয়

ভাবনা নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। তাকে এই পাশ্চাত্ত্য সম্বন্ধ জাগৃত করে স্বর্গোন্মুখ করে তুলেছে, একথা সত্য বটে। তার সঙ্গে এই সম্বন্ধ থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপও পাওয়া গেছে।

মলয়ালম একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস প্রায় মলয়ালম নাটকেরই ইতিহাস। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধিকাংশ নাট্যকার একাঙ্কও লিখেছেন। এই সংগ্রহে সংকলিত একাঙ্কগুলির রচয়িতারা নাটকও লিখেছেন।

এমন প্রত্যয় হয় না যে, রস-প্রাধান্যের আধারে আধুনিক নাটকের নিয়মানুযায়ী বিভাজন করা যাবে। অর্থাৎ পরম্পরাগত নাটক সমীক্ষা অনুসারে শৃঙ্গার রস-প্রধান, বীর রস-প্রধান, হাস্যরস-প্রধান, এই প্রকার সুনির্দিষ্ট বিভাজন করা যায় না। একে তো এগুলি প্রাচ্য নাট্যকারদের নির্দেশানুসারে, সামান্যতম ভেদভাব বিনা রচিত নয়। এর মধ্যে অনেকের রচনায়, যেমন প্রথমে বলা হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য নাটক তার প্রভাব ফেলেছে। সেই নাটকগুলিকে যে নাটকাদর্শ পথ নির্দেশ করেছে তা ছিল ভিন্ন। অতএব আদর্শনিষ্ঠ নায়ক-নায়িকাদের উত্তম চর্যার তরবারির ধারে পতনহীন চালচলন না দেখিয়ে, রক্তমাংসসহ মানব-জীবনকে ভয় দেখাবার মত, পরিভ্রমিত করার মত এবং দ্বেষ করার মত শক্তি ও শক্তি-হীনতার সঙ্গে দৃশ্য প্রদর্শিত করেছে, এ কথা সত্য। অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন ভাব এবং সংঘর্ষের উপর অবস্থিত এবং নির্ধারিত জীবন-সৌরভে যুক্ত শিল্প হল আমাদের একাঙ্ক। রস-প্রাধান্যের দৃষ্টিতে দেখা হলে এগুলি কিছু হাস্যরস-প্রধান, বাকী কিছু প্রধান রস শৃঙ্গার এবং অন্যগুলিতে বীর রস। এই জাতীয় বিভাজন কল্পনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য নাটক মেখলার প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্তগত দর্শনের ভিন্নতা কিঞ্চিদধিক মলয়ালম একাঙ্ক নাটকে (সাধারণতঃ সব নাটকে) দেখা যায়। কিঞ্চিদধিক বলার কারণ, শুদ্ধরূপে এ বস্তু আমাদের নাটকে সর্বত্র দেখা যায় না।

তোপ্পিল ভাসী এবং চেরুকাঁটু'র কিছু একাঙ্ক সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন শীঘ্রাতিশীঘ্র আনার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। কলাশিল্প বিশ্রামের ক্ষণে হৃদয়াহ্লাদকারী হওয়া উচিত—এই নাটকগুলির সজীবতার আধার এই নয়। তাঁরা সমতাসম্পন্ন এক সমাজের সংগঠনে বিশ্বাস রাখেন। ভাসীর নাটকে স্পষ্টরূপে এই বাস্তববাদ দেখা যায়। সংলাপ ও ঘটনাবিকাশের উপস্থাপনায় নাট্যকার বাস্তববাদী ইঙ্গিত প্রয়োগ করেছেন।

ভাসী, চেরুকাঁটু এবং অন্য কয়েকজন নাট্যকার নাটককে বিপ্লবের মশালরূপে বদল করে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে তা তাঁদের নাটকরূপে এক আংশিক চরিত্রই হয়ে গেছে। মরুমক্কত্তায়ম্ (মাতৃপ্রধান উত্তরাধিকার ক্রম) এবং সংযুক্ত আত্মীয় ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বণ্টনে উপনীত কেরলের নায়ার সমাজ এবং

নায়ার গার্হস্থ্যের বিকারোত্তেজক চিত্রণ—ভাসী, চেরুকাঁটু, ইটশ্‌কোরী গোবিন্দন নায়ার প্রভৃতি কিছু একাঙ্কতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ভাসীর 'কুটুম্ববীতম্' (বাড়ীর ভাগ) আর চেরুকাঁটুর 'মুলকুটম্' (বাঁশের ঝাড়) ইত্যাদি একাঙ্ক সুস্পষ্ট করে দেয়, যাকে লোকে কেবলমাত্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন মনে করে, সেই উত্তরাধিকার ক্রমের পরিবর্তন কত বড় ভয়, নির্মমতা, মর্কটমুষ্ঠি ও বিরোধের কাহিনী ছিল। কিছু নাট্যকার প্রতিদিন কষ্ট সহ্যকারী মধ্যম শ্রেণীর কৃষকদের জীবন্ত চিত্রিত করেছেন।

মানব-সম্পর্কের মূল্য নির্ধারণকারী কিছু পূর্ণ নাটক এবং একাঙ্ক মলয়ালমে আছে। এই বিভাগের নাট্যকার 'রিয়েলিস্ট' সংকেতের সাহায্যে জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে চর্মের ভিতরের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে্‌দেন। ইবসেনের অনুকরণ করে এন. কৃষ্ণ পিল্লা যে নাটক লিখেছেন, সেগুলি তার উদাহরণস্বরূপ। এই নাটকগুলির ভাবধারা এই যে, স্নেহবন্ধন ও বাহ্য পারিবারিক সম্পর্ক ঘোর স্বার্থপরতার কোলে আঁকড়ে পড়ে আছে। কৃষ্ণ পিল্লার 'তটবুঁ অটিয়রয়ুঁ' (কারাগার ও পরাজয়) ঐ লক্ষ্য ও ভঙ্গীতে গঠিত একাঙ্ক শিল্প।

কিছু নাট্যকার বিশেষ সুযোগ এবং ঘটনাবলীর মধ্যে নির্বাহ করেছে এমন ব্যক্তির মনোভাব চিত্রিত করেছেন। কে. টি. মুহম্মদের 'ট্যাক্সি' একটি বেতার নাটক। সেই কারণে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না। তথাপি চলন্ত এক ট্যাক্সির পটভূমিকায় সংঘটিত কাহিনী এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ট্যাক্সিড্রাইভারের অতীতকাল ঐ নাটককে অত্যন্ত বিকারোৎপাদক শিল্প করে তুলেছে। এক অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভধারণকারী চাকরাণী, তার জন্য দায়ী মালিকপুত্র এবং মাতা-পিতার প্রতিকরণ ও মনোভাবের চিত্রণ মুহম্মদ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত 'নাইট ট্রেনস্'-এ (রাতের গাড়ী) করেছেন। গর্ভিণী হল বাড়ীর চাকরাণী এবং যুবক গৃহস্বামীর পুত্র। অতএব অর্থ, বংশ-পরম্পরা, নিঃসহায়তা, নীতিবোধ এবং তার অভাব—সব মিলে যাওয়ার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়নি। শেষে ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রক হয়ে এক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, সেই চিত্র মুহম্মদ হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গীতে অনাবৃত করেছেন। এই প্রকার মানসিক বিকার বিশ্লেষণকারী নাটক অপ্রতীক্ষিত ঘটনাসমূহের দর্পণের সাহায্যে হৃদয়ের অন্তঃস্থল এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের প্রকৃত রঙগুলি দেখিয়ে দের।

মানুষের স্থিতি-বিশেষের সম্পর্কে চিন্তা করে পীড়িত জি. শঙ্কর পিল্লা প্রতীকি ভাষায় অনেক নাটক লিখেছেন। উঁচু তলায় দাঁড়িয়ে মানুষের ভাগ্য নিরীক্ষণকারী নাটক হল 'মণলতরিকল' (বালুকণা)। নিজস্ব বিরাট তাত্ত্বিক চিত্রপটের নাটকীয়তা আবিষ্কার করে, প্রতীক ছাড়া যাবতীয় গান ও গায়ক ইত্যাদি গ্রীক নাটকের কথা মনে করায় এমন সংকেতেরও ব্যবহার এই নাট্যকার করেছেন। কাব্যময় ধ্বন্যাত্মক সম্ভাষণ এই নাটকের প্রতীকাত্মকতার বিশেষত্ব।

হাস্যরসের নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা সমস্ত কালেই পেয়ে এসেছে। মানুষের বিবিধ সমস্যা নির্ণয়কারী নাট্যকারেরা ইতিহাসে তাঁরা নতুন অধ্যায় লিখে সংযোজন করবেন এবং মানুষের অবস্থার বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করবেন। তা সত্বেও মনুষ্য নামক জীবটির উচ্চকিত হাসার এবং হাসানোর সামর্থ্য প্রদর্শনকারী নাট্যকার হাসির সাহায্যে চিন্তাভাবনা করান এবং চিন্তার সাহায্যে কখন-কখন কাঁদানও বটে।

মলয়ালম রঙ্গমঞ্চের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন নাট্যকার হাস্যরস-প্রধান একাঙ্ক রচনা করেছেন। জগতী এন. কে. আচারী, আনন্দকুট্টন. বীর রাঘবন নায়ার, তিকেটিয়ান পি. কে. রাজরাজ বর্মা প্রমুখ স্মরণীয়। সুগভীর ভাষায় গৌরবান্বিত হাস্যাত্মকতার সঙ্গে যুক্ত কৈন্নিকরা কুমার পিল্লার কিছু বিশিষ্ট একাঙ্ক। এই নাট্যকার উচ্চকিতভাবে হাসানো ছাড়া আমাদের মুখে স্মিতহাসি ফুটিয়ে তুলেছেন। মলয়ালমের হাস্য-নাট্যকার দুই-তিন প্রকারে নাটকগুলিকে হাস্য-সম্পন্ন করেন। এক—কথাবার্তার হাস্যরসে, দুই—কৌতুক করে এমন চরিত্রের মাধ্যমে এবং তিন—কৌতুক উৎপাদককারী ও আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে।

মুকুলিত, বিকশিত কিন্তু ফলশূন্য—এমন শোকময় প্রেমের নাট্যকার মলয়ালমে আছেন। এই বিভাগের অন্তর্গত একটি নাটক এই সংগ্রহে সংকলিত—গোপীনাথন নায়ারের 'কটত্ত্্কারন্' (মাঝি)। প্রেমের আগুনে দগ্ধ মানুষ জীবনের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটতে হাঁটতে বার্ধক্যের দিকে যাত্রা করে। মুকুলিত সেই প্রেমের অংশীদার নারী এক অবাঞ্ছিত গার্হস্থ্যে চির-অসুস্থা হয়ে প্রেমের জন্য শহীদ হয়ে যায়। শোকাত্মক অন্য এক প্রেম-কাহিনী হল সি. এল. জোসের 'নোম্পরঙ্গল্' (বেদনা) নামক একাঙ্ক। শুধু একটিই ব্যতিক্রম। জোসের সব নাটকের পরিশেষে মানুষের হিতের প্রকাশ উপরে উড়ন্ত দেখা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ অথবা মানবমনের সঙ্গে সম্বন্ধিত সুগভীর আশ্রয় অথবা গভীর দৃষ্টি ব্যতীত মানবহিতের সুদৃঢ় প্রকাশের জন্য জোসের নাটকগুলিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এই ধরণের নাটক বৈপ্লবিক নয়। এই কারণে এগুলি দর্শককে আকৃষ্ট করে বিক্রী ও অভিনয়ের বাজারে বিজয়ী হয়েছে।

মলয়ালম একাঙ্ক নাট্য-ইতিহাসের প্রতিনিধিদের অন্যতম কট্টু্নাট্টু্ কে. রামকৃষ্ণ পিল্লার 'মরকুতিরা'র (কাঠের ঘোড়া) বিষয়বস্তু কৃত্রিম, তথাপি মিল-ম্যানেজার, পুলিশ অফিসার ইত্যাদি প্রকৃতই সেইসব শ্রেণীর প্রতিনিধি। কটবুর চন্দ্রন পিল্লা প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যকার স্কুল ম্যানেজার প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের উপস্থাপনা করে ঐ শ্রেণীর বিষয়ে নাটক লিখেছেন। সমাজের কপট এবং বিকৃত-গলিত দুর্গন্ধের উপর 'মরকুতিরা'র নাট্যকার প্রতীকাত্মক 'রিয়েলিজম'-এর সাহায্যে তীক্ষ্ণ শব্দে আক্ষেপ করেন। তাঁরই 'কল্যাণ দিনম্' (বিবাহ দিন) ইত্যাদি একাঙ্কে এই মনোভাব ও নাট্য-সংকেত দেখতে পাওয়া যায়।

ওমচেরীর মতে কয়েকজন নাট্যকার চরিত্র-চিত্রণ ও বিলক্ষণ গতির সাহায্যে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও মানব-মণ্ডলীর রহস্য, পরিহাসের দ্বারা প্রদর্শিত করেছেন। পরিস্থিতির ফাঁদে জড়িয়ে পড়া মানুষ যখন বুনিয়াদী জীবন-মূল্যগুলির সম্মুখীন হয় তখন অন্তরের মানুষ ও বাইরের মানুষ পরস্পরকে পরাজিত করার জন্য যে দ্বন্দ্ব করে, তীক্ষ্ণ হাসির মাধ্যমে ভয়োৎপাদক পরিস্থিতিতে ওমচেরীর অধিকাংশ নাটক তার চিত্রণ করে থাকে। এই সংগ্রহে সঙ্কলিত 'দৈবং বিংড়ুং তেট্টি ধরিকুন্নু,' 'ভগবান আবার ভুল বুঝলেন' এর উদাহরণ স্বরূপ।

তিকোটিয়ানের 'অ্যাংজাইটি নিউরোসিস' কাহিনীর চরিত্রগুলির আধারে রচিত এক হাসির নাটক। এই সংগ্রহে সঙ্কলিত অন্য হাসির নাটকগুলি থেকে ঐ নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ওর শিরোনামই সূচিত করে—এক ব্যক্তিগত ঘটনার প্রভাবে পড়ে কঠিন মনঃক্ষোভ এবং দুঃখ অনুভবকারী এক চরিত্র এর কেন্দ্রে দণ্ডায়মান। কাহিনীর পূর্বপুরুষের চরিত্রের সঙ্গে এই চরিত্রের তুলনা করলে এই নাটক, যা পূর্বপুরুষেরা সাধারণ বলে মনে করত, সেই ঘটনাসমূহে ভয়াকুল এমন এক দুর্বল বংশধরের চিত্র-ও হয়ে যায় না কি?

প্রসিদ্ধ নাট্য সংবিধায়ক ও বিশ্ব কলাকেন্দ্র নামক স্বজন নাট-সংঘের প্রধান এন. এন. পিল্লা প্রায় সমস্ত নাটক সংকেতগুলির একা অথবা সঙ্কলিত প্রয়োগ নিজ নাটকে করেছেন। এই সংগ্রহের অন্তর্গত 'শ্রীদেবী' পিল্লার ছোট একাঙ্কগুলির মধ্যে একটি। নাট্যকার স্বয়ং শুরুতে বলেন যে এতে 'এক্সপ্রেশনিস্ট' ইঙ্গিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর পতি এবং পত্নীর—পুরুষ ও নারীর প্রতিনিধিত্ব করা, বিরাট প্রতিফলের সূচনা, বিভিন্ন প্রকারে রঙ্গমঞ্চকে প্রকাশিত করার প্রাধান্য ও সংলাপের চটুলতা ইত্যাদি দেখার সময় 'এক্সপ্রেশনিস্ট' ইঙ্গিত জ্ঞাতসারে পিল্লা করেছেন তা বোঝা যায়। মলয়ালমে 'এক্সপ্রেশনিস্ট' নাটক খুব বেশী নেই। জি. শঙ্কর পিল্লার মত কিছু ব্যক্তি ঐ ইঙ্গিত যত্র-তত্র মিলিয়ে মিশিয়ে প্রয়োগ করেছেন।

মলয়ালম একাঙ্ক নাটক শাখা অত্যধিক পুষ্ট নয়। এখন পর্যন্ত মলয়ালমে প্রায় সাত শো পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রকাশিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে একাঙ্ক সংগ্রহ সত্তরের বেশী হবে না। এই জাতীয় ছোট সংখ্যার একাঙ্ক মলয়ালমের সর্বোত্তম নাট্য-প্রতিভার প্রতিনিধিত্ব করে। তা সত্বেও একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা কম হবার কারণ এটি অন্বেষণের বিষয়।

এই কারণে প্রথমে নাট্য-রচনার পটভূমি ও প্রেরণার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। পাঠকের কথা মনে রেখে উপন্যাস, গল্প এবং কবিতা রচনা করা হয়। কিন্তু নাটক রঙ্গমঞ্চের জন্য লেখা হয়। তাহলে তো রঙ্গমঞ্চ নাটকের ওপর প্রভাব ফেলার এক বিশেষ উপায়। নাটক যারা অভিনয় করেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি দুই-তিন ঘন্টার অভিনয়পূর্ণ নাটক চেয়ে থাকেন। বিভিন্ন প্রকার শিল্প-

অনুষ্ঠান পরিচালনকারী স্কুলের বার্ষিক উৎসবের হর্তা-কর্তা ব্যক্তি ইত্যাদি শিল্প-অনুষ্ঠানের অন্তর্গত অভিনয়যোগ্য আধ ঘন্টার নাটক খোঁজ করেন। এই প্রকার অভিনয়-সন্দর্ভের অভাবে একাঙ্কগুলি সংখ্যায় কমে যায়।

একাঙ্কগুলির প্রচার কম কিনা জানার জন্য বর্তমানের প্রকাশনাগুলিতে দৃষ্টিপাত করা পর্যাপ্ত হবে। চার-পাঁচটি গল্প এবং দুই-তিনটি উপন্যাস-খণ্ড প্রকাশ করার মত সর্বোত্তম তৎকালিক প্রকাশনেও অত্যন্ত কমই একাঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয়। রচনার কাঠিন্য, অনায়াস পঠনের প্রতি পাঠকদের অভিপ্রায়, মঞ্চের নির্ণায়ক মাধ্যম—এইসব একাঙ্কগুলির পুষ্টির পক্ষে বাধাস্বরূপ। রচনার কাঠিন্য সম্পর্কে বলার সময় এই কথা স্মরণে রাখা উচিত যে নাটক সর্বদা এমন এক শিল্প'রূপ যা প্রতিভা এবং শিল্প-বৈদগ্ধ্যের অধিক চাহিদা রাখে; বিশেষরূপে একটি একাঙ্ক, যাতে ছোট ক্যানভাসে অল্প চরিত্র ও প্রকরণের উপযোগ করে শিল্প সৃষ্টি করতে হয়।

মলয়ালম একাঙ্কগুলি সংখ্যায় খুব বেশী নয়, তা সত্বেও এই ক্ষুদ্র সংগ্রহে সংকলিত করার যোগ্য কিছু একাঙ্ক নির্বাচনের কাজ অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছে। তার কারণ এই যে আমাদের একাঙ্ক নাটকের ছোট সংসারে নাট্যজগতের প্রধান প্রতিভাশালীর মধ্যে কিছু ব্যক্তি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। গ্রন্থের নির্দিষ্ট রূপ তাঁদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়নি। এই কারণে মলয়ালম একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু এবং রচনা ইঙ্গিতের আধারে বিভক্ত করে এই সংগ্রহ তৈরী করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নাট্যকারদের নাট্যক্ষেত্রে অর্জিত প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণে রাখা হয়েছে। কারণ, সূক্ষ্ম নিরীক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যায় যে একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস নাট্য ইতিহাসের অংশ। একজন ভালো একাঙ্ক নাট্যকারকে একজন ভালো নাট্যকারও হতে হবে।

—কে. রাঘবন পিল্লা

কাঠের ঘোড়া

কে. রামকৃষ্ণ পিল্লা

চরিত্র

ম্যানেজার
গোমস্তা
স্ত্রী
ইন্সপেক্টর
একটি মহিলা
দুটি শিশু

1919 সালে প্রসিদ্ধ নাট্যকার কুট্টনাড্টু রামকৃষ্ণ পিল্লার জন্ম। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতায় সিক্ত এঁর অধিকাংশ রচনাই নাটক। এঁর প্রথম নাটক 'গরম হাওয়া' খুবই বিখ্যাত রচনা। 'কল' নামক সংকলন থেকে এই একাঙ্ক সংগৃহীত।

কাঠের ঘোড়া

[সময়—বিকেল 4-30 মি.]

[দৃশ্য : মিল ম্যানেজারের অফিসের দুইতলা বাড়ী। ম্যানেজার ফাইল দেখছেন। অফিস টেবিল—টেবিলে একদিকে ফাইল আর একদিকে ফোন। সিগ্রেটের টিন, অ্যাশট্রে এবং আরো অনেক জিনিস টেবিলের ওপর রয়েছে। গোমস্তা প্রবেশ করলেন।]

ম্যানেজার ঃ (ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে) হ্যাঁ, তাহলে আমাদের খোলাখুলি ভাবে অপমান করবে বলে ঠিক করেছে—তাই না গোমস্তা ?

গোমস্তা ঃ আমিও ভাবতে পারিনি। এইভাবে জেটিতে জিনিস নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে যাবে।

ম্যানেজার ঃ আমাদের নারকেলের শুকনো শাঁসগুলো খারাপ, লোকটা মুখের ওপর বলে দিল। ঠিক যেন মুখের ওপর শাঁসগুলো ছুঁড়ে মারলো। আমাদের শেঠেরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাববে ! লজ্জার কথা—ছিঃ ছিঃ !

গোমস্তা ঃ হ্যাঁ, অন্যেরা জানতে পারলে আমাদের ক্রেডিট কমে যাবে। লোকটার সঙ্গে অতক্ষণ সময়তো আপনি কথা বলছিলেন। এর মানে আমরাও কালোবাজারি করছি, তাই নয় কি ?

ম্যানেজার ঃ আর লোকটা বল্ল যে, সে টাকাও ফেরৎ চায় না। টাকা নাকি ওর কাছে তৃণ সমান।

গোমস্তা ঃ ওঃ ! খুব অহঙ্কারী দেখছি যে। হঠাৎ বড়লোক হয়েছে কিনা তাই। আপনার এই রকমই হওয়া উচিত। আপনার মিলে পাঁচ টাকার মাইনেয় সে কাজ করেছিল—তাই না ?

ম্যানেজার ঃ সেটা তো আমাদের গর্বের বিষয়।

গোমস্তা ঃ তার মানে কি মাথার কথা ভুলে গিয়ে তেল ঘষবে নাকি ? আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

ম্যানেজার ঃ লোকটা এখন এই শহরের একজন নামকরা ব্যবসায়ী। সব জায়গায় তার নাম, এমন অবস্থায়……

গোমস্তা ঃ হ্যাঁ, আর যা খুশী করার অধিকারীও। তা মন্দ নয়। নিয়ে যাওয়া মালই না ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে !

ম্যানেজার ঃ সত্যি কথা বলতে গেলে শাঁস আমাদের। আমাদের নয়, তা কি বলতে পারি ?

গোমস্তা ঃ কত গাণি ব্যাগ, কোথা থেকে সব কিনেছে সবই নৌকোয় রয়েছে। সাহস চাই, সাহস……।

ম্যানেজার ঃ হ্যাঁ, কালোবাজারি দেখার সাহস—না, না, দরকার নেই। আমার নিজের ছেলের মত আমি তাকে স্নেহ করতাম। আমি ওর……

গোমস্তা ঃ কিন্তু লোকটা তো সেভাবে ভাবছে না। সে এখন আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। আমি বাজী ধরছি। ইন্সপেক্টারকে বলে দিলেই হবে, ওর সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তারপর ওর মিল, ব্যবসা, গাড়ী-টাড়ী সব শেষ।

ম্যানেজার ঃ ইন্সপেক্টারকে বলবো? ছ্যা, সেটা ঠিক হবে না। আপনি যাই বলুন না কেন, ওকে……ছিঃ না, না, তা সম্ভব নয়।

গোমস্তা ঃ ঠিক, আছে ঈশ্বর সব দেখছেন……নূন খেলে জল না খেয়ে কোথায় যাবে……ইন্সপেক্টার সাহেব……

ম্যানেজার ঃ শুনুন গোমস্তাবাবু, ঐ লোকটা আমাদের স্নেহের অযোগ্য। আমাদের এ ভার বহন করাও মুশকিল। আপনি তো জানেন আগের সপ্তাহে তাকে আমরা কত দিয়েছি।

গোমস্তা ঃ চারশ পঁচাত্তর। তাতে কি আমাদের মিলের বিপ্লব চাপা পড়লো? হ্যাঁ ঐ যথেষ্ট! ঐ টুপীপরা লোকটার হাড়গোড় কিছু আর নেই। এখন একবার বক্তৃতা দিক দেখি।

ম্যানেজার ঃ আমরা কতদিন আর এই ভার বহন করতে পারবো? যাদের যাদের দেবার তাদের কি দেওয়া উচিত না?

গোমস্তা ঃ তা আপনি চাইলে আমি দেবো।

ম্যানেজার ঃ আজ সকালে এখানে এসেছিল। তারপর ফোনও করেছিল।

গোমস্তা ঃ কেন, কিছু কি গণ্ডগোল হয়েছে?

ম্যানেজার ঃ লোকটার সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে তিনশ টাকা চাই। কী করে বলবো যে টাকা নেই।

গোমস্তা ঃ তাহ'লেই হয়েছে। ধান বিক্রী করার অনুমতি দেয়নি কি?

ম্যানেজার ঃ শুধু অনুমতি দেওয়া! তিনটে পুলিশকে পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল না? তারাওতো নৌকোতে বসেছিল।

গোমস্তা ঃ কিছু পয়সা খরচ করতে হবে বৈকি? তিনি যদি আসেন……

ম্যানেজার ঃ পাঠিয়ে না দিলে নিশ্চয়ই আসবেন।

গোমস্তা ঃ হুঁ! তা আসুন। আরো ৫০ টাকা যাবে ধরে নিন।

ম্যানেজার ঃ তার মানে?

গোমস্তা ঃ বলছি, বলছি।

ম্যানেজার ঃ কী বলুন।

গোমস্তা ঃ আছে, আছে। পাঁচশ টাকা চাইলে আরো পঞ্চাশটা টাকা হাতে দেবেন। কারণ আছে।

ম্যানেজার ঃ এতদিন যা দিয়েছি তাই যথেষ্ট।

গোমস্তা ঃ তাহ'লে সময় বুঝে এরা কোপ মারবে।

ম্যানেজার ঃ ওঃ হ্যাঁ, সেই ব্যাপারটা কী মিটে গেছে?

গোমস্তা ঃ কী বলবো আর। দুশ' টাকা চাইই। নইলে এখানে এসে চাইবে বলেছে।

ম্যানেজার ঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা! এই অফিসে তাহলে সে আসবে? ওঃ ভাবাই যায় না। আর একশটা টাকা পেলে সে আর বিরক্ত করবে না বলে কি আপনাকে কথা দেয়নি?

গোমস্তা ঃ বেশ্যার কথার আবার মূল্য কী? একটা কাঁচা নোট হাতে পেয়েই তার হাবভাব বদলে গেলো। ইন্সপেক্টরের সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

ম্যানেজার ঃ ইন্সপেক্টর সব জানে। খুব লজ্জার কথা। কিন্তু না বলেও পারা যায় কী করে? মেয়েটা এখানে এসে উঠবে কি?

গোমস্তা ঃ অতখানি সাহস কী হবে? তবে হ্যাঁ……এরা যা খুশী তাই করতে পারে।

ম্যানেজার ঃ আমাদের মিলের কর্মচারীরা সব এ-নিয়ে বলাবলি করছিল।

গোমস্তা ঃ সব কিছুই চাপাচুপি রাখা যেত। আপনার মত দেখতে ছেলেটা…… আজ সকালেই দেখেছি।

ম্যানেজার ঃ আমার ভয় তা নয়। আমার মোহন আর তার মা যদি জানতে পারে! বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতিতে যদি মা আর ছেলে এসে উপস্থিত হয়……ওরা কী ভাববে তাহলে?

গোমস্তা ঃ ওসব ভেবে ভয় পাবেন না। সেসব আমি দেখবো। তারপর ইন্সপেক্টর সাহেব আছেন না! একেবারে লাথি মেরে তার কোমর ভেঙে দেবে। দুশ' টাকা যেন গাছের ফল! হ্যাঁ তারপর আপনি, তিনি যা চাইবেন তা খুশী মনেই দিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার ঃ ঠিক আছে……যেমন ভাবেই দেখি না কেন এর কোনো শেষ খুঁজে পাচ্ছি না। লজ্জার কথা। আর ঐ লোকটা! বড় লোভী। আমাদের যেন আবার লজ্জায় না পড়তে হয়। আরে, পাঁচটা বাজতে চল্ল। গাড়ী ষ্টেশনে কী গেছে?

গোমস্তা ঃ হ্যাঁ সেসব রেডি। ৫-১৫ মিনিটে তো গাড়ী আসছে। মা আর খোকা এখানেই আসবে।

ম্যানেজার ঃ আমি ভেবেছিলাম যে, আমি নিজেই ষ্টেশনে যাবো কিন্তু এই ফাইল থেকে মাথা তুলতেই পারছি না।

গোমস্তা ঃ তাতো হবেই, বছরের শেষ। হ্যাঁ, খোকার একটা কাঠের ঘোড়া চাই বলেছিল। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। আমি দোকানে গিয়ে বলে এসেছি যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বেয়ারাকে পাঠিয়েছি। ওখানে দুটো মাত্র কাঠের ঘোড়া আছে। দুটোই নিয়ে আসুক। ভালো দেখে……

ম্যানেজার ঃ হ্যাঁ নিয়ে আসুক। ভালোটা নেব। (ফোন বাজতে লাগলো। ম্যানেজার ফোন নিল)—ইয়েস্। ইয়েস্ ম্যানেজার স্পীকিং! কে? ইয়েস্! হ্যালো! ইন্সপেক্টার সাহেব নাকি? ভেরী গুড্। হ্যাঁ আসুন। আমার স্ত্রী ও ছেলে আসছে। হ্যাঁ……পাঁচটার ট্রেনে। ইভনিং টি……ইয়েস্। আপনি এখানে আসুন, এখানে এসে তারপর যাবেন। কখন?……ইয়েস্……আপনার সুবিধে মত! সকালে যা বলেছিলাম? হ্যাঁ……রেডি। ইয়েস্……থ্যাঙ্ক ইয়ু!

গোমস্তা ঃ ইন্সপেক্টার সাহেব বুঝি কথা বলছিলেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। কী বল্লেন—এখানে আসছেন।

ম্যানেজার ঃ লোকটা একটা বোর। তা আসুক। হ্যাঁ, এখানে আসছে।

গোমস্তা ঃ সকালের কথা মনে আছে তো? আপনি ওনাকে চটাবেন না। আমাদের অপমান থেকে রক্ষা পেতে হবে।

ম্যানেজার ঃ চুলোয় যাক্……হ্যাঁ আপনি বাংলোতে চলে যান। লোকজন কি আর সবকিছু ঠিক করে রেখেছে?

গোমস্তা ঃ সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। মা এসে দেখুন। একবছর আগে এই বাড়ীতেই তিনি থেকেছিলেন তা একবার বলুন তিনি! খোকনের জন্য একটা দোলনা পর্যন্ত টাঙিয়ে দিয়ে এসেছি।

ম্যানেজার ঃ এতক্ষণ পর্যন্ত একটুও ভয় ছিল না। এখন……যাক্ কী আর করা যাবে। যদি সম্ভব হতো ওকে……

গোমস্তা ঃ দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমাদের ওয়ার্ডে এসব জানাজানি হলে কি চলে? এসব যদি ইন্সপেকটার মনে করেন তো আজ রাতেই বোটে করে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আজ যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে ভালোয় ভালোয় চলে যাক……একশ'টা টাকা—সোজা কথা!

ম্যানেজার ঃ একটা ভয়……আপনি……

[বেয়ারা ঘরে ঢুকলো বাচ্চাদের খেলার দুটো কাঠের ঘোড়া কাঁধে নিয়ে]

গোমস্তা ঃ দুটোই নিয়ে এলে নাকি? তা বেশ……আচ্ছা আমি তাহ'লে বাংলোয় যাচ্ছি।

ম্যানেজার ঃ আমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসছি। ওরা কি সোজা এখানে আসবে নাকি?

গোমস্তা ঃ খোকন বাবাকে দেখার জন্যে জেদ ধরেছে।

ম্যানেজার ঃ তাহ'লে আসুক। আপনি বাংলোয় চলে যান।

গোমস্তা ঃ (দাঁড়িয়ে থেকে) বাড়ী থেকে—

ম্যানেজার ঃ আগে বলতে পারেন নি? ক'ত চাই?

গোমস্তা ঃ পঁচিশ।

ম্যানেজার ঃ পঁচিশ টাকা! ছেলেটা কী এসেছে? টাকাটা ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিন। এই নিন (টাকা দিলেন)।

[গোমস্তা সন্তুষ্ট হয়ে নমস্কার করে চলে গেল]

ম্যানেজার ঃ এই গাধা! এতক্ষণ ধরে তুই ঐ ঘোড়াদুটো কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস?

বেয়ারা ঃ আপনার আদেশের অপেক্ষায়।

ম্যানেজার ঃ রাখ্ এখানে বোকা কোথাকার! এখানে এগুলো আনার কী দরকার ছিল? বাংলোয় নিয়ে গেলেই পারতিস।

বেয়ারা ঃ যে আজ্ঞে স্যার। যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে অন্যটা......

ম্যানেজার ঃ তোকে কিছু করতে হবে না। ঐ উত্তর দিকের কোনটায় রেখে দে।

[বেয়ারা হুকুম মত কাঠের ঘোড়া দুটোকে অফিস ঘরের উত্তর দিকের কোণে রেখে দিল]

ম্যানেজার ঃ বিল কোথায়?

বেয়ারা ঃ আজ্ঞে বিল দেননি।

ম্যানেজার ঃ হুঁ! আচ্ছা যাও।

[গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ শুনতে পেলেন]

ম্যানেজার ঃ গাড়ী এসেছে, দেখতো!

বেয়ারা ঃ (জানলার সামনে গিয়ে দেখে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

[চলে গেল]

ম্যানেজার ঃ এত তাড়াতাড়ি গাড়ী এসে গেল? (সিগ্রেট ধরালে, ফাইলগুলো সব ঠিক করে রাখলো।)

[আর একজন বেয়ারা প্রবেশ করলো]

ম্যানেজার ঃ ওরা (উঠে) এসেছে? খোকাকে এখানে নিয়ে এস।

বেয়ারা ঃ যে আজ্ঞে।

[খুব সুসজ্জিতা একটি মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠছে]
বাচ্চা এবং স্ত্রীকে দেখেই ম্যানেজারের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। স্ত্রী বেশ স্মার্ট ভাবে ঘরে ঢুকলো। বাচ্চাটা কাঠের ঘোড়া দেখেই কোমর থেকে তাড়াতাড়ি নামতে চাইল। মহিলা বাচ্চাটিকে নীচে নামালো]

স্ত্রী ঃ আপু! এদিকে দেখ্। কে দেখ্।

বাচ্চা ঃ কাঠের ঘোড়া মা, কাঠের ঘোড়া।

[বাচ্চাটা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল]

স্ত্রী ঃ তুমি বসো।

[ম্যানেজার নিজের অজান্তে বসে পড়লেন]

স্ত্রী ঃ আমি এখন এখানে কিছুক্ষণ বসবো।

ম্যানেজার ঃ হুঁঃ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লেন]

স্ত্রী ঃ আমি জানি তুমি আমাকে এখানে আশা করোনি।

ম্যানেজার ঃ তুমি আমাকে অপমান করছ।

স্ত্রী ঃ না।

ম্যানেজার ঃ তাই যদি হয় তাহ'লে এখানে এসেছ কেন?

স্ত্রী ঃ ব্যবসার কাজে।

ম্যানেজার ঃ ঠাট্টা কোরো না।

স্ত্রী ঃ ঠাট্টা নয়। একটা ছোট্ট হিসেব শেষ করার জন্যে।

ম্যানেজার ঃ তুমি যা চেয়েছিলে আমি তা তো সকালেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

স্ত্রী ঃ কী? কী পাঠিয়ে দিয়েছ?

ম্যানেজার ঃ যা চেয়েছিলে?

স্ত্রী ঃ কুড়িটা টাকা। তুমি আজ অন্তত কিছু বেশী......

ম্যানেজার ঃ আমি একশ টাকা পাঠিয়েছি......তুমি আমাকে অপমান করছ।

স্ত্রী ঃ আমি তোমাকে অপমান করছি! ঐ কুড়ি টাকায় আমি আর আমার ছেলে......

ম্যানেজার ঃ তাহ'লে গোমস্তা সে টাকাটা চুরি করেছে। তুমি আমায় বিশ্বাস কর। আমি ১০০ টাকা লোকটার হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। না কুলোলে আরো পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রী ঃ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবো না—কিন্তু তুমি!

ম্যানেজার ঃ আমি কী করেছি? আজ অবধি যা চেয়েছ সব দিয়েছি। তা সত্ত্বেও তুমি......

স্ত্রী ঃ যা আমি চাইনি তাও তুমি দিয়েছ।

ম্যানেজার ঃ কী তুমি চাওনি?

স্ত্রী ঃ কী চাইনি? আমি সেইজন্যেই তোমাকে ঘৃণা করি। সেইজন্যেই তোমাকে ভালোবাসি।

ম্যানেজার ঃ তুমি আমাকে ইচ্ছে করে অপমান করছ।

স্ত্রী ঃ না। তুমি আরো একটু সহৃদয় না হ'লে তোমায় অপমান করা সম্ভব না। তুমি আমাকে ভালোবাসোনি তা আমি জানি। কিন্তু তোমাকে ভালোবাসতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার ছেলে......

ম্যানেজার ঃ তুমি চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও।

স্ত্রী ঃ যাবো কিন্তু আমার খরচের টাকা তুমি না দিলে আমি কেমন করে যাবো?

ম্যানেজার ঃ তুমি যাও। তোমাকে আর কিছু দেবার সাধ্য আমার নেই। যা দেবার সব তোমায় দিয়েছি।

স্ত্রী ঃ একটু বেশীই দিয়েছ। তুমি একবার মনে করে দেখো। সেদিন তুমি অসুস্থ ছিলে। সেদিন আমার সেবার তোমার দরকার ছিল। সেদিন আমি এত গরীবও ছিলাম না। আমার সবকিছু তোমাকে আমি সমর্পণ করেছিলাম।

ম্যানেজার ঃ এসব আমি কতবার শুনবো?

স্ত্রী ঃ রোজ তোমাকে শুনতে হবে না। কিন্তু চিরদিন তোমাকে মনে রাখতে হবে। শুধু আমি একা হলে......

ম্যানেজার ঃ তুমি কি বাগদত্তা হ'য়ে তৈরী হয়ে এসেছ নাকি?

স্ত্রী ঃ তোমায় বাংলোতে আমি যেতে চাই না। ও বেচারীর শান্তি আমি জীবনেও নষ্ট করতাম না। এদেশে অনেক রাস্তা আছে। অনুকম্পা দেখানোর অনেক লোকও আছে, কিন্তু তা শুধু আমার জন্যে। আমাকে তারা অভয় দেবে। আমার অসুখ যদি এই অবস্থায় বেড়ে যায় তাহ'লে কোনো হাসপাতালের বারান্দাতেও আমি আশ্রয় পাবো। কিন্তু—

ম্যানেজার ঃ তুমি আর একমিনিটও দেরী করো না। (ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে লাগলো।) যাও চলে যাও।

স্ত্রী ঃ তোমার সম্মান রক্ষা করার জন্যে আমাকে একজন ভদ্র স্ত্রী হয়ে না থাকতে দেবার চেষ্টা করেছ। আমি তোমার কাছ থেকে অনেক নিয়েছি। কিন্তু তোমার এখন এ ভার বহন করা ছাড়া উপায় নেই। [বাচ্চাটা ছুটে এল]

বাচ্চা ঃ মা, মা ঘোড়াটা দৌড়াচ্ছে না। ঘোড়াটা......

ম্যানেজার ঃ উঃ কী জ্বালা......তুমি এখান থেকে যাও।

বাচ্চা ঃ মা, ঘোড়াটাকে একটু দৌড়োতে বল না। দৌড়োতে......

[আবার ঘোড়াটার দিকে ছুটে গেল]

স্ত্রী ঃ হে ভগবান! আমাকে বাঁচতে হবে যেরকম করেই হোক। এ আমার অধিকারের প্রশ্ন নয়। প্রয়োজন। তুমি কালোবাজারি করে পয়সা করেছ। আমাকে মা করেছ......

ম্যানেজার ঃ এটা অফিস মনে থাকে যেন।

স্ত্রী ঃ আমি তা জানি। তুমি ভুল করলেও তুমি গণ্য-মান্য ভদ্রলোক। আমি একজন মেয়ে......শুধুই মেয়ে। আমি যখন অবিবাহিতা ছিলাম......না! আমার দালালের দরকার নেই। তোমার গোমস্তা......

ম্যানেজার ঃ (ফোন হাতে নিয়ে)—হ্যালো, হ্যালো, ২১৩ নম্বর দিন। হ্যাঁ, পুলিশ ষ্টেশন।

স্ত্রী ঃ এ সব কৌশল আমি জানি। এ দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। প্রথমতঃ দশমাসের অপমান, মনোকষ্ট, তারপর আমার বাচ্চাকে দুবছর ধরে বড় করে তোলার কষ্ট......না, আমি অত সহজে ভয় পাব না।

ম্যানেজার ঃ তুমি......(ফোনের আওয়াজ)—ইয়েস! ইন্সপেকটার এখানে আসছেন? ভেরি গুড্! থ্যাঙ্কস। (ফোন নীচে রেখে) তুমি একটা বেশ্যা, যদি না যাও এখান থেকে......

স্ত্রী ঃ তোমাকে এই হিসেব মিটোতেই হবে। আমি জানি তোমার ভয়টা কোথায়। আমি ইচ্ছে করে এরকম করছি না। একদিন এমন ছিল যখন তোমার কাছে আমি সর্বক্ষণ বসে থাকলেও তোমার তৃপ্তি হতো না। এখন তোমার স্ত্রী এসেছে—তুমি তার, তা আমি জানি।

ম্যানেজার ঃ আমি বেয়ারাকে ডাকছি।

স্ত্রী ঃ কাউকে ডাকতে হবেনা। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু......

[সিড়ি দিয়ে ইন্সপেক্টার উঠে এলো]

ম্যানেজার ঃ তুমি যদি না যাও......

স্ত্রী ঃ তুমি তোমার শক্তি দেখাচ্ছ (উঠে পড়লো)

ম্যানেজার ঃ প্লীজ সিট ডাউন। দিস্ ন্যাস্টি উওম্যান!

ইন্সপেক্টার ঃ (বসলেন) বা! বা! বেশ! বেশ!

ম্যানেজার ঃ এই স্ত্রীলোকটি......

ইন্সপেক্টার ঃ কে?

স্ত্রী ঃ এখন তো আমাকে চিনতেই পারবেন না।

ইন্সপেক্টার ঃ শাট আপ্ ইউ ফুল।

স্ত্রী : এটা যে মিষ্টি বকুনি না তা আমি জানি।

ম্যানেজার : আমরা তো আপনাকে সেই ব্যাপারটার মিটমাট করার কথা বলেছি। আপনি ওটা ঠিক করে দেবেন। ঐ শেঠ লোকটি অতন্ত জেদী। তাহলেও ৫৫০৲ টাকার মধ্যে সব ব্যবস্থা করবেন। আমি তার জন্যে টাকা রেখে দিয়েছি। এই যে......

ইন্সপেক্টার : ঠিক আছে। আগে এই মেয়েছেলেটাকে এই শহর থেকে বার করে দিয়ে তবে অন্য কাজ।

স্ত্রী : আমি সব কিছু স্বীকার করার জন্যে তৈরী। আমি তো আপনার অপরিচিত নই।

ইন্সপেক্টার : আজকের বোটেই চলে যাও—কী?

স্ত্রী : আপনি নিয়ম পালন করছেন। আমি এতে একটুও অবাক হচ্ছি না।

ম্যানেজার : কী লজ্জার কথা! কী অবাধ্যতা!

স্ত্রী : তার জন্যে দায়ী অন্য আর কেউ নয়।

ইন্সপেক্টার : তোমাকে জেলে পোরার ক্ষমতা আমার আছে—বুঝেছ? এখন তবে উঠে পড়।

স্ত্রী : আপনাদের মত লোকদের বেশী সাবধানতাকে আমি ভয় করি।

ইন্সপেক্টার : তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে এখন নিয়ে যাওয়া হবে। মিঃ ম্যানেজার আরো দুশ'টাকা দিন। যদি কিছু বাঁচে তাহলে আপনার গোমস্তার হাতে পাঠিয়ে দেব। আমার মনে হয় এই বন্ধন শেষ করাই ভালো—কী বলেন?

ম্যানেজার : (ভাবতে ভাবতে) তাহলে ৭৫০৲ টাকা......

ইন্সপেক্টার : তা হোক। মিছিমিছি তো আর টাকাটা নষ্ট করছি না। আমরা এক ক্লাশের আর ঐ মেয়েটা অন্য ক্লাশের......

ম্যানেজার : (গুণে) ৭৫০৲ টাকা।

ইন্সপেক্টার : (টাকাগুলো পকেটে রেখে)—গোমস্তার হাত দিয়ে বাকীটা পাঠিয়ে দেব।......আমি ওখানে......

স্ত্রী : গোমস্তা!......

[বেয়ারা ঢুকলো]

বেয়ারা : বাবু, মা আর খোকা......

ম্যানেজার : এসে গেছে?

ইন্সপেক্টার : তাহলে?

স্ত্রী : তাহলে!

ইন্সপেক্টার : তুমি তাহলে ষ্টেশনেই যাও। আমার......

স্ত্রী ঃ না।

[ম্যানেজারের স্ত্রী আর ছেলে ঢুকলো। বাচ্চাকে কোলে নেবার জন্যে ম্যানেজার এগিয়ে গেল]

ইন্সপেক্টার ঃ মিসেস তমাসকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে যেন। আচ্ছা আমরা একটু বেরিয়ে এক্ষুনি আসছি।

ম্যানেজার ঃ বাংলোয় আসবেন। চায়ের সময়ের কথা ভুলবেন না।

স্ত্রী ঃ আমি তাহলে এখনকার মত……

ইন্সপেক্টার ঃ চলো, চলো, এগিয়ে চলো।

[দুজনে সিড়ি দিয়ে নামতে লাগলো]

বাচ্চা ঃ বাবা, কাঠের ঘোড়া !

ম্যানেজারের স্ত্রী ঃ খোকা, ঐ দেখ একটা দাদাও রয়েছে ওখানে। দুটো ঘোড়া।

বাচ্চা ঃ ইস্‌—বাবা কী ভালো ! (ঘোড়ার কাছে দৌড়োলো)।

[ম্যানেজার কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন]

বিয়ের ফাঁদ

কৈন্নিকরা কুমার পিল্লা

চরিত্র

গোপালন নায়ার	...	অবিবাহিত এক কলেজ অধ্যাপক। ৩৫ বছর বয়স। বিয়েতে তাঁর খুব ভয়।
বিক্রমন পিল্লা	...	গোপালন নায়ারের আত্মীয়। দুষ্টুমিতে ওস্তাদ। ৪৫ বছর বয়স।
শঙ্কু	...	গোপালন নায়ারের ভৃত্য। অনেকদিন উকীল বিক্রমন পিল্লার ভৃত্য ছিল। বিক্রমন পিল্লাকে এখনো সে খুব সম্মান করে। ২৮ বছর বয়স।
কমলম্	...	জানকী আম্মার মেয়ে। ম্যাট্রিক অবধি পড়েছে। অবিবাহিতা। বয়স তেইশ।
জানকী আম্মা	...	গোপালনের মামী।

কৈন্নিকরা কুমার পিল্লা একাধারে সমালোচক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, অভিনেতা, বাগ্মী। 1900 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর জন্ম। বহুদিন ধরে নামকরা অধ্যাপক এবং শিক্ষা বিভাগের অফিসার ছিলেন। তাঁর সাহিত্য কৃতি ষোলটি। অধিকাংশই নাটক। 'বিয়ের ফাঁদ' এই একাঙ্কটি তাঁর 'লুকোচুরি খেলা' নামে একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিয়ের ফাঁদ

[ত্রিবান্দ্রামে বাড়ীতে ঢোকার ঘর।

সময়—বর্তমান সময়, চারটে বেজে গেছে। বিক্রমন পিল্লা একটা চেয়ারে বসে আছে। শঙ্কু সামনে দাঁড়িয়ে]

শঙ্কু : বাবু আপনি তাহ'লে একটা বাজে কাজে নেমেছেন?

বিক্রমন পিল্লা ঃ তোর মত তো আমি জিজ্ঞেস করিনি। তোকে যা বলছি তা তুই শুনবি কিনা বল্।

শঙ্কু ঃ আপনি বল্লে শঙ্কুকে শুনতেই হ'বে। আপনার নুন খেয়েই শঙ্কু আজ এত বড়টা হয়েছে। আপনিই আমাকে শঙ্কু করেছেন। আপনি যেভাবে চান সেইভাবেই আমাকে কাজ করতে হবে।

বিক্রমন পিল্লা ঃ তাহ'লে আমি যা বলেছি সেই রকম চাই।

শঙ্কু ঃ হ্যাঁ, তাহ'লে তাই করবো, তবে আমার হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না। তা না থাক্।

বিক্রমন পিল্লা ঃ তোর হাড়গোড় সব আস্তই থাকবে। সে আমি দেখব। তুই গিয়ে দিদিকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। তারপর তুই এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবি।

শঙ্কু ঃ আপনি যা বলেন, যা হবার হোক্। তাছাড়া আর কী করা যাবে! (চলে গেল।)

[জানকী আম্মা ঢুকলো]

বিক্রমন পিল্লা ঃ কী দিদি কেমন আছ? যাত্রার ক্লান্তি দূব হয়েছে তো? আমাদের সময় এগিয়ে আসছে। ও এই এল বলে।

জানকী পিল্লা ঃ বিক্রমন যাই বলো না কেন এখানে আসার সময় আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করছিল।

বিক্রমন পিল্লা ঃ তুমি চুপচাপ বসে থাকো তো। আমি যা যা বলেছি তা সব মনে আছে তো?

জানকী আম্মা ঃ হঁ্যা, সব মনে আছে। তবে এটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে আমার একটু ভয়ও করছে। ও যদি কোনো গণ্ডগোল বাধায়?

বিক্রমন পিল্লা ঃ চুপ করো তো দিদি। হয় তুমি ও যা বলছে তাই শোনো...

জানকী আম্মা ঃ মা শুনলে? সেইটাই তো আমি জানতে চাইছি।

বিক্রমন পিল্লা ঃ ওকে দিয়ে শোনানো হবে।

জানকী আম্মা ঃ কে জানে কী হবে।

বিক্রমন পিল্লা ঃ কী কে জানে? তুমি দেখোই না……আচ্ছা আমি তাহলে এখন বেরোচ্ছি……পরের সব আমি যেমন যেমন বলেছি।

জানকী আম্মা ঃ তুমি এখানে থাকলে আমি একটু ভরসা পেতাম।

বিক্রমন পিল্লা : না, সেটা আমাদের প্লানমত নয়। কোনো ভয় নেই দিদি ……আমি ঠিক সময়ে এখানে আসবো। এই শঙ্কু—শঙ্কু (ভেতর থেকে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি লুকিয়ে পড়ছি।

বিক্রমন পিল্লা ঃ তুই একবার এখানে আয়।

[শঙ্কু ঢুকলো]

শঙ্কু ঃ কী বাবু, প্ল্যান বদলে ফেল্লেন নাকি?

বিক্রমন পিল্লা ঃ না না, প্ল্যান কিছু বদলাইনি। তুই এখানে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে প্ল্যানটা ভুলে না গেলেই যথেষ্ট।

শঙ্কু ঃ এই আমি? বেশ বেশ। আপনি আমাকে দেখছি একটুও বিশ্বাস করেন না।

বিক্রমন পিল্লা ঃ তাহ'লে আর বেশী বক্তৃতা না দিয়ে লুকিয়ে পড়। না…… তুই আমার সঙ্গে আয়। দিদি, তাহ'লে সেইরকমই ঠিক রইল…… সত্যভামা, সুভদ্রা, চাঁদবিবি, ঝান্সির রাণী এদের কথা সব ভাবো। আয় শঙ্কু, যাই।

[বিক্রমন পিল্লা আর শঙ্কু চলে গেল]

জানকী আম্মা ঃ সকলের কথাই ভাবছি। এই গোলমেলে লোকটার কথা শুনে এর মধ্যে মাথা না গলালেই হ'তো বলে এখন মনে হচ্ছে। সবকিছু যদি গোলমাল হ'য়ে যায় তাহ'লে অপমান আর লজ্জার শেষ নাই। নাঃ, ভাবাই যায় না। হে ভগবান! সব ঠিক করে দাও। এইরে, আসছে বলে মনে হচ্ছে!

গোপালন ঃ (বাইরে থেকে)……শঙ্করন নায়ার, আজ তোর কী হয়েছে? উঠোনে জঞ্জাল নেই……হাতটা ধোবার জল পর্যন্ত একেবারে রেডি করে দরজার সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে! আরে বাবা, বদনাটা দেখছি একেবারে ঝকমকে করে মেজে রেখেছে। সব মিলিয়ে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে তো?

[গোপালন ঘরে ঢুকেই জানকী আম্মাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেল]

জানকী আম্মা ঃ কী ব্যাপার! একেবারে যে অবাক হয়ে গেলি। যেন কিছুই বুঝতে পারছিস না। আমার বাড়ী উত্তর দিকে।

গোপালন ঃ (চমকে)—মামীমা।

জানকী আম্মা ঃ ওহো! মামীমা বলে তোর কেউ আছে নাকি? মামী কোথায়—বেঁচে আছে না মরে গেছে?

গোপালন ঃ মামী······

জানকী আম্মা ঃ আহা, মামী মামী করছিস কেন? মামী কী করেছে?

গোপালন ঃ আমি তোমাকে এখানে একেবারেই আশা করিনি।

জানকী আম্মা ঃ ওঃ দুটো তিনটে কথা তোর গলা দিয়ে বেরোলো তাহলে। যাক্, খুব ভালো ব্যবহার পেলাম তোর কাছ থেকে—আমাকে একেবারেই আশা করিসনি—তাই না?

গোপালন ঃ মামী, কখন এলে?

জানকী আম্মা ঃ ও! এখন কুশল জিজ্ঞেস করছিস বুঝি?

গোপালন ঃ তুমি দেখছি ঠিক সেই আগের মতোই বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলছ······এতটুকুও বদলাওনি।

জানকী আম্মা ঃ ওঃ তোর তাহ'লে সব মনে আছে দেখছি।

গোপালন ঃ মামী তুমি যেন লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছ বলে মনে হচ্ছে।

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ তাই-ই। আর তাতে জয়লাভ করবো বলেও ঠিক করেছি; হয় জয়, নয় মৃত্যু······এমনি ভাবে তৈরী হয়ে এসেছি।

গোপালন ঃ তুমি এখন কোত্থেকে আসছ?

জানকী আম্মা ঃ আমার বাড়ী থেকে।

গোপালন ঃ কোথায় যাচ্ছ?

জানকী আম্মা ঃ কোথাও যাচ্ছি না।

গোপালন ঃ তার মানে?

জানকী আম্মা ঃ মানে কিছুই নেই।

গোপালন ঃ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার এখন ত্রিবান্দ্রাম আসার মানে?

জানকী আম্মা ঃ আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই।

গোপালন ঃ আমাকে এমনি ভাবে ধাঁধায় না ফেলে ব্যাপারটা কী খুলেই বল না মামী?

জানকী আম্মা ঃ কিন্তু তোর ব্যাভারটা বেশ। কখন এলে? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? সেসব কিছু না। কোত্থেকে এলে, কোথায় যাচ্ছ—যত্ত সব প্রশ্ন। এই বুঝি তোদের শহুরে ভদ্রতা?

গোপালন ঃ আচ্ছা আচ্ছা মামী, আমি আর একটা কথাও বলবো না।

জানকী আম্মা ঃ আমি জানি তুই তাই করবি। তার বেশীও করবি (কাঁদতে লাগলো)—দশ বছর পরে আমি ওকে দেখতে এসেছি আর ও বলে কিনা ও একটা কথাও বলবে না।

গোপালন ঃ মামী, মামী—আমি কী বলেছি?

জানকী আম্মা : কী বলিসনি তুই? হ্যাঁ তুই তাই-ই বলেছিস। তুই সবকিছু বলতে পারিস্। সবকিছু করতে পারিস্। ওরে বাবারে তোর মতো এমন নিষ্ঠুর ছেলে এই ত্রিভুবনে আর একটিও নেই।

গোপালন : এই শঙ্কু......শঙ্কু......

জানকী আম্মা : কেন তুই ওর খোঁজ করছিস্?

গোপালন : শঙ্কু......

জানকী আম্মা : আমাকে মারতে নাকি?

গোপালন : মামী, কী সব যা তা বলছ? তোমাকে কিছু খেতে-টেতে দিয়েছে কিনা দেখি।

জানকী আম্মা : আহা, আমার সোনার ভাগ্নের এতক্ষণে অন্ততঃ একথাটা মনে হলো......তোর বোধহয় এখন খিদে পেয়েছে? কফি খেলে আমিই এনে দিচ্ছি।

গোপালন : না। আমার কফি চাই না এখন।

জানকী আম্মা : তাহ'লে থাক্। যারা আনার তারা এনে দিলেই খাস্ তাহলে।

গোপালন : মামী, তুমি কীসব বলছ?

জানকী আম্মা : আমি বল্লেই বুঝি দোষ? হতভাগা, তোর মা বাবা কবে মরে গেছেন সেকথা তোর মনে আছে? তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে এত বড়টি করেছে কে? তোর মা, বাবা সব আমিই ছিলাম সেকথা কি তোর মনে আছে? তুই পড়ে টাকা করলি, এম. এ. ডিগ্রী পেলি। ভাগটাগ হয়ে যাবার পর নিজের সম্পত্তি পেলি, তারপর কলেজের চাকরী পেলি। সব তুই ভুলে গেছিস না? তোর মামা মারা গেছেন আজ দশ বছর হলো। এই এতগুলো বছর তুই কি একবার আমাদের ঠিকঠাক খোঁজ খবর করেছিস?

গোপালন : মামী, আমার সব মনে আছে—আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জানকী আম্মা : যা, যা, তোর সাহিত্য আর আমার শোনার দরকার নেই। ওঃ ওনার কৃতজ্ঞতা! ধন্যবাদ তুই কোথায় বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিস।

গোপালন : তোমার যে এরকম খারাপ লাগবে তা আমি জানি। তার কারণও আছে। কিন্তু তোমাদের ওপর ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা নেই বলে যে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিনি তা নয়।

জানকী আম্মা : ওহো! তোর ভালোবাসা বুঝি প্রলয়ের মত এসেছিল।

গোপালন : তা নয় মামী।

জানকী আম্মা : তাহ'লে কী ভাগ্নে?

গোপালন : আমার তোমাদের ওখানে যাওয়াটা এখন ঠিক দেখায় না।

জানকী আম্মা ঃ কেন ঠিক দেখায় না?

গোপালন ঃ লোকে কী বলবে সেটা ভেবে দেখছ না কেন?

জানকী আম্মা ঃ লোকে কী বলবে? বলবে যে তোর বেশ দয়ামায়া। তোর মনুষ্যত্ব আছে। সেটা কি খুব খারাপ কিছু?

গোপালন ঃ না তা নয়। কমলমের বিয়ে হয়নি আর ও যখন বাড়ী আছে......

জানকী আম্মা ঃ সেই কথাটাই আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি। কেন ও অমন ভাবে বাড়ীতে বসে আছে? তার জন্য দায়ী কে?

গোপালন ঃ কে?

জানকী আম্মা ঃ একথা জিজ্ঞেস করতে তোর একটুও লজ্জা হচ্ছে না? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি...... হ্যাঁ শোন তুই-ই—এর জন্যে দায়ী।

গোপালন ঃ আমি?*

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ......তুই-ই......একমাত্র তুই।

গোপালন ঃ আমি কী করেছি?

জানকী আম্মা ঃ তুই কী করেছিস? তুই যা করার করিসনি। এই হচ্ছে কথা।

গোপালন ঃ মামী এ নিয়ে আমাকে আর বিশেষ কিছু বোলোনা। এ ব্যাপারে আমার মত তোমাকে আমি অনেক আগেই বলে দিয়েছি।

জানকী আম্মা ঃ আহা! দেখো দেখো, এবার ফণা তুলতে আরম্ভ করেছে দেখো। তুই বলে দিলেই হয়ে গেল? জানিস লোকে কী জীজ্ঞেস করছে, কী বলছে?......ঐ গোপালন নায়ার ওখানে কাঠের মতো বসে থাকতে আমাদের বিরক্ত করা কেন......আমি এর কী উত্তর দেব? তুই তো অনেক পড়েছিস। তুই-ই বল্।

গোপালন ঃ বলবে যে আমি বিয়েই করবো না।

জানকী আম্মা ঃ বলেছি, হাজার বার বলেছি, কিন্তু তারা কি তাই বিশ্বাস করে নাকি?

গোপালন ঃ কেন, তাদের বিশ্বাস করলে ক্ষতিটা কী?

জানকী আম্মা ঃ তোরই বা কী ক্ষতি যদি ওকে বিয়ে করিস?

গোপালন ঃ সেটা আমার ভালোমন্দ লাগার ব্যাপার।

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ, তেমনি বিশ্বাস করা না করা তাদের ব্যাপার।

গোপালন ঃ আমি এখন এর জন্যে কী করতে পারি?

জানকী আম্মা ঃ তোর ওকে বিয়ে করতে হবে।

গোপালন ঃ তা সম্ভব নয় মামী......এ নিয়ে আমাদের আর আলোচনা করার দরকার নেই।

---

* কেরলের হিন্দুদের মধ্যে মাসতুতো পিসতুতো ভাই-বোনে বিয়ে হয়।

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ তাহ'লে আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। লোকেরা কী বলছে জানিস? ওর নাকি কী অসুখ আছে।

গোপালন ঃ অসুখ?

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ। হ্যাঁ অসুখ। ওদের প্রশ্ন! নইলে তুই কেন ওকে বিয়ে করছিস না? এরকমভাবে জিজ্ঞেস করাটা কী ঠিক নয়? তুই নিজেই একবার ভেবে দেখ্। ওর কমটা কোনখানে? ওর সম্পত্তি আছে। ম্যাট্রিক অবধি পড়েছে। তারপর আমার মেয়ে বলে বলছি না...সৌন্দর্য আছে...... সব কিছু থাকা সত্তেও তোর ওকে বিয়ে করতে আপত্তি কেন এই কথাই লোকে জিজ্ঞেস করছে।

গোপালন ঃ ওর কি অসুখ-বিসুখ কিছু আছে নাকি মামী?

জানকী আম্মা ঃ দেখ্ আমাকে দিয়ে বেশী বলাসনি। ওর অসুখ? একটা ভালো স্বাস্থ্যবতী মেয়ের অসুস্থ বলে খারাপ নাম করে দিয়ে এখন জিজ্ঞেস করছে দেখ না!

গোপালন ঃ এর জন্যে আমাকে এখন কী করতে হবে?

জানকী আম্মা ঃ বিশেষ কিছু নয়। ওকে কাপড় কিনে দিয়ে এখানে নিয়ে এলেই হবে।*

গোপালন ঃ তা সম্ভব নয়।

জানকী আম্মা ঃ ঠিক আছে। তাহ'লে ওর জন্যে একটা সম্বন্ধ খুঁজে নিয়ে আয়।

গোপালন ঃ আমি খোঁজ করলে কেউ কি রাজী হবে? আমিই তো বিয়ে করতে পারি একথা কি তারা বলবে না?

জানকী আম্মা ঃ আমিও তো তাই বলছি। একমাত্র উপায় হচ্ছে তোর ওকে বিয়ে করা।

গোপালন ঃ তা সম্ভব নয় মামী। আমাকে মিছিমিছি জোর কোরো না।

জানকী আম্মা ঃ এইটাই কি তোর শেষ কথা?

গোপালন ঃ হ্যাঁ, শেষ কথা।

[বিক্রমন পিল্লা প্রবেশ করল]

বিক্রমন ঃ আরে এ কে? দিদি নাকি? অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কী ব্যাপার, এখানে আসার কথা যে মনে পড়ল হঠাৎ।

জানকী আম্মা ঃ এখন না এসে পারা গেল না তাই।

বিক্রমন ঃ কেন, কী ব্যাপার?

জানকী আম্মা ঃ তুমি কিছু শোনোনি?

বিক্রমন ঃ না।

---

* নায়ার—বিয়ের একটা আচার।

জানকী আম্মা ঃ গোপালন কিছু বলেনি?

বিক্রমন ঃ না! এই রাস্কেল, তুই তাহলে এমন কাজ করলি?

গোপালন ঃ (ঘাবড়ে গিয়ে)—কী? কী কাজ?

জানকী আম্মা ঃ কেউ যাতে জানতে না পারে এমনিভাবে কাজটা করতে হবে এটাই ওর জেদ ছিল।

গোপালন ঃ মামী, তুমি এসব কী বলছ?

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা ঠিকই। এতবছর ধরে বিয়ে করবো না করবো না বলে এসেছে......

বিক্রমন ঃ কিন্তু আমাকে অন্ততঃ একবার বলতে পারতো।

জানকী আম্মা ঃ হ্যাঁ, তোমাকে নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল। আমি তো ভেবেছিলাম হয়তো বলেছে।

বিক্রমন ঃ উঃ, কী সাংঘাতিক ছেলে! টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

গোপালন ঃ তোমরা সব পাগলের মত কী বকছ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিক্রমন ঃ দিদি, এই ভিজে বেড়ালটা কখন হাঁড়ি উল্টোলো বলতো?

জানকী আম্মা ঃ গত চার তারিখে। সমস্ত কিছু গোপন করে রাখা হয়েছিল। ঐ দিনই ওকে নিয়ে গোপালন এখানে এসেছে।

বিক্রমন ঃ অ্যাঁ? তাহ'লে কমলম্ এই দশ পনের দিন এখানে ছিল? আরে, এযে দেখছি সত্যি করেই একটা সাংঘাতিক লোক। ওকে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল—অ্যাঁ?

গোপালন ঃ তোমাদের ব্যাপারটা কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিক্রমন ঃ দিদি, ও কী বলছে বলতো?

জানকী আম্মা ঃ ওর এসব কথা খুলে বলতে একটু লজ্জা হচ্ছে এই আর কী। ও তো সব সময়েই লাজুক। তাই তো এত দেরী হ'ল।

বিক্রমন ঃ দিদি, তুমি কবে এলে?

জানকী আম্মা ঃ আমি এইমাত্র এসেছি। কমলম্ কি কখনো আমাকে ছেড়ে থেকেছে? এখানে আসতে যা সময় লেগেছে! তারপর রোজ চিঠি—এখানে এসো, এখানে এসো।

বিক্রমন ঃ কেন, ওকি জেলে বাস করছে নাকি!

গোপালন ঃ মামা......

বিক্রমন ঃ আমাকে কিছু জানাসনি বলে তোকে বেশ কিছু দেওয়া উচিত ছিল, তবে কমলম্ আর দিদির কথা ভেবে......

গোপালন ঃ মামা, দিস্ ইজ্ অ্যাবসার্ড, রিডিকুলাস! তুমি মামীর এই

সব আজেবাজে কথা বিশ্বাস করেছ নাকি? মামী যা বলছে তা সর্ব্বৈব মিথ্যে।

বিক্রমন : হ্যাঁ, হ্যাঁ মিথ্যে কথা! ঐ যে ট্রে ভর্তি করে খাবার-দাবার আর চা নিয়ে আসছে। ওকে দেখে কী বলবো মামীর সর্ব্বৈব মিথ্যে না তোর কথা?

বিক্রমন : নমস্কার কমলম্।

[কমলম্ ঢুকলো]

কমলম্ : নমস্কার। (ট্রে টেবিলের ওপর রাখলো)—কথা বলার লোক পেলে কফিও চাই না, ভাতও চাই না······আমার আবার বাইরে মুখ বার করার পর্যন্ত অনুমতি নেই। ঐ শঙ্কুটাও কোথায় পালিয়েছে। তারপর এখানে আপনারা ছাড়া আর কেউ নেই দেখে সাহস করে বাইরে এসেছি। এখন কফি খেতে খেতে গল্প করুন।

বিক্রমন : এই হতভাগা! কীরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ।

কমলম্ : ঐ ট্রেটা শুদ্ধু ওর মুখের ভেতর ঠেলে দাও।

গোপালন : উঃ, কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র—কী সাংঘাতিক উৎপাত এসব! আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি? এটা কী ত্রিবান্দ্রাম না ভেল্লারিকা শহর?

কমলম্ : সেসব পরে ঠিক করা যাবে। এখন কফিটা খেয়ে নাও তো।

জানকী আম্মা : কিন্তু খুকী তুই এতদিন ওর সঙ্গে কেমন করে রইলি?

গোপালন : বাস, বাস্, থামাও তোমাদের সব বাজে কথা। এই শঙ্কু······

[ভেতর থেকে শঙ্কু—কী? পরে পবেশ]

গোপালন : এরা সব কখন এখানে এল?

শঙ্কু : কারা?

গোপালন : এই যারা এখানে সব বসে রয়েছে?

বিক্রমন : শঙ্কু ঠিক ঠিক বলবি নইলে······

শঙ্কু : আমি এখান থেকে যাবার সময় শুধু বৌদি এখানে ছিল।

গোপালন : কোন্ বৌদি?

শঙ্কু : এটা কীরকম প্রশ্ন হ'লো দাদা? এখানে কজন বৌদি আছে?

গোপালন : এই—তোকেও কী ভূতে পেয়েছে নাকি? এখানকার বৌদি মানেটা কী?

শঙ্কু : এর উত্তর আমি আপনাকে কা দেব? বৌদি মানে এখানকার বৌদি, মানে আপনার বউ······মানে আপনি আমার সঙ্গে সেই যে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সেই বৌদি, মানে—

গোপালন : মানে মানে বেরিয়ে যা এখান থেকে। আচ্ছা! তোমরা সকলে মিলে আমার জন্যে বেশ ভালো একটা ফাঁদ তৈরী করেছ—তাই না?

বিক্রমন : গোপালন তুই ফ্রয়েড পড়েছিস ?

গোপালন : আমি ছাই পড়েছি !

বিক্রমন : এসব তুই আর কখন পড়বি ? তুই তো পিওর ম্যাথামেটিকসের মধ্যে ডুবে তার রস আস্বাদন করছিস। দিদি, ছোটবেলায় কোনো মহিলা বা বাচ্চা মেয়ে তোমার জানা বা অজানায় এর নাকের আগায় কামড়েছিল ?

জানকী আম্মা : দেখি, দেখি মনে করে দেখি। হ্যাঁ একটা শূর্পনখা ছিল বটে সেখানে।

বিক্রমন : গোপালন তার নাক কামড়েছে কিনা সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

জানকী আম্মা : না, না, শূর্পনখাই কামড়েছে। ও ঐরকমই ছিল। বিক্রমন কী করে তা জানতে পারলে ?

বিক্রমন : পেয়ে গেছি দিদি !

জানকী আম্মা : কী করে পেরেছ ?

বিক্রমন : ভগবান ফ্রয়েডকে আমি দূর থেকেই নমস্কার জানাচ্ছি। এবার বুঝতে পেরেছি ওর মেয়েদের এত ভয় কেন। এ নিশ্চয়ই ঐ কামড়ানোর জন্যে।

গোপালন : তুমি তোমার ফ্রয়েড নিয়ে এখান থেকে যাও তো।

বিক্রমন : দিদি, চলো আমরা ভিতরে যাই। বাকী কাজ সব এখন কমলম্ দেখবে। দশ পনের দিন ওর সঙ্গে থেকেছে তো—

গোপালন : যাও তোমরা সব এখান থেকে।

বিক্রমন : হ্যাঁ ! হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু কমলম্ এখন আর যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তারপর আর একটা কথা। আমার তত্বাবধানে, আমার বাড়ীতে ওকে আর একবার তোমার বিয়ে করলে ভালো হয় বলে আমার মনে হয়। কাল রাতে একটা শুভ মুহূর্তও আছে—

শঙ্কু : হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন।

গোপালন : এখান থেকে দূর হ' হতচ্ছাড়া। তোকে যদি আমি আর এখানে কোথাও দেখতে পাই……

বিক্রমন : এই শঙ্কু, তুই একটা বেরসিক। যা এখান থেকে ! তুই একটা কাজ কর। এই ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে চাবি দিয়ে আয়। চলো দিদি।

[তিনজনে চলে গেল]

কমলম্ : বাবাঃ কী রাগ……তা হোকগে রাগ। কফিটা তো খাও। ……এই যে এদিকে একটু তাকাও……এতক্ষণ তো এদিকে একটু তাকিয়ে দেখলেই না……আমি কিন্তু দেখতে কিছু খারাপ নই। ঈশ্বরের দোহাই……একবার এদিকে দেখ……শুধু একবার—হ্যাঁ ঐ রকম ভাবে। আমি যা বলেছি তাকি মিথ্যে ?……এখন এই কফিটা খাও……খাও না……হাত কাঁপলে আমি কাপ

ধরে রাখবো। আচ্ছা কেন এত রাগ?……আমি কী করেছি? তা সে যাই হোক্ কফিটা খাও! এ কফি শঙ্কুর তৈরী নয়, এ কফি তৈরী করেছে সাক্ষাৎ কমলম্……ওহো তুমি তাহলে হাসতেও জানো?……হাসিটা বন্ধ করলে কেন? বেশ দেখাচ্ছিল।

গোপালন ঃ হুঁঃ, তুমি খুব মেয়ে একখানি বটে!

কমলম্ ঃ এতক্ষণে তা বুঝতে পারলে?

গোপালন ঃ এই ষড়যন্ত্রে তুমিও রয়েছ দেখে আমার অবাক লাগছে।

কমলম্ ঃ তুমি যদি অমন ব্যবহার করো তাহলে আমি কী করি বল?

গোপালন ঃ তুমি সত্যিই খুব চালাক।

কমলম্ ঃ তুমি তা স্বীকার করছ?

বিক্রমন ঃ (ভেতর থেকে)—কমলম্!

কমলম্ ঃ কী?

বিক্রমন ঃ (ভেতর থেকে)—ব্যাপারটা কী রকম চলছে?

[গোপালন নায়ার হেসে ফেল্ল—বাকী সকলেও হাসতে লাগলো]

কারচুপি

এন্. কৃষ্ণ পিল্লা

চরিত্র

শঙ্কু পিল্লা

পার্ব্বতী আম্মা

পোন্নামা

কেশব পিল্লা

শ্রী এন্. কৃষ্ণ পিল্লা মলয়ালম নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের দাবী করতে পারেন। মলয়ালম নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ও থিয়েটারে যখন সস্তা হাস্যরসের যুগ চলছে তখন ইবসেনের অনুগামী হয়ে তিনি সিরিয়াস নাটক লিখেছেন। নাটক সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করা প্রফেসর কৃষ্ণ পিল্লার 'ভগ্নভবন', 'কন্যা', 'বলাবল', 'দর্শন', 'অসূর্যম্পশ্যা' প্রভৃতি নাটকগুলি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আলোড়ন ও পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। শিশুসাহিত্যে এবং মলয়ালম সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর দান অসীম। তাঁর জন্ম 1916 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মলয়ালম সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তিনি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি 18টি সাহিত্যকৃতীর স্রষ্টা। সম্প্রতি তিনি 'মলয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস' রচনায় নিযুক্ত। বর্তমান একাঙ্কটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কারচুপি

[গ্রামের এক ধনী পরিবারের বাড়ীর সামনের বারান্দায় বাড়ীর মালিক শঙ্কু পিল্লা আর তার স্ত্রী পার্বতী আম্মা কথা বলছে। শঙ্কু পিল্লা রোগাটে, লম্বা এক বৃদ্ধ। তার চোখ-মুখের ভাব দেখলে মনে হয় সে খুবই চালাক চতুর, আর যে কোনো অবস্থার মোকাবেলা করার ক্ষমতা সে রাখে। তবে তার স্বভাব চরিত্র খুব তাড়াতাড়ি বোঝা মুশকিল। তাকে দেখে লোকের মনে একটু কেমন যেন সন্দেহ জাগবে। কানের ফুটোতে দুটো ছোট্ট মাকড়ী মত, গলায় একটা রুদ্রাক্ষ দিয়ে গাঁথা সুতো। কানের খাড়া লোমগুলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার স্ত্রী পার্বতী আম্মা এক গ্রাম্য বৃদ্ধা। তার শরীর বেশ সুস্থ সবল, বাড়ীর সব কাজকর্ম সে এখনো করতে পারে। সম্প্রতি সে যে খুব মনোকষ্টে আছে তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

দুজনেই গ্রাম্য পোষাক পরা]

শঙ্কু পিল্লা ঃ দেখা যাক্, কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে।

পার্বতী আম্মা ঃ দেখার কী আছে। ছেলেটা অন্য মেয়ে পেয়ে যাবে। তুমি এখন খুব বড় বড় কথা বলছ। তবে বাঁদর মরলে বাঁদর নাচানে ওয়ালার যা হয়, তোমারও সেই অবস্থা হবে।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (ঠাট্টার সুরে) বাঃ এমনিভাবে বলে তুমি যে সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছ। তুমি পাডুস্পাড়ির* চেয়েও নামকরা জায়গা থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ে এসেছ নাকি ?

পার্বতী আম্মা ঃ এরজন্যে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়তে হবে কেন ? যাদের বুদ্ধি আছে তারা বাড়ীর মধ্যে বসেই সবকিছু জানতে পারে।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (একটু রেগে) ওঃ খুব বুদ্ধিমতীরে ! যাও এখান থেকে। বোকার শিরোমণি একটা !

পার্বতী আম্মা ঃ হ্যাঁ যাবো, তবে একটা জিনিষ মেনে যাবো। জন্ম দিয়ে বড় করেছে যে বাবা, সেই বাবার তার নিজের মেয়ের মনোকষ্ট দূর করার কোনো ইচ্ছে আছে কিনা জেনে তবে কোথায় যাবে তা তার জন্ম দেওয়া মা ঠিক করবে। মেয়েটাকে এই অবস্থায় দেখে আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না। আমি কি লোহা না পাথর ?

---

* জ্যোতিষশাস্ত্র শেখার বিখ্যাত একটি জায়গার নাম।

শঙ্কু পিল্লা ঃ এই ঘাটের মড়া—আমার একটা মাত্র নয় আরো ছ'সাতটা ছেলেমেয়ে আছে।

পার্বতী আম্মা ঃ তাই নাকি? আমার তো তা জানা ছিল না। তুমি বল্লে পর জানতে পারলাম।

শঙ্কু পিল্লা ঃ আমার কাছে সব ছেলেমেয়েরা সমান।

পার্বতী আম্মা ঃ আমিও তো তাই বলছি। আমার কাছে সব ছেলে-মেয়েরা সমান। একজন যদি বাড়ীতে বসে কাঁদতে থাকে আর অন্যেরা ভালো অবস্থায় থাকে তাতে লাভ কী?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (খুব রেগে) আমাদের জিনিষ অন্য কারোর হাতে তুলে দিয়ে তারপর ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানোর বান্দা আমি নই।

পার্বতী আম্মা ঃ দেব বলে তুমি কথা দিয়েছ। এখন আজেবাজে কথা বল্লে চলবে কেন?

শঙ্কু পিল্লা ঃ তখন যদি আমি ঐরকম না বলতাম তাহ'লে মেয়েকে আর তোমার পার করতে হোতো না। তাকে জড়িয়ে ধরে এখানে তোমাকে বসে থাকতে হ'তো।

পার্বতী আম্মা ঃ এখনো জড়িয়ে ধরে বসে আছি তাই না? মানুষ হ'লে একটু সত্যি কথা বলতে হয়।

শঙ্কু পিল্লা ঃ সত্যি নিয়ে বসে থাকলেই হয় নাকি? দূর দূর! এসব কথা কাঠের গাধাকে বলে লাভটাই বা কী?

পার্বতী আম্মা ঃ আছে আছে, লাভ আছে। ভালো কথা আমিও বলতে পারি কিন্তু তা শোনার লোক কই?

শঙ্কু পিল্লা ঃ আমার কিছু শোনার দরকার নেই। কারোর আমাকে উপদেশ দেওয়ারও দরকার নেই। আজ অবধি কারোর উপদেশ শুনিনি। আমার যা করার তাই করবো।

পার্বতী আম্মা ঃ (খুব অধৈর্য ভাবে) উঃ মানুষের আর কিছু না থাক একটু মান-অপমানের ভয় নেই? গাঁয়ের এক একজন এক এক রকম ভাবে জিজ্ঞেস করলে কাঠের গাধারও অসহ্য হয়ে ওঠে। ঐ নানিআম্মা সেদিন জিজ্ঞেস করছিল—পোন্নাম্মা চোখ বন্ধ করে খোলবার আগেই স্বামীকে ছেড়ে চলে এলো যে? স্বামীর ঘরকরা হয়ে গেল নাকি? তারপর ওবাড়ীর কল্যাণী বলছিল—"ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি হওয়াতে বোধহয় পোন্নাম্মা চলে এসেছে, তাই না?" এছাড়া আরো কত পাড়া-প্রতিবেশী, মন্দিরের বন্ধু-বান্ধব, ঐ পাঁপড় বিক্রী করা, তেল বিক্রী করা, কাপড় কাচার লোকগুলো সব যখন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে জিজ্ঞেস করে তখন আমার মাথায় পাথর ঠুকে মরতে

ইচ্ছে করে! সব আমার কপালের দোষ। আমার ভাগ্য......(কাঁদতে লাগলো)।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (একটুও গলে না গিয়ে) এই কাঁদুনে মেয়েলোকটির তার মেয়েকে একটু সাহস জোগানো উচিত ছিল। মেয়েটার যদি সেইটুকু সাহস থাকতো তা'হলে ও ঐ ছেলেটার কথা শুনে এখানে পড়ে থাকতো না। ওর উচিত ছিল ওর স্বামীকে ঠিকমত গণ্ডীর মধ্যে বসিয়ে রাখা।

পার্বতী আম্মা ঃ আমার যারা আপনজন তাদের কাউকেই খড়ীর গণ্ডীর মধ্যে বসিয়ে রাখার মত সাহস আমার মেয়ের দরকার নেই। আমরা এরকম ব্যাভার করতেই জানি না।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (অগ্রাহ্য ভরে) ওঃ বড় বড় কথা! তুমি যে এরকম ভাবে বলবে তা আমি জানি। তোমার মেয়েকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। তোমার মেয়ে তোমার জামাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এখানে এসেছে. সম্পত্তির ভাগ নিতে। মা-বাপের ভালোমন্দ সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা নেই তোমার মেয়ের।

পার্বতী আম্মা ঃ ইস্ তুমি এসব কী বলছ? স্বামীর খারাপ ব্যাভার সহ্য করতে না পেরেই না মেয়ে আমার এখানে চলে এসেছে। আর এখন এখানেও তাকে গালমন্দ শুনতে হচ্ছে। এখানে আসার কতদিন পরে ও সম্পত্তি ভাগের কথা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছে? এসব জেনেশুনেও তুমি এই রকম ছোটলোকের মত কথাবার্তা বলছ? (মুখ লাল হয়ে গেল)

শঙ্কু পিল্লা ঃ এই গাড়োল, তোমার মেয়ে এখন আরো বেশী ঢঙঢাঙ দেখাবে। ওর কাছে আমরা এখন কে? আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করলেও সে কি তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি? এখান থেকে যতখানি পাওয়া যায় সবকিছু টেনেটুনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া ওর কি আমাদের সম্বন্ধে আর কোনো বিবেচনা আছে? কে জানে এসব কৌশল ঐ মেয়েই জামাইকে বলে দিয়েছে কিনা।

পার্বতী আম্মা ঃ (অত্যন্ত শুকনো স্বরে) কী কৌশল? ছিঃ ছিঃ এ কথা বলার জন্যে তোমার জিভও উঠলো? ওখানে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেই না মেয়েটা এখানে এসেছে? এক, মেয়েটাকে যে ঘর করতে নিয়ে গেছে সেই স্বামীর ওর ওপর একটু সহানুভূতি দেখানো চাই, নয়তো যে মেয়েকে বিদায় করেছে সেই মেয়ের বাপের একটু দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো চাই। দুয়ের কোনটাই না থাকলে বেচারী মেয়েটা করে কী?

শঙ্কু পিল্লা ঃ শোনো, এ সংসারের অনেক কিছু দেখেছে এই শঙ্কু পিল্লা। তোমার মেয়ে-জামাই দুজনে ষড়যন্ত্র করে আমার সম্পত্তি নেবার মতলব করলে আমি কি দিয়ে দেব নাকি? আমি জানি এর ওষুধ। এইসব

অভিনয় তোমার মত একটা হাবাগোবাকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু আমার মত একটা পুরুষকে বোকা বানাতে পারবে না। এখানে যেমন একা-একা এসেছে, তেমনি একা-একাই আবার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে। কেমন করে যাবে তার অস্ত্র আমার হাতে আছে, তুমি দেখে নিও।

পার্বতী আম্মা ঃ ওঃ তোমার অস্ত্র-শস্ত্র শেষে সেই পাখীর যেমন তেমন গর্তে গিয়ে ডিম পাড়ার মত ব্যাপার। যাক্ আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না।

শঙ্কু পিল্লা ঃ হ্যাঁ তাতো ঠিকই। যেখানে সেখানে গিয়ে ডিম পাড়া উচিত নয়। পাড়লে ডিম তো ভেঙে যাবেই। তুমি দেখতে চাও না-ভাঙা ডিম ?

পার্বতী আম্মা ঃ আমার দেখারও দরকার নেই, শোনারও দরকার নেই। অনেক দেখেছি, অনেক সয়েছি। আমার আর কিছু দরকার নেই।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (কোমরের গেঁজ থেকে একটা কাগজ বের করে যেন যুদ্ধ জয় করেছে এমনি ভাবে)—এই যে এদিকে দেখ। এটা কী জানো ?

পার্বতী আম্মা ঃ (উদাসীন ভাবে)—জানলেই বা কী ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ জানতে চাও ? জানলেই বা কী হবে ? এই চিঠিটা তোমার জামাই তোমার মেয়েকে পাঠিয়েছে। তোমার মেয়ে ওখানে খুব কষ্ট পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে, কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফোলানো তোমার মেয়েকে তোমার জামাই এই চিঠিটা পাঠিয়েছে। যে করে হোক্ আমাদের রাজী করিয়ে সম্পত্তির ভাগ চেয়ে নিতে হবে। যে কোনো কৌশল প্রয়োগ করে এ-কাজ হাঁসিল করতে হবে।

পার্বতী আম্মা ঃ (ভয় পেয়ে)—অ্যাঁ ? কে লিখেছে ? ঐ গোবিন্দন নায়ার ? পোন্নাম্মাকে ? আজ ছ'মাস হোলো মেয়েটা এখানে আছে আজ অবধি গোবিন্দন তাকে একটুকরো কাগজ পর্যন্ত পাঠায় নি। এখন এটা······ ?

শঙ্কু ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি। তোমার মত এমন নির্বোধ বিশ্বভুবনে আর একটিও নেই। তোমার মেয়ের কান্নাকাটিতেই তোমার চোখ পড়ে। আচ্ছা এই আমি তোমায় পড়ে শোনাচ্ছি।

(চোখে চশমা লাগিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগলো)

প্রিয়তমা পোন্নাম্মা,

তোমাকে দেখার জন্য আমার হৃদয়মন উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে। তোমারও যে আমাকে দেখার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে তা আমি জানি। কিন্তু আমাদের কাজটা যদি হাঁসিল করতে হয় তাহ'লে আরো কিছুদিন আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। এখন আমি ওখানে গেলে অথবা তুমি এখানে এলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ঐ শেয়ালটার যদি তোমার কষ্ট দেখে মনটা একটু না গলতে থাকে তাহ'লে

সব ভেস্তে যাবে। তুমি তো চালাক! সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করে দেখবে। মা'কেও বেশ ভালো করে নাড়া দেবে। যদি সত্যাগ্রহ করতে হয় তাও সই। আমাদের প্রাপ্য যদি এখন না পাওয়া যায় তাহলে আর কখনো পাওয়া যাবে না। তোমার চিঠির উত্তর পেতে খুব ইচ্ছে করলেও এখনকার মতো চিঠিপত্র কিছু লিখো না। তোমাকে আমায় চিঠি লিখতে দেখলে লোকটা আমাদের সব রহস্য জানতে পারবে। এই চিঠি আমি পোস্ট না করে কোচ্চুভেল্লুর হাত দিয়ে পাঠাচ্ছি যাতে ধূর্ত লোকটা না জানতে পারে। তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না বলে আমার মন খারাপ। —তোমার প্রিয়তম গোবিন্দন নায়ার।

এখন বুঝতে পারলে ঘাটের মড়া? আমাদের সংসারটা ধ্বংস করার মতলব। এবার আশা করি তোমার মাথাটা খোলসা হয়েছে।

পার্বতী আম্মা ঃ (আশ্চর্য, দুঃখ, রাগ, অসন্তোষ সব কিছু মেশানো স্বরে)—অঁ্যা? তুই ছেলেটা এতদিন ধরে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এইরকম চালাকি করছিলি? আর ঐ মেয়েটা আমার পেটে জন্মে এইরকম হয়ে গেছে? তা হবেই বা না কেন? এই বাপেরই তো মেয়ে!

শঙ্কু পিল্লা ঃ হঁ্যা, হঁ্যা সেটাও তো আমার দোষ। তা সেকথা যাক, ছেলেটা এখন খুব জব্বর খেলা শুরু করেছে। ওর বউ এখানে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে তার কাজ হাঁসিল করবে আর ও ওখানে বসে সম্পত্তির ভাগ এই পেল বলে বসে বসে জপ করছে। তার বউ এক্ষুনি তাকে একরাশ সম্পত্তি এনে দেবে।

পার্বতী আম্মা ঃ তুমি এই চিঠিটা পেলে কী করে? মেয়েটা পড়ে কোথাও রেখেছিল, সেখান থেকে বোধহয় নিয়েছ।

শঙ্কু পিল্লা ঃ আহা হা! এটা আমার একটা কৌশল। কোচ্চুভেল্লু চুপি চুপি এলে পর আমি একটা কৌশল করলাম। গাধাটা আমাকে চিঠিটা দিয়ে চলে গেল!

পার্বতী আম্মা ঃ চিঠিটা তুমি ক'বে পেয়েছিলে?

শঙ্কু পিল্লা ঃ একমাসের ওপর।

পার্বতী আম্মা ঃ সব জানা সত্বেও- আমাকে কিছু না বলে তুমি চুপচাপ ছিলে? অকৃতজ্ঞ!

শঙ্কু পিল্লা ঃ তোমাকে এখন বলেই ভুল করেছি।

পার্বতী আম্মা ঃ বলার দরকারও ছিল না। কেউ কি তোমাকে বলতে পেড়াপিড়ি করেছে নাকি?

শঙ্কু পিল্লা ঃ আমি যা বলেছি তা সব সত্যি। এর একটা অক্ষরও যেন আর কেউ জানতে না পারে। যদি কাউকে বলতো দেখবে মজা।

পার্বতী আম্মা ঃ হঁ্যা, আমি যেন বলার জন্যে বসে আছি!

শঙ্কু পিল্লা ঃ কাকে প্রথম বলবে তাই ভাবছ—না ?

পার্বতী আম্মা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো এতই বোকা। সকলকে ডেকে ডেকে বলার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ—আমি যা বলতে এসেছিলাম। ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি নেই। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব ভালোবাসা।

শঙ্কু পিল্লা ঃ হুঁ, তাতে ?

পার্বতী আম্মা ঃ তুমি এমনভাবে বলছ যেন গিলে খাবে আমায়। যাক্ যা বলছি। আমরা যেন মেয়ে জামাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাবার কারণ না হই। তাই আমাদের যা আছে তা যদি ভাগ করে যাদের দেবার তাদের……

শঙ্কু পিল্লা ঃ (খুব রেগে) কাদের ? কাদের সম্পত্তি ভাগ করে দেবো ? তোমার হুকুমে নাকি ? যাও যাও, বেশী উপদেশ দিতে এসো না। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ওদের চোখ এতে যেন না পড়ে। সে গুড়ে বালি।

পার্বতী আম্মা ঃ তুমি ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাতে চাও ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ ফাটল ধরলে আমার কিছু এসে যায় না। তবে হ্যাঁ, সম্পত্তি গেলে কিছু এসে যাবে। আমাদের ওপর একটু রাগ হ'লেও মেয়ের কোনো ক্ষতি হবে না। ও ছেলেটা মেয়েটাকে ভালোই বাসে। চিঠিটা দেখলে না ? ও মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে না। বাস—আর কী চাই ?

পার্বতী আম্মা ঃ কোনো গোলমাল নেই বলেই বুঝি মেয়েটা ছ'মাস এখানে বসে আছে ! আর ছেলেটাও কি ওর খোঁজখবর এর মধ্যে করছে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ আরে এটাই তো ওদের কৌশল। আমাদের যখন খারাপ লাগবে তখন ওদের ফাঁদে ধরা দেব, তাই না ওদের আশা ? কিন্তু ওদের কোনো কৌশলই কাজে লাগবে না। তুমি দেখে নাও কাল আমি পোন্নাম্মাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেবো।

পার্বতী আম্মা ঃ কী ? কী ? এতকাল ধরে এত ছলচাতুরী করেও আশ মেটেনি ? হ্যাঁ, তারপর আমিও বলে দিচ্ছি বাতাস আবার উল্টো পিঠেও ঝাপটা মারবে।

শঙ্কু পিল্লা ঃ সেসব তোমার মত বোকা গাড়োল মেয়েছেলেদের জেনে কাজ নেই। তুমি গিয়ে খেতের মজুরদের ভাত রান্না হয়েছে কিনা দেখো গিয়ে। হ্যাঁ, তারপর আমি যা তোমায় বলেছি তা যেন একটা লোকও জানতে না পারে।

পার্বতী আম্মা ঃ হ্যাঁ আমি গিয়ে এক্ষুনি বলছি !

[চলে গেল]

[শঙ্কু পিল্লা চিঠিটা কোমরের কাপড়ে গুঁজে রাখলো। তারপর বসে বসে পান খেতে লাগলো। তার মেয়ে পোন্নাম্মা ঢুকলো। বয়স পঁচিশ, সুন্দরী কিছু নয়। মেয়েটি চালাক চতুর কিন্তু এখন তার মুখখানি ভার-ভার।]

শঙ্কু পিল্লা ঃ কী রে, তুই যে মন্দির থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি ? আরতি হয়ে গেল ?

পোন্নাম্মা ঃ (নির্লিপ্ত স্বরে)—কে বলল আমি মন্দিরে গেছি ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (একটু ভয় পেয়ে)—তুই কি এখানেই ছিলি নাকি ?

পোন্নাম্মা ঃ (বিরস মুখে)—আমি এখানে ছাড়া কোথায় আর এখন থাকবো ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (আরো একটু ভয় পেয়ে)—তুই তাহলে এখানেই ছিলি। বেশ কিছুক্ষণ হলো তোকে এখানে দেখতে পাইনি তো।

পোন্নাম্মা ঃ আমাকে যারা দেখতে পারে না তারা আমাকে সময় সময় দেখতে পায় না।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (গাম্ভীর্যের ভাব দেখিয়ে) যারা তোকে দেখতে পারে না তারা তোকে যেন দেখতে পায়নি এমনি ভান করে। আমি কিছু না জেনেই তুই মন্দির বা অন্য কোথাও গিয়ে পূজো দিচ্ছিস নাকি জিজ্ঞেস করে ফেলেছি, মা।

পোন্নাম্মা ঃ যাদের কপালে কষ্ট আছে তারা যেখানেই থাক না তার ফল ভালো হয় না।

শঙ্কু পিল্লা ঃ যাদের কপালে ভোগ লেখা আছে তারা যেন সব কিছুতেই লাফ না দিয়ে পড়ে। লাফ দিয়ে না পড়লে এসব কিছুই হতো না। সেই বদমায়েশটা আমার মেয়েটাকে……

[দুঃখ আর রাগের ভাব দেখালো]

পোন্নাম্মা ঃ (একটু আশ্চর্য হয়ে তার চেয়েও বেশী ঈর্ষার সঙ্গে)—কী ব্যাপার বাবা ! তুমি মানুষকে শাপান্ত করতে তৈরী হয়ে বেরিয়েছ বলে মনে হচ্ছে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ মানুষ ! ঐ লোকটা আবার মানুষ ! আমার মেয়েটাকে ওখানে তিষ্ঠোতে না দিয়ে তার ব্যবসা……পরিবারের ওপর এইরকম খারাপ…… সব আমার কপাল। ছেলেটাকে দোষ দিয়ে লাভ কী ?

[দুঃখের ভান করলো]

পোন্নাম্মা ঃ কার কথা তুমি বলছ বাবা ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ কার কথা আর বলবো ? এই তোর বুড়ো বাপের কথাই বলছি।

পোন্নাম্মা ঃ অ্যাঁ, তোমার কথা ? তোমার কী হয়েছে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ হয়েছে একটা কিছু। বলে আর লাভ কী !

পোন্নাম্মা ঃ দুঃখ করার বা বলার কী কারণ হয়েছে বাবা ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ কী বলবো, মা ? না বল্লেই ভালো হয়। হুঁঃ ও যেন মনে রাখে ; আমার মেয়েকে ঠকিয়ে যদি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বাস করে, তাহ'লে ভগবান ওকে শাস্তি দেবেন।

পোন্নাম্মা ঃ (ভয় পেয়ে) কী ? অন্য মেয়ে ? বাস করবে ? কে ? কাকে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (ভেতরের খুশী চেপে বাইরে দুঃখের ভান করে)—কে ? কার সঙ্গে থাকতে পারে না বল না। সময় এখন বদলে গেছে।

পোন্নাম্মা ঃ (খুব অস্বস্তির সঙ্গে)—তুমি অন্য কারোর কথা বলছ। না··· ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ তোর ভয় পাবার কিছু নেই, মা। তোর খুঁটি আছি আমি। ওর কথা ভেবে তো আর আমি তোকে এত বড়টা করিনি।

পোন্নাম্মা ঃ বাবা, বল, বল শীগ্গির খুলে বল সব। আভাসে-ইঙ্গিতে বলে আমাকে ভয় পাওয়াচ্ছ কেন ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)—আমাকে দিয়েই তুই বলাবি ?

পোন্নাম্মা ঃ ওঃ মা ! বাবা তুমি বলতে পারো না এমন কী ঘটেছে ? তা যাই হোক্ না কেন বলো !

শঙ্কু পিল্লা ঃ কী বলবো, মা ? ঐ মহা পাজীটা আমাদের ঠকিয়েছে। এখনি তো সব জানতে পারলাম যে কেন এ বদমায়েশটা তোর ওপর অত্যাচার করে তোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পোন্নাম্মা ঃ কেন পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা ? কিছু গোপন না করে বলে ফেল।

শঙ্কু পিল্লা ঃ তুই সেটা সহ্য করতে পারবি ?

পোন্নাম্মা ঃ হ্যাঁ, পারবো বাবা।

শঙ্কু পিল্লা ঃ সেই ধড়িবাজটা এখন অন্য আর একটা জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ করছে।

পোন্নাম্মা ঃ (বজ্রাহতের মতো)—কে ? বিয়ের সম্বন্ধ ? কাকে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ যাকেই বিয়ে করুক না কেন ফল তো একই (রাগের ভাব দেখিয়ে) ওকে আমি ছাড়বো না। ও ভেবেছে কী। বদমাইশ !

পোন্নাম্মা ঃ (গদগদস্বরে)—কে বলেছে তোমায় এ কথা ? তুমি জানলে কী করে ? এটা কী সত্যি কথা ? যদি হয় তাহলে, তাহলে···

শঙ্কু পিল্লা ঃ আজ অবধি আমাকে মিথ্যে বলেনি এমনি একটি লোক আমাকে এই ব্যাপার জানিয়েছে। তাকে তুই চিনিস না। আমি কেমন করে বিশ্বাস না করে পারবো ?

পোন্নাম্মা ঃ কী করে বিশ্বাস করবো বাবা যে পুরুষ মানুষ এমন ব্যবহার করবে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ ভালো লোকেরা করে না। কী আর বলবো, মা। এ সবের মূল আমি। ঐ বজ্জাত লোকটার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছি বলেই না তোকে আজ এতটা দুঃখ সহ্য করতে হচ্ছে।

পোন্নাম্মা ঃ তোমার বন্ধু কি জানিয়েছে যে কার সঙ্গে কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ কোথায় ? আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই কথাটাই তো আমি ভুলে গেছি। ওখানে কোথায় যেন খুব একটা বড় লোকের বাড়ীর সঙ্গে ; টাকার জন্যেই

না এইসব ছেলেরা ঘুরঘুর করছে। মেয়ের বাড়ীর থেকে কথা দেয়নি। আমরা গিয়ে যদি ঝগড়া করি তাদের সেই একটা ভয়।

পোন্নাম্মা ঃ ওঃ তাহ'লে এই কারবারের জন্যে আমাকে এখানে পাঠাবার জন্য এতদিন উৎসাহ জুগিয়েছে। পাজী বদমাইশ!

শঙ্কু পিল্লা ঃ তাই জন্যেই তো এতদিন ছেলেটা সম্পত্তির ভাগের জন্যে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করছিল! এই অবস্থায় আমি যদি তাকে সম্পত্তির ভাগ দিতাম তাহলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াতো বুঝে দেখ্।

পোন্নাম্মা ঃ আমি এখানে এসেছি বলেই এইসব গণ্ডগোল হলো। আমি যদি চলে না আসতাম তাহ'লে কি এইসব কিছু ঘটতো।

শঙ্কু পিল্লা ঃ তুই এসেছিস তো কী? ও যদি তোকে ছেড়ে দেয় তো দিক। তুই তাতে চিন্তা করিসনি। তোর সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করার সবকিছুই ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখানে আছে।

পোন্নাম্মা ঃ (হঠাৎ দৃঢ়নিশ্চিত ভাবে) না বাবা, আমার একবার জানতে হবে। সব ব্যাপারটা দেখতে হবে। আমি ওখানে ফিরে যাচ্ছি।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে দেখে খুশী হ'য়ে, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে)—তোকে কোথাও যেতে হবে না। তোকে আমি যেতেও দেব না। তুই এখন ওখানে গেলে ও তোকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেবে।

পোন্নাম্মা ঃ যদি এতটাই হ'য়ে থাকে তাহ'লে এটাও হোক। আমাকে মারুক। আমি আজই যাবো। যদি ঐ মানুষটার সাহস থাকে তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলুক।

শঙ্কু পিল্লা ঃ আরো বেশী অপমান টেনে না এনে, তুই আর কোথাও না গিয়ে, এখানেই থাক। যা হবার তাই হবে।

পোন্নাম্মা ঃ না, আমাকে যেতেই হবে। আমার সঙ্গে আর কারোর আসতে হবে না।

শঙ্কু পিল্লা ঃ তুই যা বলছিস তাতে ফল হবে না। তোকে পাঠাবার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। তারপর তোর খুশী। আমাদের সঙ্গে থাকতে যদি তোর ভালো না লাগে সে অন্য কথা। যাহোক্ যদি যেতে চাস তো কাল গেলেই হবে।

[কেশব পিল্লা ঢুকলো। তার পয়তাল্লিশ বছরের মত বয়স হবে। এক নজরে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে লোকটি বেশ কাজের। তার চাল-চলনে, কথাবার্তায় সবকিছুতে একটা প্রাণ রয়েছে বলে মনে হয়।]

শঙ্কু পিল্লা ঃ আরে এস এস, কেশব পিল্লা।

পোন্নাম্মা ঃ হাঁ, এক্ষুনি সব খবর জানা যাবে। কেশব মামার অজানা কিছুই নেই।

শঙ্কু পিল্লা ঃ তুই একটু ওদিকে যা তো পোন্নাম্মা। আমরা একটু কথা বলি।

পোন্নাম্মা ঃ আমারই তো সব জানার কথা। আমিই জিজ্ঞেস করছি।

শঙ্কু পিল্লা ঃ তোর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। সবকিছু জেনে আমি তোকে বলবো'খন।

কেশব পিল্লা ঃ (বসে) ওহো—তাহ'লে এখানে আপনারাও সব জানতে পেরেছেন ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (একটু অস্বস্তির সঙ্গে) অ্যাঁ ? কীসব জানতে পেরেছি ? পোন্নাম্মা তুই একটু ভেতরে যা তো।

পোন্নাম্মা ঃ হ্যাঁ কিছু কিছু জেনেছি মামা, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি বলুন তো সব।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (খুব অস্বস্তির সঙ্গে)—কেশব পিল্লা চলো আমরা বাইরে গিয়ে কথাবার্তা বলি। এসো, এসো। [উঠে দাঁড়ালো]

কেশব পিল্লা ঃ না দাদা, বাইরে যাবার দরকার নেই। মেয়েটার কাছে লুকিয়ে রেখে লাভ কী ? ওরই তো সব জানার কথা।

শঙ্কু পিল্লা ঃ (ভয় পেয়ে) কী জানার কথা ? জানার মত কী আছে।

পোন্নাম্মা ঃ (হতবুদ্ধি হয়ে) জানার মত কিছুই কি নেই বাবা ? তুমি বলছ কী ? কিছুই যদি হয়নি তাহ'লে তুমি এতক্ষণ মনগড়া কথা বলছিলে নাকি ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ ওটার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা অন্য ব্যাপার। চলো কেশব পিল্লা আমরা বাইরে যাই।

কেশব পিল্লা ঃ ব্যবসায়ে যার ক্ষতি হ'লো তারই কি খবরটা জানা উচিত না ?

পোন্নাম্মা ঃ ব্যবসা ? কীসের ব্যবসা ? কার ক্ষতি মামা ?

কেশব পিল্লা ঃ সব জেনে শুনে একথা জিজ্ঞেস করছিস ? এতদিন ধরে বাবা, মেয়ে জামাই মিলে যে ব্যবসা করছিলে……তার ক্ষতির কথা জানতে পারোনি, জানতে চাও না ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (হতবুদ্ধি হয়ে) এসব কী তুমি বলছ কেশব পিল্লা ?

কেশব পিল্লা ঃ শঙ্কু দাদা, আপনার ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। পোন্নাম্মার আর ঐ গোবিন্দন নায়ারের ব্যবসায়েরও ক্ষতি হয়েছে—বুঝলেন কিছু ?

পোন্নাম্মা ঃ কিছুই বুঝলাম না মামা। সব কিছু খুলে বলুন।

শঙ্কু পিল্লা ঃ কিছুই বলতে হবে না। কেশব পিল্লা। চলো আমরা ওদিকে যাই। চলো, চলো।

কেশব পিল্লা ঃ আচ্ছা এটা কী ঠাট্টা বলুন তো দাদা ? এই বেচারী মেয়েটা যে এখন পথের ভিখারী হ'য়ে পড়লো তার কি শোনার কোনো দরকার নেই ?

শঙ্কু পিল্লা : সে কী? পথের ভিখিরী? কি হোলো? কে করলো?

পোন্নাম্মা : বাবা তুমি যেন কিছুই জানো না এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করছ। এতক্ষণ তো আমরা এই নিয়েই কথাবার্তা বলছিলাম। এখন তোমার এই রকম আশ্চর্য হ'য়ে যাবার মানেটা কী?

কেশব পিল্লা : যাক্ আমাকে তাহ'লে কিছুই বলতে হোলো না, বাঁচা গেল।

শঙ্কু : বলো, কেশব পিল্লা, কী বলার আছে। আমি কিছুই জানতে পারিনি। ভগবানের নামে বলছি কিছুই জানি না। শীগ্‌গির সব কিছু খুলে বল।

পোন্নাম্মা : (খুব গোলমালে পড়ে গিয়ে)—ব্যাপারটা কী? তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে নাকি, বাবা?

কেশব পিল্লা : শুধু তোর বাবার নয়। তোর আর ঐ গোবিন্দন নায়ারেরও তো মাথা খারাপ হয়েছে। সে যাক্। তোমরা জেনেছটা কী? পরে বলছি আমার যা বলার আছে।

শঙ্কু পিল্লা : কেশব পিল্লা আমরা কিছুই জানি না। তুমি এখন বলবে কী বলবে না?

পোন্নাম্মা : কেন তুমি মিথ্যে কথা বলছ?

কেশব পিল্লা : যে কোনো কিছুতে আজ অবধি সত্যি কথা বলেনি তার মিথ্যে কথা বলতে ঘৃণা হয় নাকি?

শঙ্কু পিল্লা : আমাকে কারোর উপদেশ দিতে হবে না।

কেশব পিল্লা : আমাদের কারোরই আপনাকে উপদেশ দেবার ইচ্ছে নেই। যখন উপদেশ দেবার দরকার ছিল তখন দিয়েছি। এখন উপদেশ দিয়েও লাভ নেই। উপদেশ না শোনার ফল এখন অনুভব করুন—মেয়ে, জামাই, শ্বশুর তিনজনেই।

শঙ্কু পিল্লা : বাব্বাঃ, তোমার কাছে ঘাট মানছি। আর সময় নষ্ট না করে ব্যাপারটা কী বলবে?

কেশব পিল্লা : সকলকেই আমি বলেছি, কেউ কোনোদিন শোনেনি আমার কথা। তখন বলে বোকা বনে গেছি, আর এখন?

শঙ্কু পিল্লা : এখন কী হয়েছে?

পোন্নাম্মা : কী হয়েছে মামা? উঃ ভগবানের দোহাই! কী হয়েছে বলুন, আর যন্ত্রণা দেবেন না।

কেশব পিল্লা : আজ আপনার জামাই কোথায় দাদা? সে লোকটি কী হেরে গেছে? না আপনি হেরে গেছেন? তেমনি ভাবে পোন্নাম্মা, তোর স্বামী কেমন ভাবে তোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তোর বাবার সম্পত্তির ভাগ নিতে চেয়েছে? তুই হারলেও তোর বাবা হেরেছে? যাক্ সেকথা। তোরা কেউ কী জিতেছিস?

পোন্নাম্মা ঃ তাহ'লে আপনি কী বলতে চান যে বাবা যা বলেছে তা সবই সত্যি ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ জামাই কী করেছে বলে তুমি বলছ ?

কেশব পিল্লা ঃ (পোন্নাম্মাকে) তোর বাবা কী বলেছে আমি জানি না, জানার দরকার নেই।

শঙ্কু পিল্লা ঃ ও তো এমনিই বলেছি।

পোন্নাম্মা ঃ এমনিই বলেছ ? কী, এমনি বলেছ ? তাহ'লে তুমি এতক্ষণ আমাকে যা বললে তা সব মিথ্যে কথা ?

শঙ্কু পিল্লা ঃ (লজ্জা পেয়ে)—ওসব এমনিই বলে ফেলেছি, মা।

পোন্নাম্মা ঃ আচ্ছা……এইসব বলে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার মতলব করেছিলে বুঝি? বাবা বলে তোমার লজ্জা নেই ? তুমি তাহ'লে কত কী অভিনয় দেখিয়েছ ?

কেশব পিল্লা ঃ তোর এরকম বলা সাজে না। মেয়ে বলে এজন্য একশবার লজ্জা হওয়া উচিত। তুইও তো ছয়মাস এই বাড়ীতে বসে তোর অভিনয় দেখিয়েছিস। নিজের মা, বাবা, পাড়া প্রতিবেশী সকলকে। সেই তুইই এখন বাপের দোষ দিচ্ছিস ? বাঃ ! বেশ তোদের ব্যাপার স্যাপার।

শঙ্কু পিল্লা ঃ হ্যাঁ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি আর সহ্য করতে না পেরে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলেছি। তুই আমাকে ক্ষমা কর, মা।

কেশব পিল্লা ঃ হ্যাঁ, আপনি সহ্য করতে পারেননি। কেমন করে সহ্য করবেন ? মেয়ের ওপর আজ অবধি ঠিকমতো ব্যবহার করেননি। সত্যি খুবই দুঃখের কথা। ঘুণধরা টাকার বাণ্ডিল বেঁধে মিথ্যে কথা বলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সম্পত্তির ভাগ দেবেন বলে। আপনি সকলকে ঠকাতে পেরেছেন বলে ভেবে-ছিলেন, তাই মেয়ের ঠকানোটা আপনি সহ্য করতে পারেননি। বিয়ের পর মেয়ে-জামাই পরস্পরকে ভালোবাসবে, সেই ভালোবাসাকে দোহন করে আপনার চুক্তি থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করে আনবেন বলে ভেবেছিলেন। আপনি একটি বিরাট মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক।

[শঙ্কু পিল্লা এর উত্তরে কিছু বলতে না পেরে চোখ পিটপিট করতে লাগলো।]

কেশব পিল্লা ঃ কী, এখন যে একটা কথাও বলতে পারছেন না ? জিভ নড়ছে না কেন ? কতবার আপনাকে বলেছি—দাদা, এইসব খারাপ কাজ করবেন না। মেয়ে বড় না সম্পত্তি বড় একথা বারবার বলেছি। এখন আপনার সম্পত্তি আর কাউকে তো দিতে হবে না। সম্পত্তি যেমন সাবধানে রক্ষা করছেন, মেয়েকেও সাবধানে রেখে দিন। ঐ লোকটাকে আর আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। ঐ লোকটা বন্ধন মুক্ত হয়েছে।

একটা খারাপ বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছে। তার আর আপনার সম্পত্তিতে দরকার নেই।

পোন্নাম্মা : খারাপ বাড়ী? মেয়ে? প্রেম হয়েছে? কী বলছেন আপনি মামা?

শঙ্কু পিল্লা ঃ অ্যাঁ ঐ ছেলেটা এমনি করলো? এখন আমার খুকীর কী হবে?

কেশব পিল্লা ঃ হ্যাঁ ঐ ছেলেটারও জব্দ হওয়া উচিত। ওর লোভ শুধু সম্পত্তির ওপর। তার জন্যেই না ও আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই লোকটাকেও আমি যথাসাধ্য ভালো করতে চেষ্টা করেছিলাম। বউয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তি নিয়ে পালাবার মতলব ছিল লোকটার। এখন হোলোটা কী? এক পয়সার সঙ্গতি নেই এমন একটা মেয়ের ফাঁদে ধরা পড়লো। প্রেম হয়েছে, প্রেম! হুঁ, ঐ লোকটার প্রেম। ছ'মাস বউ না থাকায় এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করলে……এই মেয়েটা রয়েছে……বাকীটা আর বলতে চাই না। বউ কাছে না থাকলে সকলেরই এইরকম পচা দুর্গন্ধ প্রেম হবে।

শঙ্কু পিল্লা ঃ সব দোষ আমারই কেশব পিল্লা। তোমার কথা না শুনেই আজ আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। তখন অহঙ্কারে কোনো ভালো পথ দেখতে পাইনি।

পোন্নাম্মা ঃ বাবা, দোষ আমারই! আমি অন্যায় করেছি। ইস্ এখনকার এই বুদ্ধি যদি তখন থাকতো!

কেশব পিল্লা ঃ দোষ অপরাধ যে-কেউই করতে পারে। কিন্তু ভুলত্রুটি করার অবস্থা সৃষ্টি না করাটা আমাদের দিয়ে সম্ভব দাদা।

পোন্নাম্মা ঃ মামা, তুমিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের যে করেই হোক তোমাকে বাঁচাতে হবে। তোমার পায়ে পড়ছি মামা।

শঙ্কু পিল্লা : হ্যাঁ, কেশব পিল্লা। তোমাকেই আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। ভাই, তুমি চাইলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

কেশব পিল্লা ঃ এখন আর আমি কী করতে পারি? করার সময় কিছু করা না হ'লে যত চালাকই হোক্ না কেন ঘটনার মোড় ফেরানো কী সম্ভব? ঐ মেয়েটা গর্ভবতী……

শঙ্কু পিল্লা ঃ অ্যাঁ, এতখানি গড়িয়েছে?

পোন্নাম্মা ঃ অ্যাঁ?……আমার তাহ'লে আর কোনো উপায়ই নেই মামা?

কেশব পিল্লা ঃ উপায় আছে। তোমাদের দু'জনেরই উপায় আছে। তোমাদের জামাইয়ের আরো বেশ কিছুদিন পরে উপায় পাওয়া যাবে। তোমাদের এখন বুদ্ধি খুলেছে। তোমরা এখন তোমাদের ভুল বুঝতে পেরেছ তাই না?

শঙ্কু পিল্লা ঃ বুঝতে পেরে আর এখন লাভ কী? সবকিছুই তো ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে ভাই।

পোন্নাম্মা :ঃ ভাঙা কাঁচ কুড়িয়ে তাকে কি আবার জোড়া দেওয়া যাবে মামা ?

কেশব পিল্লা ঃ কী আর করা যাবে ? ভুল করলে জীবনের কি শেষ করে দেওয়া যায় নাকি ? ভুল বুঝতে পেরে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হয়। যদি একটা ভুলের জন্য জীবন শেষ হয়ে যায় তাহ'লে এই বিশাল পৃথিবীতে একটা লোকও বেঁচে থাকত না। এই আমিই কতবার মরতে চেয়েছি। তোমরা তো জানো আমার কষ্টের কথা।

পোন্নাম্মা ঃ হ্যাঁ, তা আর জানিনা ? কিন্তু মামা, নিজের পরিবারের কথা না ভেবে অন্য সকলের কাজ করা, তোমার মত আমাদের কী সম্ভব হবে ! তোমার এই সাহস আর বুদ্ধি আমার কী করে হবে মামা ?

কেশব পিল্লা ঃ আমিও প্রথম প্রথম এইরকম ভয় পেয়েছিলাম। চীৎকার করে কেঁদেছিলাম। আজ আমার ভয় নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। আমার মন জমাট পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে আমার অনেক ভালোবাসার লোক আছে। তারা ভুল করলেও তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়, এই সত্য রোজ আমি শিখছি। স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা আমাকে ঠকিয়েছে, নিকট আত্মীয়-স্বজন আমার অনেক ক্ষতি করেছে, তাসত্বেও মানুষ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা। হয়তো আমি বোকা।

শঙ্কু পিল্লা ঃ তোমার এইসব দর্শন আমাদের মত বোকারা কী করে বুঝবে কেশব পিল্লা ? আমাদের মুখ এখন বন্ধ এইটুকুই আমি এখন জানি।

পোন্নাম্মা ঃ মামা, আপনি আমাদের একটা সাহায্য করুন। ঐ লোকটিকে রক্ষা করতে পারেন ? আমার ফিরে পাওয়ার জন্যে নয়। একটা লোকের মাথার জড়তা অন্তত: দূর হোক।

কেশব পিল্লা ঃ তার এখনো সময় আছে, মা। একবার ঘুরে ফিরে আসুক।

মাঝি

টি. এন. গোপীনাথন নায়ার

চরিত্র

বৃদ্ধ
যুবতী
ছেলে
মেয়ে
বাবা
গিরিজা

টি এন গোপীনাথন নায়ার একাধারে কবি, অভিনেতা এবং নাট্যকার। রেডিও নাটকের প্রযোজক হিসেবেও এঁর খ্যাতি রয়েছে। 1917 সালে এঁর জন্ম। এঁর পঁচিশটি নাটক এবং পাঁচটি একাঙ্ক নাটক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এঁর নাটকগুলি একাধিকবার মঞ্চসাফল্য লাভ করেছে।

মাঝি

[গ্রামের এক নদীতীর—রাত হয়েছে। দূরে গ্রামবাসীরা একে অন্যকে চীৎকার করে ডাকছে, তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছের থেকে দু-একটা ফল নদীর মধ্যে টুপটাপ করে শব্দ করে পরছে।

একটি যুবতীর কণ্ঠস্বর (একটু দূরে)—এই—এখানে কোনো ফেরি নৌকো নেই ?

একটি পুরুসের কণ্ঠস্বর—ঐ কুটীরে দেখো, হয়তো মাঝি ঘুমোচ্ছে।

একটু নিস্তব্ধতা……একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ।]

যুবতী ঃ এখানে কি কেউ নেই নাকি ?

বৃদ্ধ ঃ কে ?

যুবতী ঃ আমি। আমাকে ওপারে যেতে হবে। এখানে পৌঁছোতেই দেরী হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ ঃ (ধড়মড় করে উঠে পড়ার ভাবে)—খুব দেরী হয়ে গেছে…তাই না ?

যুবতী ঃ কী করবো। আমাকে এখুনি ওপারে যেতে হবে।

বৃদ্ধ ঃ আমার শরীরটা একটুও ভালো নেই।

যুবতী ঃ তা বললে হবে না। আমাকে আপনার সাহায্য করতেই হবে। বড্ড কষ্টের ব্যাপার। একবার……

বৃদ্ধ ঃ খুকী, তোমার গলার স্বর আমি আগে কোথাও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে ……কোথায় যেন……আচ্ছা আমি আলোটা একটু জ্বালাই……দেশলাই কোথায়……হ্যাঁ পেয়েছি।

যুবতী ঃ আলো কেন ? সুন্দর চাঁদের আলো তো রয়েছে।

বৃদ্ধ ঃ সুন্দর চাঁদের আলো—ওনমের চাঁদের আলো। (একটু হাসলো)। এই বয়সে চাঁদের আলোর সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়……তুমি কি একা নাকি ? (আবার হাসলো)। আমি বৈঠা নিয়ে আসি। কৈ বললেনা তো একা কিনা !

যুবতী ঃ হ্যাঁ একা, চলুন যাই।

বৃদ্ধ ঃ একা একা এই চাঁদের আলোয় নদী পার হওয়ার কোনো মজা নেই (হাসলো)। আর একজনকে চাই……তারপর তোমরা গান করবে…… এই বুড়ো চোখ বুজে নৌকো বাইবে……ভেবে দেখোতো কী মজার……আঃ কী সুন্দর চাঁদের আলো……চল যাই। (কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ) দেখছ কুকুরটা কী রকম ঘেউ ঘেউ করছে ? (কুকুরকে সম্বোধন করে) খোকা তুই এখানেই

থাকবি বুঝলি? (যুবতীকে) আমার যাওয়াটা ওর একটুও পছন্দ হচ্ছে না। (কুকুরকে) এক্ষুনি আসবো। আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবি। (হাসলো) আমিও অপেক্ষা করে থাকা মানুষ। আমি দরজা বন্ধ করি না। বন্ধ না করলেও কেউ আসে না।

যুবতী : এখানে আর কেউ নেই?

বৃদ্ধ : শুধু এই কুকুরটা। ওকি কম নাকি? ও সব দেখবে।

যুবতী : বাঃ আপনার তো বেশ মজার জীবন! (অন্য গলায়) নৌকো কই?

বৃদ্ধ : ঐ বকুল গাছটায় বেঁধে রেখেছি। ঢেউগুলো ঘুমপাড়ানি গান গেয়েও তাকে ঘুম পাড়াতে পারেনি। আমারই মত......এই নদীর হাতগুলোরও কি ব্যথা হয় না? (হাসলো), ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই?

যুবতী : এ জায়গার পাখীগুলোও বুঝি ঘুমোয় না? কী রকম কিচির-মিচির শব্দ করছে শুনতে পাচ্ছেন না?

বৃদ্ধ : একজন আর একজনের জন্যে অপেক্ষা করছে......কী করে ঘুমোবে?

যুবতী : আজ সকালে একজন রোগিণীকে কি ওপারে নিয়ে গেছেন? একটা গাড়ী করে হয়তো এখানে নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে তিন চারজন লোকও ছিল।

বৃদ্ধ : না, আমি দেখিনি......আজ?

যুবতী : হ্যাঁ আজ......থাকগে......এখন আসুন তাড়াতাড়ি।

[নৌকোর শেকল খোলার শব্দ]

বৃদ্ধ : উঠে পড়ো। আস্তে......একপাশে চাপ দিও না......আমার হাত ধর......আরে তোমার চটি সামলাও......পিছলে পড়ে যাবে। হ্যাঁ ঐ ভাবে......ভয় পেও না......ঐ পাটাতনের মাঝখানে বসো। এই নৌকোতে কুড়িজন লোক বসতে পারে।

যুবতী : আমার কোনো ভয়টয় নেই।

বৃদ্ধ : তুমি সাঁতার দিতে জানো?

যুবতী : না।

বৃদ্ধ : শহরে কলের জল, তাই না? এটা বড় নদী (হাসলো) ভয় করছে?

যুবতী : সাবধানে বৈঠে বইবেন।

বৃদ্ধ : আরে আমি যখন বৈঠে বইছি তখন তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

[নৌকো বইবার শব্দ]

বাঃ কী সুন্দর চাঁদের আলো! তোমার গলার স্বর কোথায় যেন শুনেছি। খুব চেনা এ স্বর।

যুবতী : নাঃ আমার গলা কোথায় শুনবেন? তা কী করে সম্ভব? আপনার ছেলেমেয়ে নেই?

বৃদ্ধ ঃ আমার ? (হাসলো) এই নৌকো আমার মেয়ে। (হাসলো), আমার স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, মা বাবা নেই……কেউ নেই (গলাটা ভিজে আসছে) খুকী তোমার ওপর আমার কেমন যেন একটা স্নেহ জাগছে। এটা কী বুঝতে পারছি না। আমাকে কি আগে কোথাও দেখেছ ?

যুবতী ঃ না, দেখিনি। আমি তো শহরে থাকি।

বৃদ্ধ ঃ কী রকম যেন……কী রকম যেন……একটা মমতা……আমার মনের কোন এক তীরে যেন আলোর প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে……আমি নিজেই বুঝতে পারছি না এটা কী। তুমি একটু পরেই তো আমাকে ছেড়ে চলে যাবে—তাই না ? এই সময়টুকু তোমায় খুকী বলে ডাকতে এই বুড়োকে অনুমতি দাও। তোমার আপত্তি নেই তো ?

যুবতী ঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) পিতৃস্নেহ কী আমি তা কখনোই জানতে পারিনি। খুকী বলে ডাকলে আমার শুনতে ভালোই লাগবে।

বৃদ্ধ ঃ বাঃ কী সুন্দর রাত ! খুকী একটা গান গাইবে ?

যুবতী ঃ আমার মন খুব চঞ্চল এখন। কী গান গাইবো ?

বৃদ্ধ ঃ যা হোক্ কিছু। গুণ্ গুণ্ শব্দ করলেই হবে। (যুবতী 'ওরে নৌকোরে'…… এই গানটা গাইতে আরম্ভ করলো। দু'লাইন গাইল। এই দু'লাইন শুনেই বৃদ্ধ যেন হাঁপাতে লাগলো। সে চমকে উঠে খুব আবেগভরা গলায় বলে উঠলো)—থামাও, থামাও তোমার গান। এ গান……এ গান আমার। এ গান তুমি শিখলে কোত্থেকে ? কে তোমাকে শিখিয়েছে ?

যুবতী ঃ আমার মনে নেই। আমার ছোট্টবেলা থেকেই এই গান গাইছি— আপনি এত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন কেন ?

বৃদ্ধ ঃ ঐ গলা……ওঃ ঐ গান আমার জীবনের সঙ্গে এক হ'য়ে মিলে মিশে যাওয়া গান। চল্লিশ বছর আগে……এই নদীর ওপর আমি গেয়েছি। আমার সঙ্গে সেই গান গেয়েছিল একটা মেয়ে। এই নৌকোয় সেদিন সে ছিল…… আমি কী করে তা ভুলব ?

(পেছন থেকে ঐ গান অস্পষ্ট ভাবে শোনা যেতে লাগলো)……হ্যাঁ আমি এই গান গেয়েছিলাম। সে এক বিরাট কাহিনী।

যুবতী ঃ কী কাহিনী ? আপনি গান শুনতে চাইলে আপনার এই মেয়ে আপনাকে গান শোনালো। এখন আপনার মেয়ে সেই কাহিনী শুনতে চায় বলবেন না ?

বৃদ্ধ ঃ বলব……বলব খুকী—চোখের জলের কাহিনী……আমার সব মনে আছে ……মনে রাখার শুধু এটুকুই আছে……অর্থহীন স্মৃতি শুধু।

যুবতী ঃ বলুন……বলুন……আপনার ঐ ভাবাবেগের কাহিনীতে আমিও ভাগ

নিতে পারবো। আমিও এই ভাবাবেগে পড়ে পিশে গেছি……চোখের জল……চোখের জলের মূল্য বুঝতে পারবো। বলুন।

বৃদ্ধ ঃ বলব……বলব……হ্যাঁ, আমি সে সময় স্কুলের ছাত্র……সেইসময় একদিন সন্ধ্যায় এই নদীর তীরে……

(একটা বীণার শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে অতীতের ঘটনাগুলোকে অবতারণার মত করে)

ছেলেটি ঃ কী, এমন দুঃখ দুঃখ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

মেয়েটি ঃ আমাকে ওপারে যেতে হবে।

ছেলেটি ঃ কেন ফেরি নৌকো নেই?

মেয়েটি ঃ নেই। কই কাউকেই তো দেখছি না।

ছেলেটি ঃ তোমায় মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন কী একটা বিপদ ঘটেছে!

মেয়েটি ঃ দেরী করে বাড়ী ফিরলে বাবা মারবে।

ছেলেটি ঃ আচ্ছা, আমি তোমায় ওপারে দিয়ে আসছি। নৌকোয় উঠে বস। তোমার পেটিকোটের নীচটা ভিজে গেছে দেখছি।

মেয়েটি ঃ থাক্‌গে।

[নৌকো বাইবার শব্দ]

ছেলেটি ঃ স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরী হ'ল যে?

মেয়েটি ঃ স্কুলে একটা কাজ ছিল।

ছেলেটি ঃ স্কুলের বার্ষিক নাকি?

মেয়েটি ঃ না। নাটক, নাচের ক্লাশ হচ্ছিল।

ছেলেটি ঃ তাতে তোমার কি?

মেয়েটি ঃ আমি যে নাচি।

ছেলেটি ঃ তাই নাকি? তুমি নাচতে জানো?

মেয়েটি ঃ (হঠাৎ) দেখো দেখো, নৌকোতে জল উঠছে!

ছেলেটি ঃ আরে ওতে কিছু হবে না। তুমি নৌকোর একপাশ শক্ত করে ধরো……হ্যাঁ আমিও তাহ'লে তোমার স্কুলের জলসায় তোমার নাচ দেখতে যাব?

মেয়েটি ঃ না, না।

ছেলেটি ঃ কেন?

মেয়েটি ঃ দেখার কিশেষ কিছুই নেই।

ছেলেটি ঃ আমি ঠিক আসবো। খারাপ হ'লে খুব জোরে জোরে চীৎকার করবো। কী, বড় বড় চোখ করে কী দেখছ?

মেয়েটি ঃ (একটু ভয় পেয়ে)—এই, নৌকোয় ভীষণ জল উঠছে……

ছেলেটি ঃ এত ভয় নাকি? আচ্ছা এখন নৌকো যদি উল্টে যায় তাহলে বেঁচে আর কী করবে? (হাসলো)।

মেয়েটি ঃ কী করা যাবে। আমি সাঁতার দেব।

ছেলেটি ঃ তাই নাকি? এত সাহস তোমার? তাহ'লে নৌকোটা একটু ডুবিয়েই দেখি।

মেয়েটি ঃ (ভয় পেয়ে)—এই……না, না!

ছেলেটি ঃ (উচ্চহাসেও)—উঃ কী সাহস!

[দৃশ্য বদলাতে লাগলো, বীণার শব্দ শোনা যাচ্ছে]
আগের যুবতী—(অস্পষ্ট স্বরে)—নৌকো ডুবলে বৈঠা কী করবে? বাঃ বেশ সুন্দর কথাগুলোতো।]

বৃদ্ধ ঃ এমনিভাবে ওদের পরিচয় আরম্ভ হলো। মেয়েটির নাম গিরিজা…… সুন্দর নাম, তাই না?

যুবতী ঃ হ্যাঁ। তারপর?

বৃদ্ধ ঃ কী? তুমি নৌকোয় কী দেখছ?

যুবতী ঃ কিছু না, কিছু না—নৌকোয় জল উঠছে না। তারপর বলুন, পরের দিন গিরিজাকে দেখলেন?

বৃদ্ধ ঃ হ্যাঁ তারপরে রোজ। আমি স্কুল থেকে ফিরে দৌড়ে নদীর তীরে এসে গিরিজার জন্যে অপেক্ষা করতাম। আমি গিরিজার মাঝি হলাম। আমার সেই নবযৌবনের সময় গান আমি খুব ভালোবাসতাম। গানও করতাম। আমার মন সেই গানের সঙ্গে কোথায় উধাও হয়ে যেত।

যুবতী ঃ গিরিজা গান করতো?

বৃদ্ধ ঃ গান করতো? এই গ্রামে সবচেয়ে ভালো গান করতো সে। ওঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে)……সেসব কথা মনে না করাই ভাল। আমাকে আমার জীবনে সেই প্রথম বকুনি দিল আমার বাবা। বাবাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? আমরা গরীব লোক। এক মাঝির ছেলে হয়ে বড়লোকের বড়ঘরের মেয়ে গিরিজার সঙ্গে ঘুরছি, গান করছি তা বাবার ভালো লাগছিল না। বাবা আমায় বকতে লাগলো। বাবার সেই ভারী গলা……

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

বাবা ঃ (রেগে)—তোকে কতদিন না বলেছি যে সীমা ছাড়িয়ে যাস না। তুই একটা বড় বিপদ ডেকে আনছিস। তোকে আমি একথা একশ' বার বলেছি।

জানিস ওরা মানুষকে খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। ওদের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে তোর কীসের সম্পর্ক ?

ছেলে ঃ আমরা এমনি খেলাধূলো করি।

বাবা ঃ হঁ্যা খেলাধূলো করিস! তোকে আমি একবারে শেষ করে দেব বলে রাখলাম। ঐ বাড়ীর ছেলেরা জানতে পারলে তোর আর আমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। আর যেন তোকে ঐ মেয়েটার সঙ্গে দেখতে না পাই।

ছেলে ঃ আমি কী করবো ? আমি ওর সঙ্গে দেখা না করে পারবো না।

বাবা ঃ দেখা না করে পারবি না ? (একটা গাছের ডাল হাতে নিল।)

ছেলে ঃ বাবা, তুমি আমাকে মেরে ফেল। আমি সত্যি কথা বলেছি। আমি অন্যায়টা কী করেছি ?

বাবা ঃ তুই বললিনা যে ওর সঙ্গে দেখা না করে পারবি না। সেইটাই দেখছি। পারবি না—না ? (মারতে লাগলো)

[গিরিজা কোথেকে ছুটে এল]

গিরিজা ঃ ওকে মারবেন না, মারবেন না।

বাবা ঃ অঁ্যা...... ?

গিরিজা ঃ ও বড় ভালো। ও কোনো দোষ করেনি।

ছেলে ঃ গিরিজা, তুমি চলে যাও। বাবা আমাকে যতক্ষণ খুশী মারুক। (কেঁদে) আমি গিরিজাকে না দেখে থাকতে পারব না, পারবা না।

গিরিজা ঃ এইজন্যে তোমার বাবা তোমাকে মারছেন ? এ যদি অপরাধ হয় তাহ'লে অপরাধী আমি। আমাকে মারা উচিত। আমিই ওকে দেখতে আসি। আমি ওকে ভালোবাসি। কত যে ভালোবাসি তা আপনি জানেন না।

বাবা ঃ খুকী আমার ছেলে এই কুঁড়ে ঘরে জন্মেছে......তুমি বিরাট অট্টালিকায়।

গিরিজা ঃ তাতে কী ?

বাবা ঃ না! তাতে কিছু নয়......শিব শিব......কিছু নয়......আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। (চলে গেল।)

গিরিজা ঃ আহা। উনি চলে গেলেন। তোমার বাবার চোখে জল কেন ? দেখি, দেখি কোথায় তোমাকে মেরেছেন ? খুব মেরেছেন না ?

ছেলেটি ঃ না, বেশী না।

গিরিজা ঃ দেখি (দেখে) ইস্ চামড়া ছড়ে গেছে।

ছেলেটি ঃ ওতে আমার কষ্ট হচ্ছে না গিরিজা।

গিরিজা ঃ ইস্ আমিই এসবের কারণ......আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

[ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ]

বৃদ্ধ ঃ অমনি ভাবে আরো কত ঘটনা……এর পর আমার বাবা আমাকে আর খারাপ কথা বলেনি। আমি বাবার একমাত্র ছেলে। যা হবার হোক্ বলে বাবা ছেড়ে দিল।

যুবতী ঃ ভালোমানুষ বেচারী! তিনি কীই বা করতে পারেন?

বৃদ্ধ ঃ বাবার সেই একগুঁয়ে মন আমাদের সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পেরেছিল। এই বেচারী ছেলেটার জন্যে আমার বাবা অনেক চোখের জল ফেলেছিল।

যুবতী ঃ বলুন, বলুন তারপরে কী হোলো? ওনার ওপর সেই মেয়েটির বাড়ীর লোকেরা কি কোনো অত্যাচার করেছিল?

বৃদ্ধ ঃ বলছি……আমরা এমনি ভাবে বেড়ে উঠলাম। আমাদের ভালোবাসা আরো গাঢ় হ'লো। এই নদীর পূবদিকে ঐ খেতগুলো দেখতে পাচ্ছ? ঐ নির্জন জায়গায় আমরা দুজন দুজনের সঙ্গে দেখা করতাম। ওখানে পাথরের একটা স্তূপ আছে। খুব নির্জন জায়গা। একদিন এক সন্ধেয়……

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

যুবক ঃ গিরিজা ওঠো, ঐ দেখ মন্দিরে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মন্দিরে যাবে বলেই না বাড়ী থেকে বেরিয়েছ?

গিরিজা ঃ আমি আমার মন্দিরেই এখন দাঁড়িয়ে আছি।

যুবক ঃ আরতির সময় হয়ে এসেছে গিরিজা।

গিরিজা ঃ এই চোখ দুটো দিয়ে কতক্ষণ তোমাকে আরতি করছি।

যুবক ঃ কবিত্ব করছ। প্রসাদ না নিয়ে বাড়ী ফিরলে……

গিরিজা ঃ একজনের প্রসাদই আমি চাই।

যুবক ঃ গিরিজা!

গিরিজা ঃ কী?

যুবক ঃ আজ তোমার মুখ এত ম্লান কেন?

গিরিজা ঃ জানি না।

যুবক ঃ একটু হাস। তোমার এই ম্লান মুখ আমি সহ্য করতে পারি না।

গিরিজা ঃ হাসবার ইচ্ছে আমারও। তা কি সম্ভব হবে?

যুবক ঃ আজেবাজে কথা ভেবে কষ্ট পেও না।

গিরিজা ঃ ছাগলগুলো যখন রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে যায় তখন তাদের যে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা তারা জানতে পারে না। ঐ সময়টুকুই বা দুঃখ করে লাভ কী? তাই না? কী? আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে দেখছ যে?

যুবক ঃ না, কিছু না, অন্ধকার হয়ে আসছে ওঠো।

গিরিজা ঃ হ্যাঁ অন্ধকার আমাদের ফিরে ফেলেছে। আমরা অন্ধকারের গহ্বরে নামছি। আমার ভয় করছে।

যুবক ঃ (ভয় পেয়ে)......গিরিজা......আমাদের কী কখনো ছাড়াছাড়ি হবে ?

গিরিজা ঃ তুমি কি কখনো তা নিয়ে ভেবেছ ?

যুবক ঃ না—তা ভাবার মত শক্তি আমার নেই।

[ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ হল]

বৃদ্ধ ঃ যা আমি বল্লাম তা সব সত্যি। আমার সে শক্তি ছিল না। সেদিন আমার হৃদয়মনে এক ভয়ে ভরা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। পরের দিনও আমি গিরিজার সঙ্গে দেখা করলাম। সেদিন তিরুবাতীরার* উৎসব ছিল। গিরিজাকে ঘিরে তার বন্ধুরা গোল হয়ে গান করে করে নাচছিল। ওই শুধু চুপ করেছিল। তার সজল চোখ দুটিতে কীসের একটা স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে। যবনিকার অন্তরালে কী একটা নাটক তৈরী হচ্ছে বলে আমার মনে হলো। ওর বন্ধুরা সব হাসাহাসি করছিল, শুধু সেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ গোল গোল করে কী যেন সব দেখছিল। এ দৃশ্য আমার অসহ্য লাগছিল। আমি কী করে ওর সঙ্গে দেখা করবো ? আমি এদিক-ওদিক লক্ষ্যবিহীন ভাবে ঘুরতে লাগলাম। খুব ক্লান্ত হয়ে শেষে আমার নৌকোয় এসে আশ্রয় নিলাম। আমার বুড়ো বাবা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে তার পর নিঃশব্দে নদীর ধার থেকে চলে গেল। বাবা আমাকে যেন কিছু বলতে চাইছিল। আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না। নদীর ঢেউ নৌকোতে ধাক্কা মেরে ঘুমপাড়ানি গান গাইছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম থেকে জাগলাম তখন রাত অনেক হয়েছে। খুব জোরে জোরে হাওয়া বইছে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, তার সঙ্গে জমাট অন্ধকার। হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপতে কাঁপতে কে একজন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখতে পেলাম সে গিরিজা।

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

গিরিজা ঃ আমি যে কত জায়গায় তোমায় খুঁজেছি। চল যাই।

---

* কেরালার উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের উৎসব। শিবের মত বর পাওয়ার জন্য মেয়েরা পৌষ মাসে এই উৎসব পালন করে। তিরুবাতীরার অনেক গান আছে যেগুলো মেয়েরা গায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নাচে।

যুবক ঃ কোথায়? ঠিক আছে, একটা ছাতা নিয়ে আসি। খুব তাড়াতাড়ি আসবো।

গিরিজা ঃ না, ছাতার দরকার নেই।

যুবক ঃ একটা আলো।

গিরিজা ঃ দরকার নেই......তাড়াতাড়ি নৌকোয় ওঠো......চল......এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না।

যুবক ঃ এই ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার, নদীর স্রোত, সব কিছু কাটিয়ে নৌকো বাইতে হবে?

গিরিজা ঃ যদি না পারো তো সরো আমি বাইছি।

যুবক ঃ না, আমিই বাইছি। তুমি খুব শক্ত করে নৌকো চেপে ধরো। যা হবার হোক্ আমি বৈঠে ধরছি।

[বৈঠার শব্দ, ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির আওয়াজ]

গিরিজা ঃ হ্যাঁ......যা হবার হবে......যা হবার হোক্। চল, এগিয়ে চল...... আরো জোরে......ওঃ বিদ্যুৎ......হ্যাঁ কিছু এসে যায় না—বৈঠে বও......... বৈঠে বও।

যুবক ঃ খুব শক্ত করে ধরে থাকো। নদী রেগে আছে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নৌকো লক্ষ্যহীনভাবে চলছে......এখন বল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

গিরিজা ঃ (চাপাস্বরে) জানো না?......মৃত্যুর গহ্বরে।

যুবক ঃ অ্যাঁ! কী বললে?

গিরিজা ঃ আমাদের একসঙ্গে বাঁচা যখন সম্ভব হবে না, তখন একসঙ্গে আমরা মরব। বৈঠে বও......বও......তাড়াতাড়ি......তাড়াতাড়ি......বৈঠে বও। আমাদের বাধা দেবার সাধ্য এ পৃথিবীর আর কারোরই নেই।

যুবক ঃ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কী হয়েছে গিরিজা? বল, বল,...... আমার হাত অবশ হয়ে আসছে।

গিরিজা ঃ তোমার শুধু হাত অবশ হয়ে আসছে। আমার জীবনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি কী করে বাঁচবো? (একটা গোপন কথা বলার ভঙ্গীতে) আমাদের কি মৃত্যুকে ভয় পাওয়া উচিত?

যুবক ঃ আমার গিরিজা কাছে থাকলে ভয় নেই।

গিরিজা ঃ মৃত্যু আমার কাছে মধুর। আমার ভবিষ্যৎ এতই দুঃসহ।

যুবক ঃ শোনো ঝড়ের গর্জন।

গিরিজা ঃ গর্জাক। আমাদের ডুবিয়ে দিক।

যুবক ঃ তোমার বাড়ীর লোক তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে?

গিরিজা : অঁ্যা……অঁ্যা……

[ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ]

বৃদ্ধ : আস্তে আস্তে ঝড়ের গর্জন কমলো, বৃষ্টি থামলো। আমাদের নৌকো নদীর বুকে আর গিরিজা আমার বুকে। তার চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে।

যুবতী : বলুন, তারপর কী করলেন? সেই অসহায় মেয়েটিকে আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন? না আপনারা দেশ ছেড়ে চলে আবার……

বৃদ্ধ : না, না। তার বাড়ীর লোকেরা যে লোকটিকে ঠিক করেছে তাকে বিয়ে করতে বললাম।

যুবতী : ইস্ আপনি এত নিষ্ঠুর!

বৃদ্ধ : তাই কী? আমার কী আছে? একটা কুঁড়ে ঘর আর একটা নৌকো। বাস্। আমি হাত বাড়ালেই গিরিজা আমার পেছনে ছুটে আসবে তা আমি জানি। কিন্তু আমি তাকে কোথায় নিয়ে যাব? কষ্টের মধ্যে—অভাবের মধ্যে, বেদনার মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে? ও জন্মেছে আলোতে, অসীম ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে। তাই ভবিষ্যতও তার আলোর মধ্যেই কাটুক। আমার এই রকমই মনে হয়েছিল। আমার হৃদয় যখন দাউ দাউ করে জলছিল তখন আমি তাকে বললাম যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভালো।

যুবতী : সেই মেয়েটির জীবনের কথা এতটুকু ভাবলেন না?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, সে কথাও আমি ভেবেছি। বিয়ে হবে, শহরে যাবে। ছেলে-মেয়ে হবে, নতুন নতুন অনেক কিছু করবার, ভাববার পাবে। পুরোনো সব কিছু ভুলে গিয়ে গিরিজা একটা নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারবে।

যুবতী : আপনার পক্ষে কী এসব সম্ভব হয়েছে?

বৃদ্ধ : আমার পক্ষে? আমি ভেবেছিলাম যে সব ভুলে যাব, কিন্তু আমার ধারণা ভুল হয়েছিল। আমার মন তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে। কত বছর হয়ে গেল। ভাববার, করার নতুন কিছুই আমি পেলাম না। এই নৌকোয় উঠলে সে-ও এই নৌকোয় রয়েছে—ঐ মাঠের দিকে তাকালে সে-ও সেখানে রয়েছে—এই গ্রামের আনাচে কানাচে, কোণে কোণে তার উপস্থিতি আমি অনুভব করছি। আমার এখন এই স্মৃতিটুকুই মাত্র সম্বল।

যুবতী : সেই মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেল, তাই না?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ খুব জাঁকজমক করে।

যুবতী : আপনি গিয়েছিলেন?

বৃদ্ধ : চোখের জলের মধ্যে দেখেছিলাম।

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

[সানাইয়ের বাজনার পটভূমিকায় একজনের গলা—এই ঐ পাখাটা দেতো……হ্যাঁ হ্যাঁ বিয়ের পরই খাওয়া……শুনতে পাচ্ছ? ওদিকে যাও……এখনি সব পাতা পেতে দিতে বল। ওদিকটা যেন ভীড় না হয় দেখো। কুট্টাপন, তুমি ঐ লেবু আর ফুলগুলোর কাছে দাঁড়াও…… আরে এ কে? আমাদের মানি নাকি?……এখনি বুঝি এলে? কুট্টাপন একেও যেন লেবু দিতে ভুলোনা। হা-হা-হা-আরে এ লোকটা খেয়ে দেয়েই যাবে। এই ভাস্করন, কোনো কাজ না করে এদিক ওদিক শুধু-মুধু দৌড়োদৌড়ি করছিস কেন……এ গ্রামোফোনটা একবার লাগাও……ওতো হিন্দী রেকর্ড……। কায়মল এসেছেন? কিছু চামেলী ফুল ভেতরে গিয়ে দিয়ে এসো।……মামা পাখা পেলেন না? খাবার জল চাই? স্কোয়াশ আছে, স্কোয়াশ।]

[আওয়াজ থেমে গেল]

বৃদ্ধ ঃ আমার চোখ এসব কিছু লক্ষ্য করছিল না। শুভ মুহূর্ত এগিয়ে এল। সেজে-গুজে একটা হলুদ কলকে ফুলের মত গিরিজা বিবাহ মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেল।

[ফ্লাস ব্যাক]

[মেয়েদের উলুধ্বনি দেবার শব্দ শোনা যাচ্ছে]

একজন লোক ঃ বাঃ দুজনের বেশ মানিয়েছে।

অন্য আর একজন ঃ শুধু দেখতেই নয়, টাকা পয়সা, বড় ঘর, সব দিক্ দিয়েই সুন্দর মিলেছে।

অপর একজন ঃ মেয়েটা সত্যিই ভাগ্যবতী।

আর একজন ঃ তাতে কোনো সন্দেহই নেই। পরম ভাগ্যবতী।

[ফ্লাশ ব্যাক শেষ]

বৃদ্ধ ঃ সেই পরম ভাগ্যবতীর পাণিগ্রহণ আমি বিগ্রহের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। আমাকে শুধু একজন লোকই লক্ষ্য করছিল. আমার সবকিছু জানা একটি মাত্র লোক……আমার বাবা। বাবার চোখের দিকে তাকানোর শক্তি আমার ছিলনা। সেই বৃদ্ধের হৃদয় যে গলে যাচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবা নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

যুবতী ঃ আহা! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো)

বৃদ্ধ ঃ খুকী, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলোনা। জীবন এই রকমই। পরদিন বর-বধূ নদীর

তীরে এলো। গিরিজা স্বামীগৃহে যাচ্ছে। সুটকেশ, আরো অনেক জিনিষপত্র নিয়ে তারা নৌকোয় উঠলো। আমরা পরস্পরের দিকে তাকাইনি। আমি তাদের নদী পার করলাম। গিরিজার স্বামী খুশী হয়ে আমাকে একটা টাকা দিল। তারপর তারা একটা গাড়ীতে করে ধূলো উড়িয়ে নদীর তীর ছেড়ে চলে গেল। সেই ধূলোতে আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমি এখন একা। ঐ নৌকোতে গিরিজা আমার জন্যে একটা উপহার রেখে গেছে। একটা আংটি। যাতে আমি সবসময় তাকে মনে রাখি। এই যে আমার আঙুলে এই আংটিটা দেখছ, এটা সেই আংটি।

যুবতী : তারপর তারা আর এই গ্রামে ফিরে আসেনি?

বৃদ্ধ : বছরে একবার অন্ততঃ তাকে দেখার জন্যে আমি লোলুপ হয়ে থাকতাম। এই নদীর ধারে তার জন্যে অপেক্ষা করতাম। বিয়ের পর সে একবার মাত্র এখানে এসেছিল। তখন তার কোলে একটা মিষ্টি বাচ্ছা ছিল। আমি বাচ্ছাটাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলাম। বাচ্ছাটা এখানে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল।......তারপর কত বছর কেটে গেল। হ্যাঁ......এই হচ্ছে এই বুড়োর কাহিনী। আর সে আসবে কিনা জানিনা......একবার—শুধু আর একবার যদি তাকে দেখতে পেতাম—শুধু একবার। জানি আমার এই আগ্রহের কোনো মানে হয়না।

যুবতী : সেদিন সেই মহিলার কোলে যে বাচ্ছাটিকে দেখেছিলেন তার কথা আপনার মনে আছে? সেই বাচ্ছাটা আমি।

বৃদ্ধ : অ্যাঁ......?

যুবতী : সেই হতভাগিনী স্ত্রীলোকটির হতভাগিনী মেয়ে।

বৃদ্ধ : কোথায়?......আহা......(একটুখানি চুপ করে থাকার পর) আমি একবার তোমাকে ছুঁয়ে দেখি খুকী?

যুবতী : বাবা......আমিও একটা বীণার ছেঁড়া তার। সেই গল্পও আপনার মত দীর্ঘ গল্প......আমি পরে আপনাকে সে গল্প বলবো।

বৃদ্ধ : (গদ্‌গদ স্বরে)......একেবারেই ভাবতে পারিনি যে আমার এইরকম ভাগ্য হবে।

যুবতী : আমার মাকে আপনি দেখতে চান?

বৃদ্ধ : সেকথা বলতে! শুধু একটিবার তাকে আমি দেখতে চাই।

যুবতী : তাহ'লে তাড়াতাড়ি চলুন......যদি ভাগ্যে থাকে তো দেখা হবে।

বৃদ্ধ : কী বলছ তুমি?

যুবতী : মা রোগশয্যায়। অনেকদিন ধরে মা শয্যাশায়ী। গতকাল মাকে এই গ্রামে নিয়ে আসা হয়েছে। মা যখন গ্রামে যাবার জন্য যাত্রা আরম্ভ করেন

তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি এক ভাগ্যহীনা। ঝড়ের দোলায় দুলছি। বাড়ী এসে সব খবর জানতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। যদি ভাগ্যে থাকে তো মায়ের সঙ্গে দেখা হবে।

বৃদ্ধ ঃ (ভয়ে) অবস্থা এতই কী খারাপ ?

যুবতী ঃ বাঁচবে না বোধহয়। মায়ের দাম্পত্যজীবন বড়ই দুঃখের। মা আমার নরকে বাস করছিল। সেসব পরে বলবো, এখন সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চলুন।

বৃদ্ধ ঃ আমার কী তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে ?

যুবতী ঃ চলুন।

বৃদ্ধ ঃ চল।

যুবতী ঃ নৌকোটা বাঁধবেন না ?

বৃদ্ধ ঃ না, চল, চল।

[বীণার আওয়াজ আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে—শোকাকুল শব্দ]

যুবতী ঃ ঐ দেয়াল দেওয়া বাড়ীটা তো আমাদের ?

বৃদ্ধ ঃ হ্যাঁ।

যুবতী ঃ ওখানে আলোগুলো সব জ্বলছে। কেউই ঘুমোয়নি।

বৃদ্ধ ঃ না ! কেউই ঘুমোয়নি।

[একটা কোদাল দিয়ে গাছ কাটার শব্দ হচ্ছে টুক্ টুক্। প্রথমে অস্পষ্ট ভাবে, পরে স্পষ্ট ভাবে শোনা যেতে লাগলো]

বৃদ্ধ ঃ ঐ শব্দটা কীসের ?

যুবতী ঃ (ভয়ে) কীসের ? কীসের ?

বৃদ্ধ ঃ (গোপন কথা বলার মত ফিসফিস করে) আম গাছ কাটা হচ্ছে কী ?

যুবতী ঃ অ্যাঁ ?

বৃদ্ধ ঃ আমি যাচ্ছি না। সে কারোর জন্যেই অপেক্ষা করলো না। একা একাই। উঃ......আমার আর যাওয়ার দরকার নেই।

যুবতী ঃ মা......আমি কী করে এখন তোমার কাছে যাবো ?

অনন্ত ব্যথা

সি. এল. জোস্

চরিত্র

সেভিয়ার
সুসি
পাইলি
সান্নি

সি. এল্. জোস্ একজন ব্যাঙ্ক অফিসার। তাঁর লেখা কয়েকটি নাটক খুব বেশী বিক্রী হয়েছে। তাঁর নাটকগুলোকে মঞ্চস্থ করা বেশ সহজ। জোসের নাটকের পাত্র-পাত্রীরা নানা দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তাদের নৈতিক ও ধার্মিক মূল্য না হারিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বারটি নাটক ও দুটি একাঙ্ক নাটক তিনি লিখেছেন। তাঁর জন্ম 1932 সালের এপ্রিল মাসে। 'বিরামহীন বেদনা' নামের নাট্যসংগ্রহ থেকে বর্তমান একাঙ্কটি নেওয়া হয়েছে।

অনন্ত ব্যথা

প্রথম দৃশ্য

[মাদ্রাজে একটা বাড়ী। বেশ সাজানো-গোছানো একটা ড্রইং রুম। ঘরের মাঝে দুটি চেয়ার—চেয়ারের সামনে একটা টিপয়, একদিকে একটা টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে একটা টেলিফোন, কাছে একটা চেয়ারে সুসি চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে। হাতে তার একটা চিঠি। সুসির বয়স প্রায় 22 বছর। একটু পরেই সেভিয়ার ঘড়িতে দম দিতে দিতে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সে অফিস যাবার জন্যে তৈরী—বয়স 28। সুসিকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে একটু খারাপ লাগলেও তা বাইরে না দেখিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল।]

সেভিয়ার ঃ (মুখে হাসি টেনে)—একজন এখানে অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীমতীর দেখছি সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

[সুসি চিন্তা থেকে জেগে উঠলো। চিঠিটা টিপয়ের ওপর রেখে চোখ মুছে উঠে পড়ল। সেভিয়ার ঘড়িটা হাতে বাঁধল।]

সেভিয়ার ঃ সুসি কী ব্যাপার? এতক্ষণ ওরকম ভাবে বসেছিলে যে? এসবের মানেটা কী?

সুসি ঃ ক্ষমা কর। চিঠিটা পড়তে পড়তে সব কিছু ভুলে গিয়ে অমনি চুপচাপ বসেছিলাম।

সেভিয়ার ঃ খবরটা তো পেয়েছ, এখন চিঠিটা ছিঁড়ে ফেল। বারবার চিঠিটা না পড়ে এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

সুসি ঃ আমার মন বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে।

সেভিয়ার ঃ তোমার সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়া এক বন্ধুর অসুখ করেছে তারজন্যে তোমার এত কষ্ট পাবার মানে?

সুসি ঃ এটা কি একটা সামান্য অসুখ সেভিয়ার?

সেভিয়ার ঃ আরে, সেইজন্যেই তো বিশেষ চিকিৎসার জন্যে মাদ্রাজ আসছে—তাই নয় কি?

সুসি ঃ হ্যাঁ, তাহ'লেও এত অল্প বয়সে এই রকম একটা অসুখ!

সেভিয়ার ঃ (হেসে)......রোগ কি বয়স দেখে ধরে নাকি?

সুসি ঃ গত বছর আমাদের বিয়ের দিন ও একা এসে আমাদের একটা করে ফুলদানি উপহার দিয়েছিল, মনে আছে তোমার?

সেভিয়ার ঃ খুব ভালো করেই মনে আছে। আমরা তিনজনে মিলে একসঙ্গে কফি খেলাম। আমরা যখন মাদ্রাজের পথে রওনা হলাম তখন আমাদের বিদায় দিতে এসেছিল, সবই মনে আছে।

সুসি ঃ কী অদৃষ্ট! কলেজে যখন পড়তো তখন কী তার উৎসাহ, কী তার প্রাণশক্তি! এত কাজের, এত সচ্চরিত্র ছেলে আমি আর দেখিনি।

সেভিয়ার ঃ (হেসে) তাহ'লে আমি কাজের আর ভালো চরিত্রের লোক নই বোধহয়!

সুসি ঃ (মৃদু হেসে)—তোমার কথা তো আমি বলছি না।

সেভিয়ার ঃ বলার সময় আমার কথাও একবার মনে কোরো—আমিও একজন যুবক।

সুসি ঃ (একইভাবে মৃদু হেসে) তুমি শুধু যুবক নও, আমার স্বামীও।

সেভিয়ার ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই, আমার তো স্পেশ্যাল গ্রেড্। (হাসলো)

[সুসিও মৃদু হাসলো। তারপর সেভিয়ার সুসির দুই কাঁধে হাত দিয়ে বলল—] সময় হয়ে গেছে। আমি অফিস যাই?

[সুসি মৃদু হেসে মাথা নাড়লো। সুসির গালে আস্তে একটা টোকা দিয়ে সেভিয়ার বেরিয়ে গেল। একটু পরেই হাতে একটা থালি নিয়ে বাড়ীর ভৃত্য পাইলি ভেতরে ঢুকলো। তার বয়স 55, পরণে লুঙ্গি আর হাফ সার্ট পরা।]

পাইলি ঃ কার চিঠি? কার অসুখ করেছে? তোমার মুখটা বড্ড শুকিয়ে গেছে দেখছি বৌমা।

সুসি ঃ আমার গাঁয়ের একটা ছেলের। আমরা কলেজে একসঙ্গে এক ক্লাশে পড়েছি। বেচারীর অসুখ করেছে। চিকিৎসার জন্যে এখানকার হাসপাতালে দেখাতে আসছে।

পাইলি ঃ রোগটা কী?

সুসি ঃ রোগটা খুবই শক্ত পাইলি কাকা—ক্যানসার।

পাইলি ঃ (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) ক্যানসার? ওতো খুব খারাপ অসুখ। ভয় পাওয়ার কথা। একবার ধরলে আয়ু নিয়ে তবে যাবে। আমার গিন্নীর ছোট বোনের ছেলে ব্যাঙ্কে কাজ করতো। দুবছর আগে ক্যানসার রোগে মারা যায়। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। হঠাৎ সব কিছু শেষ হয়ে গেল। আমি তা নিয়ে ভাবছি না। এই পৃথিবীতে হাজার হাজার ডাক্তার থাকতে এই রোগের ওষুধ এখনো কেউ বার করতে পারলো না। সত্যি খুবই কষ্টের কথা। (গলার স্বর বদলিয়ে) কবে আসবে বলে লিখেছে?

সুসি ঃ আজ বা কাল এসে পৌঁছোবে হয়তো। আমি এই ছেলেটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তাই আমি এত কষ্ট পাচ্ছি।

পাইলি ঃ বউমা কিছু মনে কোরো না। তোমাদের সম্পর্ক কি খুব কাছাকাছি ছিল ? না……

সুসি ঃ (উত্তর দিতে অপছন্দ হবার ভাবে) পাইলি দাদা, তুমি বাজার থেকে ফিরে এস।

[পাইলি চলে গেল। সুসি চেয়ারে বসে আবার চিঠিটা পড়তে লাগলো। তারপর চিঠিটা রেখে অনেকক্ষণ কী যেন সব ভাবতে লাগলো। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে আস্তে আস্তে ভেতরে গেল। সেই সময় সান্নি খুব আস্তে ঘরে ঢুকলো। তার হাতে ভায়োলিনের একটা বাক্স। চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বাক্সটা নামিয়ে একপাশে রাখলো। সান্নির বয়স 25। রোগা শরীর। বিষাদভরা বিবর্ণ মুখ, স্তিমিত দৃষ্টি। চুলগুলো এলোমেলো, দাঁড়ি-গোফ কামায়নি বেশ কিছুদিন। কাপড়-জামা নোংরা না হলেও কুঁচকে আছে। টিপয়ের ওপর রাখা চিঠিটার ওপর তার দৃষ্টি পড়লো। এগিয়ে এসে সে চিঠিটা নিয়ে দেখলো, তারপর আবার যথাস্থানে রেখে দিল। এই সময় সুসি ঘরের ভেতর ঢুকলো। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। নিঃশব্দ মুহূর্তগুলি বাচাল মৌনতা। কী বলবে, কেমন করে আরম্ভ করবে, দুজনেই একটু অসুবিধায় পড়লো। দুঃখ, বেদনা, মনোকষ্ট আর বিষাদে ভরা ম্লান মুখ নিয়ে সুসি, মুখের ঔজ্জ্বল্য নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়া সান্নি মুখে মৃদু হাসি নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সান্নি ঃ (উৎফুল্ল হ'তে না পেরে বিষাদের সুরে)।] কী সুসি—কিছু বলছ না যে?

[সুসির ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো]

—সুসি, তোমাকে দেখার তৃষ্ণায় আমি এখানে এসেছি। (উদগত অশ্রুকে রোধ করতে না পেরে সুসি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।)

ছিঃ সুসি ছিঃ, কেঁদো না।

[সুসি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো]

তোমার কান্না শুনতে আমি এখানে আসি নি। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে আবার ফিরে চলে যাব।

সুসি ঃ (কম্পিত কণ্ঠে) আমার সান্নি……এ আমি কাকে দেখছি! এ কার ছায়া? এক বছরের মধ্যে তোমার এই অবস্থা হয়েছে?

সান্নি ঃ রোগ যা দয়া করে আমাকে দান করেছে অভ্যর্থনা করে নেওয়া কি আমার উচিত নয় সুসি?

সুসি ঃ তাহলেও তোমাকে এত খারাপ দেখবো আশা করিনি।

সান্নি ঃ এ রোগের বিষয় তুমি বিশেষ কিছু জানো না বলে। সে কথা যাক্, সেভিয়ার কোথায় ?

সুসি ঃ এই তো একটু আগেই অফিস গেল।

সান্নি ঃ তোমরা দুজনেই বাড়ী আছ ভেবে আমি এসেছি। আচ্ছা, আমি তাহলে পরে আসবো সুসি।

সুসি ঃ বসো সান্নি।

সান্নি ঃ না, বসবো না। সেভিয়ার থাকলে তোমার সঙ্গে গল্প করাটা ভালো দেখায়।

সুসি ঃ কেন একলা আমার সঙ্গে কথা বলা যায় না বুঝি ?

সান্নি ঃ শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলার কোনো বিষয় আমার নেই।

সুসি ঃ সান্নি ! তুমি একথা বলছ ? ঠিক যেন অপরিচিতের মত। তোমার কাছে কি আমি পর ?

সান্নি ঃ হ্যাঁ, বিয়ের পর তুমি পর।

সুসি ঃ আর দাঁড়িয়ে না থেকে বসো। (সান্নিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) আমি বলছি তোমায় বসো এখানে। (সান্নি বসলো) কখন এলে ?

সান্নি ঃ সকালে।

সুসি ঃ সঙ্গে কে কে এসেছে ?

সান্নি ঃ দাদা বৌদি। ওরা হাসপাতালে আছে। আমাকে চেক্ করার ডাক্তার দুপুরের পর আসবে। তার আগে তোমাকে একবার দেখে যাই ভেবে এলাম।

সুসি ঃ আমিই হাসপাতালে যেতাম। তুমি কষ্ট করে এখানে এলে কেন ? এত দূর থেকে আসার পর তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে রয়েছ......তখন......

সান্নি ঃ (দুঃখের হাসি হেসে) এখন আবার আর একটা দীর্ঘ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি নাকি ?

সুসি ঃ কোথায় ? কোন্ যাত্রা ?

সান্নি ঃ শেষ যাত্রা।

সুসি ঃ সান্নি (গলা ভেঙে গেল) যা বলার নয় তা বোলো না।

সান্নি ঃ যা ঘটবে বলে জানি তাই বলেছি। আর যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয় তাই ভেবে এখানে ছুটে এসেছি। তুমি দেশে ফিরলে দেখা হবে ভেবেছিলাম, তার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হলো না।

সুসি ঃ সেভিয়ার ছুটি পায়নি বলে যাওয়া হলো না। আমার চিঠিগুলো পাওনি ?

সান্নি ঃ পেয়েছি। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগগুলোরই উত্তর দিইনি। কী উত্তর দেব ? তোমাকে জানাবার কোনো ভালো খবর তো নেই। তোমাদের দাম্পত্য সৌভাগ্যে আমার চিঠি যেন তার কালো ছায়া না ফেলে।

সুসি ঃ বিয়ের এই এক বছরে এমন একটা দিন যায় নি যে তোমার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন আর সেই সান্নিকে আমার সামনে দেখছি না। এত কঠিন অসুখ তোমার করেছে সান্নি?

সান্নি ঃ সবই অদৃষ্ট সুমি। ভগবানের লীলা কখনো কখনো বড় নিষ্ঠুর, কঠোরও বটে।······আমি আর বসবো না। যাই।

সুসি ঃ (এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে) আর একটুখানি বসে থাকার মত দয়া আমাকে দেখাও। সান্নি তোমাকে কী খেতে দেব? চা করি।

সান্নি ঃ কিচ্ছু চাই না।

সুসি ঃ এক গ্লাশ দুধ অন্ততঃ।

সান্নি ঃ না সুসি। আমি কিছুই খেতে পারি না। খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই। আমার একটা বড় তৃষ্ণা মিটেছে। চিকিৎসার জন্যে আমি এখানে আসতে চাইনি। মরণের আগে আমার দাদা কিছু টাকা খরচ করতে চাইছে। সত্যি কথা বলি, চিকিৎসার চেয়ে তোমাকে একবার দেখার খুবই ইচ্ছে নিয়ে আমি এখানে এসেছি।

[হৃদয় স্পর্শ করা ঐ কথাগুলো শুনে সুসি কাঁদতে লাগলো। তার এমন-ভাবে বলা উচিত হয়নি এই অপরাধের ভাবে]

ক্ষমা করো সুসি, আমি কী যে সব বলে ফেলছি। থাক্ বাজে কথা! আমি এসে অবধি তোমাদের খবর কিছুই নিইনি। তোমরা দুজনে ভালো আছ তো?

সুসি ঃ (ভাঙা গলায়) হ্যাঁ ভালোই আছি।

সান্নি ঃ থাকার জায়গাটা তো বেশ ভালোই পেয়েছ।

সুসি ঃ হ্যাঁ তা পেয়েছি।

সান্নি ঃ সেভিয়ার কী বলে? অফিস থেকে কখন আসবে?

সুসি ঃ দুপুরে।

সান্নি ঃ (হেসে) বিয়ের পর একবছর হ'য়ে গেল না? সুসি, তুমি কি মা হ'তে চলেছ? (হাসলো)।

[সুসি হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। সে সহানুভূতির সঙ্গে সান্নির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। সান্নি উঠে পড়লো—]

কী সুসি, আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে কী দেখছ?

সুসি ঃ তোমার কলেজে পড়ার চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। ওঃ তখন তোমার কী উৎসাহই না ছিল, কী প্রাণশক্তি! উঃ কী যে অপূর্ব দিনগুলো গেছে!

সান্নি ঃ তারা এখন বিগত বসন্তের ঝরে পড়া ফুল। এখন কি তাদের তুলে দেখা যায়?

সুসি ঃ কলেজ ডে'তে তুমি ভায়োলিন বাজাচ্ছিলে আর আমি তার সঙ্গে গাইছিলাম সে দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

সান্নি ঃ (মনোকষ্টে) লক্ষ্মীটি সুসি, আমাকে আর সেই পুরোনো স্মৃতির মধ্যে টেনে নিয়ে যেওনা।

সুসি ঃ (সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে) গান শেষ হবার পর চারদিক থেকে সেই হাততালি এখনো আমার কানে বাজছে।

সান্নি ঃ (হাত যেন ব্যথা করছে এমনি কষ্টে)—সু-সি .....

সুসি ঃ (সেই একই ভাবে) আঃ কী রোমাঞ্চময় দিনগুলোই না গেছে! (একমুহূর্ত থেমে) এখনো তুমি বেহালা বাজাও?

সান্নি ঃ না সুসি। বেহালা বাজাবার শক্তি আর আমার নেই। (একথা বলে একপাশে রাখা বেহালার বাক্স থেকে বেহালাটা বার করলো।)

সুসি ঃ (আশ্চর্য হ'য়ে) তুমি বেহালাটা এখানে নিয়ে এসেছ?

সান্নি ঃ (সুসির একটু কাছে এসে) হ্যাঁ নিয়ে এসেছি। আমার জীবনে সবচেয়ে ভালোবেসে ছিলাম দুজনকে! একজন তুমি সুসি আর একজন এই বেহালা। আজ থেকে এই দুটোই একসঙ্গে থাক। সুসি তোমাকে আমি এটা উপহার দিতে চাই—নাও।

সুসি ঃ (মনের দুঃখে) না, না সান্নি, বেহালা আমি নিতে পারবো না।

সান্নি ঃ এটা তোমাকে দেবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি।

সুসি ঃ এমন উপহার দিয়ে তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না। বিয়ের সময় যে উপহার দিয়েছ তার ব্যথা এখনো মুছে যায়নি। শুকনো ফুলেভরা একটা ফুলদানি তুমি আমাকে উপহার দিয়েছিলে মনে আছে?

সান্নি ঃ হ্যাঁ ওটা ইচ্ছে করেই দিয়েছিলাম। উপড়ে ফেলা ফুলের জীবন নেই। শুকনো ফুলের সৌন্দর্য গুণেই। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি আমাকেই তোমায় উপহার দিয়েছি। জীবনের পুষ্পোদ্যান থেকে উপড়ে ফেলা ফুল আমি......শুকনো ফুল। (বেহালাটা এগিয়ে দিয়ে) সুসি এটা নাও।

সুসি ঃ (আরো কষ্ট পেয়ে)—কেন তুমি এটা আমায় দিতে চাচ্ছ?

সান্নি ঃ এটা ঠিকমতো রেখে দেবার জায়গা আমার নেই বলে।

সুসি ঃ আমি বেহালা বাজাতে জানিনা।

সান্নি ঃ আমি আর বেহালা বাজাতে পারবোনা। আমার হাত অবশ হয়ে আসতে শুরু করেছে। আমি এতই অশক্ত হয়ে পড়েছি সুসি। আমার স্মৃতির জন্য অন্ততঃ এই উপহার তুমি নাও। সেভিয়ারকে বললেই হবে।

[সুসি অশ্রুজলে ভাসা দৃষ্টি দিয়ে হাত এগিয়ে দিল]

সুসি : (বেহালা নেবার আগে) সান্নি, আমার একটা অনুরোধ। বেহালাটা একবার বাজাও।

সান্নি : (চমকে) সুসি!

সুসি : একটুখানির জন্য অন্ততঃ তোমার বাজনা আমায় শোনাও।

সান্নি : না, এটা ঠিক নয়। বিশেষ করে এখানে বসে বাজানোটা।

সুসি : না, না, তাতে কিছু হবে না। আমি একটু শুনতে চাই।

সান্নি : (গলাভাঙার স্বরে) আমার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে সুসি।

সুসি : কতদিন হলো এই বাজনার শব্দ আমি শুনিনি। আমার শোনার বড্ড লোভ হচ্ছে। (সান্নিকে চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) সান্নি একবার বাজাও।

সান্নি : (একটু চিন্তা করে ভেতর থেকে একটা উৎসাহ আর প্রেরণা পেয়ে) আচ্ছা বাজাচ্ছি। এইই হবে আমার শেষ বাজনা। সুসি তুমি আমার বাজনার সঙ্গে গান করবে?

সুসি : (একটু চমকে তারপর অসহায় ভাবে) না, না, সান্নি।

সান্নি : জানি গান করা এখন উচিত নয়, তবুও......

সুসি : না, না, আমি পারবো না, আমি এখন গান করতে পারবো না।

সান্নি : তাহলে আমিও বাজাবো না। সুসি গান করো। সেদিন কলেজ ডে'তে যে গান গেয়েছিলে সেই গানটি।

সুসি : আমাকে জোর কোরো না সান্নি, জোর কোরো না।

সান্নি : এটা আমার একটা আগ্রহ সুসি। হয়তো এই আমার শেষ আগ্রহ। এমন সুযোগ হয়তো আমার আর আসবে না।

[বেহালা বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। শ্রুতি বাজতে লাগলো। (সুসির অনিচ্ছা দেখে) গান করো সুসি। সান্নির এই দাবীর কাছে নতি-স্বীকার করে সুসি জলভরা চোখে শ্রুতি-মধুর একটা গান করতে লাগলো। আস্তে আস্তে তার গলা উঁচু হতে লাগলো। শোকমধুর এক গান। এই গানে সান্নি সব ভুলে গেল। হৃদয়স্পর্শী, শ্রুতি-মধুর আবেগভরা এক সুর বেহালায় বাজতে লাগলো। গান যখন একেবারে চড়ায় উঠেছে তখন হঠাৎ সান্নির মাথাটা ঘুরে গেল বলে মনে হলো। সে হঠাৎ বাজনা থামালো। সঙ্গে সঙ্গে গানও থেমে গেল। সুসি উৎকণ্ঠা ভরে সান্নিকে ধরতে গেল। সান্নি খুব অবসন্ন হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো]

সুসি : (ভয় আর উৎকণ্ঠায়) সান্নি কী হয়েছে তোমার?

সান্নি : কিছু না। মনে হ'ল যেন মাথাটা ঘুরছে।

সুসি ঃ একটু জল খাবে?

সান্নি ঃ কিছু চাই না। এটা বিশেষ কিছু নয়। মাঝে মাঝে এরকম হয়। এই দেখ এখন ঠিক হয়ে গেছে (একটু পরে আবার উঠে দাঁড়ালো।) সুসি আমি যাই।

সুসি ঃ আর একটু বিশ্রাম করে যাও।

সান্নি ঃ তার দরকার নেই। আমি ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। (বেহালাটা এগিয়ে দিয়ে)—নাও, এই আমার শেষ উপহার।

[সুসি হাত বাড়িয়ে বেহালাটা নিল। সুসি যখন বেহালাটা নিচ্ছে ঠিক সেই সময় সেভিয়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। সুসি বা সান্নি তাকে দেখতে পেল না। সেভিয়ারের মুখটা শুকিয়ে গেল। তারপর আবার মুখের ভাব শান্ত হলো। সুসি বেহালাটা নিয়ে কাছেই একটা টেবিলে রেখে মুখ ফিরোতেই সেভিয়ারকে দেখতে পেল। হঠাৎ স্বামীকে দেখে অল্প একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঠিক করে নিল।]

সুসি ঃ (উৎসাহের সঙ্গে) সেভিয়ার দেখ সান্নি এসেছে।

[সান্নি ফিরে দেখলো। হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করলো]

সান্নি ঃ আমায় চেনেন তো?

সেভিয়ার ঃ না চেনার কী আছে? আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন দেখছি।

সুসি ঃ হ্যাঁ, দেখলে চেনাই যায় না এতখানি বদলে গেছে।

সেভিয়ার ঃ (সুসির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে) হ্যাঁ, এতখানি পরিবর্তন ভাবাই যায় না। (সান্নিকে) কখন এলেন?

সান্নি ঃ এই কিছুক্ষণ হলো।

সেভিয়ার ঃ এসেই সোজা এখানে চলে এলেন নাকি?

সুসি ঃ না; এখন হাসপাতাল থেকে আসছে।

সান্নি ঃ সুসি বললে যে আপনি দুপুরে অফিস থেকে আসবেন।

সেভিয়ার ঃ (হেসে) আমার যখন খুশী তখন আসতে পারি। আমার বাড়ী এটা। আপনি এসেছেন দেখে খুশী হলাম। আপনার সঙ্গে একবার দেখা হ'লো অন্ততঃ।

সুসি ঃ (সেভিয়ারকে) তুমি অফিস যাওনি?

সেভিয়ার ঃ একটা সরকারী কাগজ নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। অফিসে গিয়েই মনে পড়লো।

সান্নি ঃ আমি আর তাহলে দেরী করবো না। গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি তাহলে আসি। (সুসিকে) আসি সুসি।

[সুসি মাথা নাড়লো। সান্নি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। সুসি সান্নিকে বিদায় দিতে তার সঙ্গে চললো। সেভিয়ার সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সুসির এইভাবে সান্নির সঙ্গে যাওয়াটা যে তার ভালো লাগেনি তা তার মুখের ভাবে স্পষ্ট হয়ে আছে। সে একটা সিগ্রেট পকেট থেকে বার করে জ্বালিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সুসি ফিরে এল।]

সুসি ঃ (খুব শান্ত ভাবে) তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

সেভিয়ার ঃ (শান্ত স্বরে) দাঁড়িয়ে থাকবো না তো কী করবো ?

সান্নি ঃ (শান্ত স্বরে) তোমার একটু ওদিকে আসা উচিত ছিল।

সেভিয়ার ঃ তুমি তো বিদায় দিতে গেলে, তাইই যথেষ্ট। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় হাসপাতাল অবধি যাবে।

সুসি ঃ (সেভিয়ারের কথার মানে বুঝতে পেরে) কী ব্যাপার, মনে হচ্ছে যেন তোমার বিরক্তি লাগছে। সান্নি এসেছে বলে তোমার ভালো লাগেনি বুঝি ?

সেভিয়ার ঃ আমি তো তা বলিনি।

সুসি ঃ (সেই একই শান্ত স্বরে) তোমার মুখের ভাব থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অশক্ত ঐ রোগীটিকে একবার বসতে পর্যন্ত তুমি বলোনি। তাকে এক কাপ কফি খেতে পর্যন্ত বললে না।

সেভিয়ার ঃ (একটু গভীর স্বরে) অতিথির অভ্যর্থনা আর সৎকার তুমি করেছ তা তো দেখতে পাচ্ছি।

সুসি ঃ (শান্ত স্বরে) হ্যাঁ তা সত্ত্বেও সামান্য ভদ্রতা বলে তো একটা কথা আছে। তোমার কোনো বন্ধু এলে আমাকে সবরকম ভদ্রতা দেখিয়ে সোশ্যাল হতে হবে কিন্তু তোমার বেলায় এসব খাটবে না, তাই না ? (এক মুহূর্ত ভেবে) নাঃ এ নিয়ে আমাদের কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। (বিনীত সুরে) হ্যাঁ, কী কাগজ নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে ?

সেভিয়ার ঃ (রেগে ফেটে পড়ার ভাবে) কোনো কাগজই নিতে ভুলে যাইনি। আমার খুশী হয়েছি এসেছি। কেন, তাতে কি তোমার কোনো অসুবিধে হয়েছে ?

সুসি ঃ (আঘাত পেয়ে) অসুবিধে ? আমার ? তুমি এসব কী যা তা বলছ ? (এক মুহূর্ত চুপ করে ভাব বদলে) ওঃ বুঝতে পেরেছি। আমার ওপর নজর রাখতে এসেছ।

সেভিয়ার ঃ আমি এমনিই এসেছি। অফিস যাবার পথে আমার গাড়ী পাশ করে সান্নি যাচ্ছে দেখলাম। অফিসে পৌঁছোবার পর মনে হ'লো সান্নি হয়তো এখানে এসেছে।

সুসি : (পরিহাসের সুরে)—সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে এলে ? ভালোই হয়েছে, এসেছ নইলে সান্নি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেত !

সেভিয়ার : (খুব গম্ভীর স্বরে)—সু·····সি—

সুসি : ছিঃ ছিঃ, আমার নিজেরই লজ্জা করছে। তোমার মন এত ছোট ?

সেভিয়ার : (টেবিলে রাখা বেহালাটার ওপর এতক্ষণ তার নজর পড়লো) —এই বেহালাটা এখানে কেন ?

সুসি : সেভিয়ার ওটা আমাকে উপহার দিয়েছে।

সেভিয়ার : (ঘৃণা ভরে)—ওহো উপহার ! (গম্ভীর স্বরে)—এর থেকে আমি কী বুঝবো ?

সুসি : (সাহসের সঙ্গে)—বেহালা আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে তাই বুঝবে !

সেভিয়ার : (রাগত ভাবে)—কেন দিয়েছে ?

সুসি : আমি চাইনি।

সেভিয়ার : যদি নাই চাও তাহ'লে দিয়েছে কেন ?

সুসি : সান্নি এই বেহালাটাকে নিজের জীবনের মত ভালোবাসে। এটা আর কাউকে দেওয়া তার পছন্দ নয়।

সেভিয়ার : (বিঁধিয়ে)—পছন্দ শুধু তোমাকেই।

সুসি : (যেন জ্বলে গেছে এমনিভাবে)—সেভিয়ার ! [পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এক সপ্তাহ পরে। আগের দৃশ্য—একটা টেবিলের ওপর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ রয়েছে। সুসি টেবিলের ওপর রাখা বেহালার তারগুলোতে আঙুল বুলিয়ে আওয়াজ করছে। ওর মুখ ম্লান আর চিন্তায় ভরা। চোখ দুটো জলে ভর্তি। একটু পরে পরে বেহালায় আঙুলের ঘা দিয়ে আবার আওয়াজ করছে। এই আওয়াজগুলো তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আর একবার আওয়াজ উঠলো। সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে সেভিয়ার ঘরে ঢুকলো। এই দৃশ্য দেখে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।]

সেভিয়ার : (একটু গভীর আর শান্ত স্বরে) সুসি—তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে বলছি না। এক সপ্তাহ হ'লো এই জিনিসটা এখানে পড়ে রয়েছে। আমাদের এটার দরকার নেই।

সুসি : (অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে)—তুমি কী বলছ ?

সেভিয়ার ঃ বেহালা বাজাতে আমরা দু'জনে কেউই জানি না। এটা এখানে যত্ন করে রেখে লাভ কী?

সুসি ঃ সান্নি এটা আমাকে একটা স্মৃতির উপহার হিসাবে দিয়েছে।

সেভিয়ার ঃ (গম্ভীর ভাবে)—কীসের স্মৃতি? কার স্মৃতি? আমার এসব একেবারেই পছন্দ নয়। তোমার এটা সেদিন নেওয়াই উচিত হয়নি।

সুসি ঃ (শান্ত স্বরে)—এটা এখানে থাকলে ক্ষতি কী? এটা তো কারোর কোনো ক্ষতি করছে না।

সেভিয়ার ঃ (কঠোর ভাবে)—করছে, হ্যাঁ বিরক্ত করছে। এই বেহালা তোমার মনে এক দুঃখের স্মৃতি এনে দিচ্ছে, আমার মনে ঘৃণা জাগাচ্ছে। এটা আজকেই ফেরত দিয়ে দাও।

সুসি ঃ (সেই একই শান্ত ভাবে)—একটা উপহার একবার নিয়ে আবার তা ফিরিয়ে দেব?

সেভিয়ার ঃ কে তোমাকে নিতে বলেছিল? উপহার একটা খুশীর আবহাওয়া সৃষ্টি করবে, তা না এখানে ব্যথা আর ঘৃণার সৃষ্টি করছে।

সুসি ঃ এটা ফিরিয়ে দিলে অসহায় অবশ সেই রোগীটি কী মনে করবে?

সেভিয়ার ঃ রোগীর মনে করায় কিছু যায় আসে না। আমার মনে করার কথা আমি বলছি। এটা আজকেই দিয়ে দাও।

সুসি ঃ (সাহস করে)—আমি তা পারব না, আমি তা করবোও না। ফিরিয়ে দেবার জন্যে ওটা আমি নিইনি। সান্নি শুয়ে শুয়ে রোগের কষ্ট সহ্য করছে। তাকে আরো কষ্ট দিতে আমি রাজী নই।

সেভিয়ার ঃ তোমাদের সম্পর্ক যে এতখানি ঘনিষ্ঠ আমি তা ভাবিনি।

সুসি ঃ তোমার যে তার ওপর এত ঘৃণা তাও আমি বুঝিনি।

সেভিয়ার ঃ দুটো পূজো আমার পছন্দ নয়।

সুসি ঃ দুটো পূজো?

সেভিয়ার ঃ হ্যাঁ, স্বামী পূজো আর প্রণয়ী পূজো।

সুসি ঃ (অত্যন্ত আঘাত পেয়ে)—সেভিয়ার! এত নিষ্ঠুর ভাবে বলো না।

সেভিয়ার ঃ স্ত্রীর বিশ্বস্ত হওয়া দরকার।

সুসি ঃ (সাহসের সঙ্গে)—স্বামীরও মিছিমিছি সন্দেহ করা উচিও নয়।

সেভিয়ার ঃ আমার যা অভিজ্ঞতা হোলো তাতে আমি অন্যরকম ধারণা করেছি।

সুসি ঃ (সাহসের সঙ্গে)—কী অভিজ্ঞতা? আমি তোমার সঙ্গে কী বঞ্চনা করেছি?

সেভিয়ার ঃ পরশুদিন আমি এখানে ছিলাম না। সেদিন অর্ধেক রাত তুমি

হাসপাতালে কাটিয়েছ। কেন? কে বলেছে তোমাকে ওখানে রাত কাটাতে? আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না।

সুসি : আমি কি কোনো সুস্থ সবল যুবকের সঙ্গে হোটেলে ঘর নিয়ে থেকেছি? (একমিনিট পরে গলার স্বর বদলে মনোকষ্টে)—ওঠার শক্তি নেই এমন একজন অবশ ক্ষীণ রোগীর শুশ্রূষা করতে আমি সেখানে ছিলাম। তাও সান্নির বৌদির শরীরটা ভালো নেই বললে পরে। তুমি এলে পরে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে জানাতে পাইলি কাকাকে বলে গিয়েছিলাম। (হঠাৎ খুব কষ্টের সঙ্গে) ডাক্তার আমাকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে রোগী বাঁচবে না তাই নয়, মৃত্যুর আর কিছুদিন মাত্র আছে। (আরো কষ্টের সঙ্গে) মৃত্যু-পথযাত্রী সেই রোগীকে একটু স্নেহ দেখিয়েছি সেটা কি এতবড় অপরাধ হয়েছে সেভিয়ার? (একটা কথাও বলতে না পেরে সেভিয়ার ভেতরে চলে গেল। সুসি চোখের জল মুছতে লাগলো। একটু পরে একটা থার্মোফ্ল্যাস্ক নিয়ে পাইলি ঢুকলো। উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলো)—কোনো খবর আছে কি পাইলি কাকা?

পাইলি : (দুঃখিত ভাবে) কী খবর মা! দেখলে কষ্ট লাগে, সেই একই ভাবে শুয়ে আছে। কখনো কখনো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে আবার একটু পরে ফিরে আসছে। স্মৃতি ফিরে এলে পর আমার দিকে বেশ ভালো করে দেখল। জিজ্ঞেস করলো—'সুসি এসেছে কি?' আমি বললুম—'আসেনি, আপনি দেখতে চেয়েছেন একথা আমি সুসিকে বলবো।' বলতে বলতে আবার তার স্মৃতি হারিয়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দেখে এসেছি। মাঝে মাঝে খুব কাতরানি আর গোঙানির শব্দ। আহা বেচারা! খুব কষ্ট পাচ্ছে বলে মনে হয়। ওর দাদা আর বৌদি কী কান্নাই না কাঁদছে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) সবই ভগবানের হাতে।

[সুসি আহত হৃদয়ে প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল। পাইলি ভেতরে ঢোকার সময় সেভিয়ার ঘরে ঢুকলো]

সেভিয়ার : (কঠিনস্বরে) তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

পাইলি : (গলা নীচু করে) একটু হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

সেভিয়ার : হাসপাতালে গিয়ে বসে থাকলেই হবে? এখানকার কাজকর্ম কিছু দেখার দরকার নেই না? সার্টগুলো ধুয়ে রেখেছ?

পাইলি : (অপরাধের স্বরে) এক্ষুনি পরিষ্কার করছি।

সেভিয়ার : সকাল বেলায় পরিষ্কার করে রাখতে বলেছিলাম না? যা বলবো তাই শুনবে, সেইজন্যে তোমাকে মাইনে দেওয়া হয়। যাও, শীঘ্রি গিয়ে পরিষ্কার কর।

[পাইলি তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। সুসি তার রাগ আর আবেগ বাইরে না দেখাতে পেরে অসহায় ভাবে তা চেপে রাখতে লাগলো]

সুসি ঃ (খুব শান্ত আর বিনীত ভাবে)—সেভিয়ার, সান্নি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। চল আমরা একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসি।

সেভিয়ার ঃ (কোনোরকম আগ্রহ না দেখিয়ে) আমার এখন অসুবিধে আছে।

সুসি ঃ আজকে তো তোমার ছুটি।

সেভিয়ার ঃ আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে। একটু পরেই একটা ফোন আসবে তার পরেই আমাকে বেরোতে হবে।

সুসি ঃ সান্নিকে দেখে আসতে বেশী সময় লাগবে না। তার সঙ্গে আমাদের যে জানাশোনা সে কথা না ভাবলেই চলবে। মৃত্যুপথযাত্রী এক রোগীকে দেখতে যাচ্ছ সেটা কি পুণ্য কাজ নয়?

সেভিয়ার ঃ পাপ পুণ্যের প্রশ্ন এখানে নয়। আমার সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন। তোমার যদি এতই গরজ তাহলে সন্ধ্যে বেলায় যাবো।

সুসি ঃ (গলার সুর বদলিয়ে একটু তেজের সঙ্গে) গরজ ? আমার ? থাক্ দরকার নেই। আমার গরজে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমার জন্য তোমায় যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।

সেভিয়ার ঃ আমরা একসঙ্গেই যাব।

সুসি ঃ আমি একাই যাবো।

সেভিয়ার ঃ সন্ধ্যেবেলায় গেলেই হবে।

সুসি ঃ (গ্রাহ্য না করে) আমি এক্ষুনি যাবো।

সেভিয়ার ঃ আমি গাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

সুসি ঃ আমি ট্যাক্সি করে যাব (টেবিল থেকে ব্যাগটা নিল।)

সেভিয়ার ঃ (রেগে) তাহ'লে তুমি একাই যাবে বলে ঠিক করেছ?

সুসি ঃ (দৃঢ়স্বরে)—হ্যাঁ। (যাবার জন্য পা বাড়ালো।)

সেভিয়ার ঃ (হঠাৎ টেবিলের কাছে এসে বেহালাটা দেখিয়ে)—তাহ'লে এটাকেও নিয়ে যাও।

সুসি ঃ (ফিরে দেখে) না, এই বেহালা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমি ঐ রোগীটিকে মেরে ফেলতে চাই না।

সেভিয়ার ঃ (রাগে বেহালায় হাত দিয়ে)—না নিয়ে গেলে এটাকে আমি··· (টেবিলের ওপর আছাড় মেরে ভাঙতে গেল)।

সুসি ঃ (যেন তার প্রাণ যাচ্ছে এমনি ভাবে) সেভিয়ার ! (সামনে গিয়ে ওকে

বাধা দিয়ে) ভেঙো না, ভেঙো না, ভগবানের দোহাই এটাকে নষ্ট কোরো না (ফোঁপাতে লাগলো)।

[সেভিয়ার কিছুক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বেহালাটা টেবিলের ওপর অগ্রাহ্যভাবে ফেলে দিল। একটু পরে সুসি তার কান্না সামলে ভ্যানিটি ব্যাগ টেবিলের ওপর রেখে চোখ মুছে ভাঙা গলায় বললো)—আমি যাব না। তোমার যদি পছন্দ না হয় তাহ'লে আমি যাবো না (কাউকে লক্ষ্য না করে) আমি গেলে সান্নির অসুখ কিছু কমে যাবে না। তাহ'লে আমি যাবই বা কেন? না, আমার যাওয়ার দরকার নেই। (সেভিয়ারকে) আমার যাবার দরকার নেই……আমি যাবো না (ফোঁপাতে লাগলো।]

[নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত; দুজনেই চুপচাপ। শেসে সেভিয়ারের দিকে ফিরে উত্তেজনার সঙ্গে)—সেভিয়ার, আজ অবধি স্নেহশীলা, পতিব্রতা সহধর্মিণী হয়ে আমি থেকেছি……ভবিষ্যতেও থাকবো……কিন্তু তবুও এতদিন তোমার অজানা একটা গোপন কথা আমি বলবো। শোনো, তুমি কোনোদিনই আমার স্বামী হতে পারতে না। (সেভিয়ার চমকে উঠলো) সান্নির যদি অসুখ না করতো তাহ'লে আমি আজ তার স্ত্রী হতাম। আমাদের দুজনের মধ্যে শুধু জানাশোনা নয়, আমাদের বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই গভীর ভালোবাসার কথা আমাদের বাড়ীর লোক জানতো। আর তারা আমাকে আশীর্বাদও করেছিল। ঠিক এই সময়েই সান্নির ক্যানসার রোগের লক্ষণ দেখা গেল। তা সত্বেও সান্নিকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সান্নি হঠাৎ এক মহান্ মানুষ হয়ে গেল। শুধুমাত্র সান্নির জেদাজেদিতে আমি তোমায় বিয়ে করেছি। ভেবেছিলাম চিরকুমারী থাকবো……(সেভিয়ার এসব শুনে শক্ খাওয়ার মত চমকে উঠলো]

সেভিয়ার ঃ (আশ্চর্য হয়ে) এসব সত্যি সুসি?

সুসি ঃ (হৃদয় স্পর্শ করা সুরে) সান্নির মহত্ব তুমি জানো না সেভিয়ার। সে যে কতবড় একটা ত্যাগ করেছে। সান্নির কাছে আমার চেয়েও তোমার ঋণ বেশী।

সেভিয়ার ঃ (সেই একই আশ্চর্যভাবে) তাই নাকি? আমি এসব কিছুই জানতাম না।

সুসি ঃ জানাতে তোমাকে চাইনি। পড়ে শেষ করে ফেলা একটা বইয়ের মত আমি তা আলাদা তুলে রেখেছিলাম।

সেভিয়ার ঃ (আর্দ্র চিত্তে সুসির কাঁধে হাত রেখে স্নেহপূর্ণ স্বরে)—সুসি, তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে ক্ষমা চাইছি। চল আমরা এক্ষুনি হাসপাতালে যাই। তোমার এই কথা শোনবার পর আমি সান্নিকে আর একবার দেখতে চাই। এসো, আর সময় নষ্ট কোরো না। (সুসি আশ্বস্ত হয়ে চোখ মুছলো। এই সময় ফোন বেজে উঠলো)।

সেভিয়ার ঃ একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, তার ফোন বোধ হয়। আর দুঘন্টা পরে যাবো বলবো। (ফোন নিয়ে)—হ্যালো……হ্যাঁ সেভিয়ারের বাড়ী…… হাসপাতাল থেকে? (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) কী? (চমকে উঠে) মারা গেছে?

[ফোন হাতে নিয়ে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। এ কথা শুনে চমকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে সুসি 'আমার সান্নি' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে মাথা ঘুরে চেয়ারে পড়ে গেল।]

য্যায়সা কো ত্যায়সা

আনন্দ কুট্টন

চরিত্র

নাম্বুদিরি
লক্ষ্মী
গোবিন্দন
আরমনি
বৃদ্ধ

মলয়ালম সাহিত্যের অধ্যাপক, হাস্যরচনায় সিদ্ধহস্ত, কবি, নট, নাট্যকার আনন্দ কুট্টন জন্মেছেন 1919 সালে। 'চিতা' নামে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত নাটকের তিনি নাট্যকার। তাঁর হাস্যোদ্দীপক লেখা নাটক, ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদির সংখ্যা 13টি। 'নিষ্ঠুর হত্যা' এই একাঙ্ক সংগ্রহ থেকে এই নাটকটি নেওয়া হয়েছে।

য্যায়সা কো ত্যায়সা

[গ্রামের এক নায়ার পরিবার। কাঠের দেয়ালওয়ালা ঘর বাড়ী। পর্দা উঠলে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। চওড়া একটা বেঞ্চ বারান্দায় রয়েছে। সিন সম্পূর্ণ উঠলে দেখা গেল যে একজন নাম্বুদিরি একটা পুঁটলি কাঁধে ঢুকছে।]

নাম্বুদিরি ঃ (একদিকে দেখে)—হ্যাঁ এবার হাসতে পারো......আমি ফিরে এসেছি......কই এই দিকে এসো। ঐ কাব্য-নাটকে একজন নায়িকার কথা হয় না! লক্ষ্মী ঐ নায়িকাদের মত। আমি এখান থেকে কোথাও গেলেই তার বিরহ বেদনা শুরু হবে। এসো এসো, এদিকে এসো ; কত কী নিয়ে এসেছি দেখ।

[লক্ষ্মী আর একদিক দিয়ে স্টেজে ঢুকলেই মাঝবয়স পার হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ নাম্বুদিরির স্ত্রী বলে মনেই হয় না, এত কম বয়স। পোষাক মুণ্ডু[1] ব্লাউজ আর বুক ঢাকা দেবার জন্যে একটা হাফ শাড়ী।]

নাম্বুদিরি ঃ (লক্ষ্মীকে দেখে)—আরে তুমি যে দেখছি খুব রোগা হয়ে গেছ। তাহ'লে আমি যদি মরে যাই, তাহ'লে তুমি সতী হবে নাকি?

[লক্ষ্মী কিছু না বলে একটু মৃদু হেসে দাঁড়িয়ে রইল।]

নাম্বুদিরি ঃ কী? মৌনব্রত ধারণ করেছ নাকি? দেখতে চাও তোমার মৌনব্রত আমি ভাঙ্গি কি না। (পুঁটলি খুলে একটা রঙীন কাগজের প্যাকেট বের করে হাতের তালুতে চেপে ধরলো)......এটা কী বলতো?

লক্ষ্মী ঃ কী করে বলব?

নাম্বুদিরি ঃ ধ্যেৎ, বাজে কথা বোলো না। মেয়েরা জানে না এমন জিনিস পৃথিবীতে আছে নাকি? বল, বল, শীগ্‌গির বলো।

লক্ষ্মী ঃ আমি জানি না।

নাম্বুদিরি ঃ তা বললে চলবে না। (একটু ভেবে) আচ্ছা তাহ'লে নামের প্রথম অক্ষরটা আমি বলছি, প— বাকীটা তুমি ভর্তি করো।

লক্ষ্মী ঃ পায়া (মাদুর) বা পরম্বু (বাগান)। আচ্ছা, একী মুশকিল রে বাবা!

নাম্বুদিরি ঃ আমার ওপর রাগ করো না। আমি তোমার জন্যে এই জিনিসটা সমস্ত বাজার ঘুরে কিনে এনেছি।

---

1 কেরলের জাতীয় পোষাক। চার হাত শাড়ী বা ধুতি। লুঙ্গির মত করে পরা হয়।

লক্ষ্মী ঃ পবন মালা (গিনি সোনার হার) !

নাম্বুদিরি ঃ না।

লক্ষ্মী ঃ পাচ্চা কাম্পু মালা (সবুজ পাথরের হার)।

নাম্বুদিরি ঃ হার-টার নয় বাবা।

লক্ষ্মী ঃ পাদস্বরম্'[1]।

[নাম্বুদিরি না বলার ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগলো।]

লক্ষ্মী ঃ (একটু অপ্রস্তুত হয়ে)—তাহ'লে আমি জানি না যাও।

নাম্বুদিরি ঃ পাট্টা গুলি[2]।

লক্ষ্মী ঃ সেটা কী ?

নাম্বুদিরি ঃ ওটা হচ্ছে আরশোলা মারার গুলি। তোমার আরশোলাকে খুব ভয় বলে বলোনি আমাকে ? এর একটা গুলিই যথেষ্ট। সমস্ত আরশোলা পালাবে।

লক্ষ্মী ঃ ইল্লমে যেরকম আরশোলা সেরকম আরশোলা এখানে নেই।

নাম্বুদিরি ঃ বাঃ বাঃ, সারা বাজার ঘুরে আমি আরশোলার গুলি কিনে নিয়ে এলাম আর তোমার মতলব বুঝি এগুলো ইল্লমে[3] নিয়ে যাওয়া ? ও সব হবে না।

লক্ষ্মী ঃ আমার গুলির দরকার নেই।

নাম্বুদিরি ঃ এই গুলিতে বিষ আছে। আমি এগুলো তাহলে খেয়ে নেব। তুমি আমার বুক চেপে ধরবে। নীলকণ্ঠের মত আমি তাহলে গুলিকণ্ঠ হব। যদি তা না চাও এই গুলিগুলো নিয়ে রেখে দাও। রাখ বলছি।

লক্ষ্মী ঃ বিষ ? আচ্ছা তাহ'লে আমায় দাও, আমি খেয়ে মরবো। তুমি দীর্ঘজীবি হ'য়ে থাকো। অন্তর্জনমত[4] সুখী হ'য়ে বেঁচে থাক।

নাম্বুদিরি ঃ তাহ'লে এই গুলি গুলো কেনাই ভুল হ'য়ে গেছে দেখছি।

[ন্যাপথালিনগুলো খুব ভালো করে কোমরের কাপড়ে গুঁজে রাখলো। পুঁটলি থেকে মুখ বন্ধ করা তালপাতার ছোট্ট একটা বাক্স বের করল।]

—ঠিক আছে। আচ্ছা এটা কী বলতো ?

---

1 মল।

2 ন্যাপথলিন।

3 কেরলের নাম্বুদিরিরা (ব্রাহ্মণ) যে বাড়ীতে বাস করে তাকে সাধারণতঃ ইল্লম বলা হয়।

4 নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের স্ত্রীলোকদের অন্তর্জনম অর্থাৎ অসূর্যম্পশ্যা বলা হয়। এখানে নাম্বুদিরির অন্য এক স্ত্রীকে বলা হয়েছে।

লক্ষ্মী ঃ ইঁদুর ধরার বাক্স বোধ হয়।

নাম্বুদিরি ঃ কন্যাকুমারীর নাম শুনেছ? তিনটে সমুদ্র একজায়গায় এসে মিশেছে। আমাদের চেলএম্ ওখানে গিয়েছিল। সেখান থেকে নিয়ে এসে আমাকে উপহার দিয়েছে।

লক্ষ্মী ঃ ওটা যাই হোক্ না কেন আমার দরকার নেই।

নাম্বুদিরি ঃ এটার বেশ কিছুটা ঐ গোবিন্দনকে খাওয়াও। সেই জন্যে নিয়ে এসেছি। এদিকে দেখো (ঢাকাটা খুললে)।

লক্ষ্মী ঃ এটা কী? ময়দা নাকি?

নাম্বুদিরি ঃ কন্যাকুমারীর চিনির মত বালি, অতি পবিত্র বালি। গোবিন্দন্...... গোবিন্দন্ কোথায়?

লক্ষ্মী ঃ ও ইল্লমে গেছে। তুমি এসেছ কি না দেখতে ওকে পাঠিয়েছি।

নাম্বুদিরি ঃ তুমি এটা ভাবলে কী করে? এখানে না এসে আমি আগে বাড়া যাবো? এরকম ভাবটা কিন্তু তোমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে দেখার জন্যে বুঝি অস্থির হয়ে উঠেছিলে?

লক্ষ্মী ঃ এই আরশোলাগুলি আর বালি নিয়ে তুমি যে ওখানে না গিয়ে আগে এখানে এসেছ তাতে ভালোই হয়েছে।

নাম্বুদিরি ঃ আর একটা জিনিস আছে। তুমি তপস্যায় বসলেও বলতে পারবে না সেটা কী?

লক্ষ্মী ঃ তুমি এতবড় একটা সফর করে এলে, এখন ইল্লমে গিয়ে চান-টান......

নাম্বুদিরি ঃ ফটো কেমন করে নিতে হয় তা তোমাকে না দেখিয়ে আমি কি এখান থেকে যাবো নাকি? দেখো দেখো, এদিকে দেখো। (একটা কার্ড-বোর্ডের বাক্স থেকে একটুকরো ফিল্ম নিয়ে উঁচু করে তুলে দেখতে লাগলো।)

লক্ষ্মী ঃ এটা কী?

নাম্বুদিরি ঃ সিনেমায় ফটো কী করে নিতে হয় তার একটা ভাগ। আরমণি আমাকে উপহার দিয়েছে।

লক্ষ্মী ঃ আরমণি? একটা মেয়ের নাম নাকি?

নাম্বুদিরি ঃ ছ্যাঃ—আরমণি হচ্ছে সিনেমার ছবি তোলার ডাইরেক্টর। হ্যাঁ, একবার দেখতে হয় কেমন করে এই সিনেমার ছবি তোলা হয়।

লক্ষ্মী ঃ আরমণি? কী নামরে বাবা!

নাম্বুদিরি ঃ ও লোকটা খুব কাজের লোক। কী করে সিনেমার ছবি তুলতে হয় তা আমাকে দেখালো। আমি তাকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছি। আমাদের এখান থেকে একজন সুন্দরী নায়িকা তার ছবির জন্যে চাই।

লক্ষ্মী ঃ সুন্দরী নায়িকা? এ গাঁয়ে সুন্দরী আছে কে? ঐ টিলার কাছে বাস

করে যে দেবকী সে নাকি খুব সুন্দরী বলে শুনেছি। তবে তার একটা কাণ ছোট, একটা কাণ বড়। সে কাণ তুটিকে চুল দিয়ে ঢেকে রাখে। সেদিন যখন চান করছিল দেখতে পেয়েছি।

নাম্বুদিরি ঃ তাহ'লে হয়তো সে দেড়কাণওয়ালী নায়িকা হতে পারবে।

লক্ষ্মী ঃ শুধু কি তাই? ঘাড়ের পেছনে কাজুবাদামের মত বড় একটা কালো ছাপও আছে।

নাম্বুদিরি ঃ ওঃ তাতে কিন্তু আসে যায় না। সে যাহোক্, আরমণি যখন আসবে তখন তুমি ইল্লমে থাকবে। আমি আবার আধুনিক হালচাল কিছুই বুঝি না।

[নেপথ্যে ধুপধাপ আওয়াজের শব্দ]

নাম্বুদিরি ঃ কে?

[ভেতর থেকে—ঐ টিলার দিক থেকে আসছে]

লক্ষ্মী ঃ টিলার দিক থেকে? এইরে, আমি ঐ মেয়েটির নামে যা বলছিলাম তা হয়তো সব শুনেছে। (জোরে) তবে দেবকীর মত এমন সুন্দর মেয়ে আমাদের এই গাঁয়ে আর নেই।

নাম্বুদিরি ঃ এখানে আসা হোক্।

[গোবিন্দন ঢুকলো]

গোবিন্দন তুই?

লক্ষ্মী ঃ তুই কখন এলি?

গোবিন্দন ঃ আমি ওখানে গিয়েই ছুটে এখানে আবার চলে এলাম।

লক্ষ্মী ঃ অ্যাঁ?

গোবিন্দন ঃ বাবুমশায় এইদিকে আসছেন দেখতে পেলাম।

লক্ষ্মী ঃ দেখতে পেয়ে এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলি?

গোবিন্দন ঃ কন্যাকুমারী থেকে নিয়ে আসা চিনির ভয়ে।

নাম্বুদিরি ঃ তুই তো বেশ মজার লোক দেখছি।

গোবিন্দন ঃ হ্যাঁ বাবুমশায়, খুব ভালো অভিনয় করতে পারি। আমি যখন মেয়েদের বেশে সাজি তখন আমাকে কেউ ধরতে পারে না। তাই আমাকে চুল লম্বা করে রাখতে বলেছে। ঐ সিনেমার লোকটি এলে আমার কথাও একটু বলবেন বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ আহা, হা হা……রামায়ণ সিনেমা করলে তোকে ঐ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একটা পার্ট দিতে বলবো।

গোবিন্দন ঃ যে করেই হোক আমাকে একটা পার্ট দিতে হবে বাবুমশায়।

লক্ষ্মী ঃ গোবিন্দন, বাবুমশায় তোকে ঠাট্টা করছেন।

গোবিন্দন ঃ হ্যাঁ একটা কথা বলতে বলতে ভুলে গেছি। ও বাড়ীর মায়ের দেহ সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

নাম্বুদিরি ঃ কী?

লক্ষ্মী ঃ ওমা—সারা দেহ পুড়ে গেছে!

গোবিন্দন ঃ কী করে হয়েছে জানেন—গোমস্তাকে আমি একটিন কেরোসিন তেল নিয়ে বাড়ীর মধ্যে যেতে দেখেছি।

নাম্বুদিরি ঃ বোকা কোথাকার! এ কথাটা আগে বলবি......অ্যাঁ? লক্ষ্মী, আমি এখন ওদিকে যাচ্ছি। লোকে মরলে পোড়ে—এযে দেখছি বেঁচে থেকে পুড়ছে!

লক্ষ্মী ঃ আমিও আসছি। (ভেতরে গেল)

নাম্বুদিরি ঃ এই ব্যাটা, এখানে চোখ পিটপিট করে দাঁড়িয়ে না থেকে ওখানে খবর দে যে আমরা আসছি। [গোবিন্দন চলে গেলো।]
এখন কী যে করি (ভাবতে লাগলো)। লক্ষ্মী হয়েছে তোমার, চল।

লক্ষ্মী ঃ (ভেতর থেকে) হাঁটতে আরম্ভ কর। আমি আসছি তোমার পেছনে।

নাম্বুদিরি ঃ হ্যাঁ তাই এসো, তবে আমি হাঁটছি না, দৌড়োচ্ছি।

[দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল।]

[সিন পড়লো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নাম্বুদিরির ইল্লম্। সামনের বারান্দায় মাঝখানে একটা চেয়ার। তাতে পরিষ্কার একটা সাদা তোয়ালে বিছানো। তার সামনে একটা টুলে পানের ডিবে। নাম্বুদিরি কী যেন চিন্তা করতে করতে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে।]

নাম্বুদিরি ঃ গোবিন্দন্......

[গোবিন্দন ঢুকলো]

এদিকে যেন কেউ না আসে তা তোকে আগে থাকতে বলে রাখলাম। আরমণি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

গোবিন্দন ঃ বাবুমশায়, এর মধ্যেই বাগানে আর রাস্তায় লোক জড় হতে শুরু করেছে।

নাম্বুদিরি ঃ কী, এত আস্পর্ধা! আমাদের সঙ্গে দেখা করতে লোক আসছে শুনে বাঁদরগুলো সব এসে জড় হয়েছে! এরকমটি তো হতে দেওয়া যায় না।

গোবিন্দন ঃ এসব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আমি ছাড়া আর কেউ যেন এদিকে না আসে সেতো আপনি বলেই দিয়েছেন।

নাম্বুদিরি ঃ লক্ষ্মী এসেছে?

গোবিন্দন ঃ এক্ষুণি আসবেন।

নাম্বুদিরি ঃ গোমস্তা কোথায়?

গোবিন্দন ঃ এতক্ষণ তো এখানে ছিলেন। একটিন কেরোসিন তেল কিনতে হবে বলে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

নাম্বুদিরি ঃ এতো আচ্ছা বিরক্তিকর ব্যাপার! মনের শান্তি নষ্ট করে দেবার মত সব কাজ। (কী যেন একটা শব্দ শুনে)—কীসের শব্দ ওটা?

গোবিন্দন ঃ ভেতরে মা যন্ত্রণায় চীৎকার করছেন তার শব্দ।

নাম্বুদিরি ঃ (রেগে) কেন, মা একটু চুপ করে শুয়ে থাকতে পারেন না? (গোবিন্দনকে) এই দেখ্ মা যদি চুপচাপ শুয়ে না থাকে তাহলে আমি·····আমি······

গোবিন্দন ঃ মায়ের চীৎকারের চেয়ে আর এক ডিগ্রী বেশী চীৎকার আমি করবো না হয়।

নাম্বুদিরি ঃ ইয়ার্কি হচ্ছে? মারবো এক থাপ্পড়! ঐ লোকটা যখন এখানে আসছে তখন সকলের চীৎকার আরম্ভ হয়েছে—না? ভারী মজার ব্যাপার তো!

[গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল]

(স্ত্রীর উদ্দেশে) কান্না থামাও। কে আসছে জানো? মনে হচ্ছে তাকে অপমান করার জন্যে তোমরা সব রেডি হয়ে আছ।

[ডাইরেক্টর আরমণি ঢুকলো। খুব স্মার্ট সুন্দর পোশাক পরা। হাতে একটা সিগ্রেটের টিন। সিগ্রেট টানতে টানতে ঢুকলো। নাম্বুদিরি বেশ সম্মান দেখিয়ে নমস্কার করে চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বলল। গোবিন্দন দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

আরমণি ঃ আহা বড় দুঃখের কথা! আমি এখনো যেন ঐ কান্না শুনতে পাচ্ছি।

নাম্বুদিরি ঃ (একটু অপ্রস্তুত হয়ে) না, না, ও কিছু না, একটুখানি পুড়ে গেছে।

আরমণি ঃ পুড়ে গেছে?—ও, তাহলে ওটা এখানকার কুকুর।

নাম্বুদিরি ঃ (কিছু বুঝতে না পেরে) হ্যাঁ, এই নামেই তাদের ডাকা উচিত। এখন বলে আর লাভটা কী?

আরমণি ঃ হ্যাঁ, তা ঠিকই। আমি গাড়ী হাঁকিয়ে যখন আসছি তখন কুকুরটা

ঘেউ ঘেউ করতে করতে এক লাফ দিল। গাড়ীর পেছনের চাকায় আটকে গিয়েছিল। কান্না শুনে আমি গাড়ীটা থামাতেই দেখলাম কুকুরটা মরে পড়ে রয়েছে।

নাম্বুদিরি ঃ (এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে) হ্যাঁ, তাহলে কুকুরটার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। (নাম্বুদিরি সিগ্রেটের ধোঁয়া গামছার হাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর গোবিন্দকে বলল)—কলার পায়েস, কলা, ভাজাভুজি সব নিয়ে আয় খুব তাড়াতাড়ি।

[গোবিন্দন খাবার আনতে চলে গেল]

আরমণি ঃ আমি কিন্তু এখন কিছুই খেতে পারবো না।

নাম্বুদিরি ঃ তা বললে হবে না। এখানে এসে একটু মিষ্টিমুখ না করে গেলে কী চলে! আমি তা হতেই দেব না। এখন অল্প কিছু একটু মুখে দিন, তারপর ভাত খাবেন। সে আস্তে আস্তে খেলেই হবে। (সিগ্রেটের ধোঁয়া গামছার হাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।)

আরমণি ঃ আরে, আপনি যে বড় বসছেন না!

নাম্বুদিরি ঃ আমি ঐ রকমই। একদম বসে থাকতে পারি না। আমি সবসময় একটু নড়াচড়া করতে ভালোবাসি। নইলে একেবারে……শোওয়া। (সিগ্রেটের ধোঁয়ার গন্ধ আর সহ্য করতে না পেরে) উঃ……

নাম্বুদিরি ঃ আচ্ছা, এটার কত দাম?

আরমণি ঃ কোনটার?

নাম্বুদিরি ঃ এই যে—যার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আরমণি ঃ এই তো রয়েছে। (টিনটা এগিয়ে দিয়ে) নিন, খান্।

নাম্বুদিরি ঃ না, না, এসব আমি খাই না। এর একটার কীরকম দাম হবে তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

আরমণি ঃ একটার দাম দু'আনা হবে—কেন?

নাম্বুদিরি ঃ হ্যাঁ দু'আনার অত্যাচার। হ্যাঁ আমার অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। (ভেতর দিকে তাকিয়ে) গোবিন্দন্, গোমস্তা ওখানে নেই নাকি?

[গোবিন্দন ঢুকলো]

গোবিন্দন ঃ পায়েস ভাজাভুজি গোমস্তা সব তালাচাবি বন্ধ করে চলে গেছে।

নাম্বুদিরি ঃ (খুব রেগে)—অসভ্য, দূর হয়ে যা এখান থেকে। (গোবিন্দন ভয়ে ভয়ে চলে গেল)—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।

আরমণি ঃ লক্ষ্মী কে?

নাম্বুদিরি ঃ লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী। এখানে এখন লক্ষ্মীও যদি না থাকে তাহ'লে সব গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে।

আরমণি ঃ ওঃ আপনার স্ত্রী বুঝি ?

নাম্বুদিরি ঃ এটা গান্ধর্ব বিবাহ। সেই যে কাব্যে আছে না—'পটের ছবি যেন জীবন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো'—লক্ষ্মীর সম্বন্ধে একথা বলা যায়। (লক্ষ্মী খানিকটা ঢুকে খানিকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।)
(লক্ষ্মীকে)—আমি তোমাকে বলিনি যে আরমণি আসবেন। এই যে সেই ভদ্রলোক।

[লক্ষ্মী আর আরমণি পরস্পরের দিকে তাকালো। তাদের এই দৃষ্টি বিনিময় যেন একটু বেশী করেই হলো।]

আরমণি ঃ (নাম্বুদিরিকে) আমার ফিল্মের জন্য এখনো অবধি আমি একজন নায়িকাকে খুঁজে পেলাম না।

নাম্বুদিরি ঃ যদি দেড়কাণের নায়িকা চান তো দিতে পারি—তাই না লক্ষ্মী ?

আরমণি ঃ না, না তাতে হবে না। এই (লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে) এই রকম সুন্দরী হওয়া চাই।

[লক্ষ্মী লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল]

নাম্বুদিরি ঃ আপনি যদি আমার কাছ থেকে হাতী চান তাও দিতে আমি রাজী……কিন্তু……

আরমণি ঃ হাতী কেন ?

নাম্বুদিরি ঃ যদি গজেন্দ্র মোক্ষমের কাহিনী নিয়ে ছবি তুলতে চান তাহ'লে হাতী লাগবে বৈকি।

[আরমণি উঠে চট্ করে, লক্ষ্মীর একটা ফটো তুলে নিল।]
আপনার বেশ ভালো ঔচিত্য বোধ আছে। আমাদের দু'জনের একসঙ্গে একটা ফটো তোলার ইচ্ছে ছিল। এখন দেখছি তা সম্ভব হবে।

আরমণি ঃ দেখেই আমার কেমন যেন একটা প্রীতি জন্মালো।

নাম্বুদিরি ঃ হ্যাঁ, কারোর কারোর হৃদয়ের মিল মিলে যায়।

আরমণি ঃ ঠিকই বলেছেন।

নাম্বুদিরি ঃ আপনার সঙ্গে এখন ভালো ভাবে আলাপ হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করছি—কত করে পান ?

আরমণি ঃ আমার মাস মাইনে নয়। একটা ছবি ডাইরেক্ট করার জন্য 20,000 হাজার টাকা পাই।

নাম্বুদিরি ঃ (আশ্চর্য হয়ে) তাই নাকি ? আপনি তো তাহ'লে খুব ভাগ্যবান। আপনি সত্যিই লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেছেন।

আরমণি ঃ কে জানে।

[লক্ষ্মী চলে গেল]

নাম্বুদিরি ঃ কোন সন্দেহ নেই। শুধু হাজার নয়, অযুত বার লক্ষ্মী আপনার কাছে এসে ঘুরে গেছেন। হ্যাঁ......আপনি স্নান করবেন তো ?

আরমণি ঃ আমি স্নান করে এসেছি।

[একটি বৃদ্ধ প্রবেশ করলো। আরমণিকে খুব ভাল করে দেখতে লাগল।]

নাম্বুদিরি ঃ (আরমণিকে) এই লোকটি আমাদের সিভিল এজেন্ট। ওকে কোর্টে পাঠানো হলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বৃদ্ধ ঃ রাম্মুন্নি !

আরমণি ঃ What ?

নাম্বুদিরি ঃ আরমণি একটা সিনেমার ছবি তুলতে এসেছেন। বিশহাজার টাকা পাবেন।

বৃদ্ধ ঃ হারমনিয়াম আরমনিয়াম কিছু নয় বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ কী সব বোকার মত কথা বলছ ?

আরমণি ঃ এই লোকটা কে ?

বৃদ্ধ ঃ কেন আর বাবুমশায়কে জিজ্ঞেস করে কষ্ট দিচ্ছ। আমিই বলে দিচ্ছি আমার নাম। তুমি নামটা জানো না বলে যে আর জিজ্ঞেস করছ না তা আমি জানি। তুমি যে ভবানীকে ফেলে পালিয়ে এসেছ তার বাবা আমি। এবার বুঝতে পেরেছ আশা করি।

আরমণি ঃ This is pucca nonsense.

নাম্বুদিরি ঃ এই একটা কোর্ট নয় বুঝলে। আরমণি যদি তোমার নামে কেস লাগায় তাহ'লেই বুঝবে।

বৃদ্ধ ঃ বাবুমশায়, এই লোকটার নাম রামুন্নি। সে আমার মেয়ে ভবানীর স্বামী ছিল। বিয়ের এক বছর পরে ওর হাতের আর গলার দশ পনের ভরি গিনি সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

নাম্বুদিরি ঃ আরে ছ্যা ছ্যা ! তুমি নিশ্চয়ই লোক ভুল করেছ। ইনি হচ্ছেন সিনেমার ডিরেক্টর আরমণি। তোমার বোকামি আর না দেখিয়ে যাও তো দেখি এখান থেকে।

আরমণি ঃ কী সব নতুন গল্প শুনছি। আবার একজন ভবানীও আছে। আমি গয়না-টয়না নিয়ে পালিয়ে গেছি ! (নাম্বুদিরিকে) এই লোকটার বাড়ী ঘর কোথায় ?

নাম্বুদিরি ঃ সত্যি কথা বলতে গেলে আমিও তা জানি না। এই লোকটা আমার কেস-টেস দেখে। জমি থেকে অবাঞ্ছিত লোকদের তাড়ায়—এইসব......

বৃদ্ধ ঃ বাবুমশায়! এসব ঐ লোকটার চালাকি। আমার দেশ যে পানাবলি তা ও ভালো করেই জানে। ওর বাবা আন্ধ কুরু বা......

নাম্বুদিরি ঃ বাস, বাস, আর গল্প তৈরী করতে হবে না। যেতে বললাম না তোমাকে!

আরমণি ঃ পাগল বোধহয়।

বৃদ্ধ ঃ পাগল কি না তা আমি তোমায় দেখিয়ে দেব। তারজন্যে একটা কেস ঠুকে দিলেই যথেষ্ট।

[চলে গেল]

আরমণি ঃ (হতবুদ্ধি হয়ে) লোকটা দেখছি খুব দাম্ভিক।

নাম্বুদিরি ঃ কেস দিতে খুব ওস্তাদ লোকটা। সে যাই হোক্। এখন থেকে এখানকার কেস্ আর ওর হাতে দেব না বলে ঠিক করেছি। আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাহ'লে করা যাক্।

আরমণি ঃ শুধু আমি খেলেই হবে নাকি?

নাম্বুদিরি ঃ আমার স্নান করতে হবে, একটু দেরী হবে।

আরমণি ঃ ঠিক আছে, স্নান করে আসুন, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

নাম্বুদিরি ঃ আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

আরমণি ঃ না, না, কোনো অসুবিধে হবে না। আমি এখানে বসে বই-টই কিছু একটা পড়বো খন।

নাম্বুদিরি ঃ তাহ'লে যাই? (ভেতরে তাকিয়ে) গোবিন্দন, (নেপথ্য থেকে—কী?) (গোবিন্দন ঢুকলো) আরমণির যা চাই সব দিবি। তুই এখানে বসে থাক্। বুঝতে পারছিস?

গোবিন্দন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

নাম্বুদিরি ঃ গোবিন্দনটা খুব চালাক। আচ্ছা, আমি তাহ'লে স্নান করে আসি।

আরমণি ঃ হ্যাঁ আসুন।

[নাম্বুদিরি চলে গেল]

আরমণি ঃ (গোবিন্দকে) তোর দেশ কোথায়?

গোবিন্দন ঃ পুল্লেপড়ি। আমি একটা নাট্যকোম্পানীতে ছিলাম।

আরমণি ঃ তাই নাকি? কীসের পার্ট করতিস?

গোবিন্দ ঃ মেয়েদের।

[নেপথ্যে—গোবিন্দন ওনাকে কফি খেয়ে যেতে বলো]

আরমণি ঃ কে, লক্ষ্মী আম্মা না ?

গোবিন্দন ঃ হ্যাঁ। কফি খেতে……

আরমণি ঃ আমার কফির দরকার ছিল না। তাহলেও লক্ষ্মী আম্মা যখন ডাকছেন। (উঠলো) হ্যাঁ—তুই তাহ'লে সিনেমায় অভিনয় করতে চাস, তাই না ?

গোবিন্দন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। যে কোনো পার্ট হ'লেই হবে।

আরমণি ঃ ঠিক আছে। আমি তোকে নেবো ঠিক করেছি। নায়িকার চাকরের পার্ট তুই করবি।

গোবিন্দন ঃ তাই যথেষ্ট স্যার।

আরমণি ঃ কিন্তু একথা কাউকে বলবি না। খুব গোপন করে রাখবি।

[নেপথ্যে—গোবিন্দন]

গোবিন্দন ঃ আসছি।

আরমণি ঃ হ্যাঁ, আরো কিছু কথা তোর সঙ্গে আছে। কফি খাওয়ার পর বলা যাবে। (উঠলো।)

[পর্দা পড়ল]

তৃতীয় দৃশ্য

[নাম্বুদিরির বাড়ী। নাম্বুদিরি বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে। গোবিন্দন ঢুকলো।]

নাম্বুদিরি ঃ কী হোলো ?

গোবিন্দন ঃ কোথাও খুঁজে পেলাম না, বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ পাজী, বদমাইশ, যা আর একবার ভালো করে খুঁজে দেখ্।

গোবিন্দন ঃ জেটিতে, ফেরিঘাটে, বাসস্ট্যাণ্ডে, সব জায়গায় খুঁজেছি বাবুমশায়। ঐ আরমনিয়ামের গাড়ীতে করে চলে গেছে বোধহয়।

নাম্বুদিরি ঃ ছিঃ ছিঃ কী বলছিস তুই ? লক্ষ্মী আমাদের ফেলে চলে যাবে ?

গোবিন্দন ঃ কালকে আপনি যখন স্নান করতে গিয়েছিলেন তখন কফি খাওয়ানো ছাড়া আরো অনেক কিছু ছিল।

নাম্বুদিরি ঃ তাই বলে কফি খেতে দিয়ে তার সঙ্গে চলে যাবে নাকি ? না, না, লক্ষ্মী সেরকম করবে না।

গোবিন্দন ঃ ওরা আজ পালাবে একথা যখন তারা গোপনে বলছিল তখন আমি তা শুনেছি।

নাম্বুদিরি ঃ তুই স্বপ্ন দেখছিলি নিশ্চয়।

গোবিন্দন ঃ নায়িকার চাকরের পার্ট আমাকে দেবে বলেছিল আর আমাকে নিয়ে যাবেও বলেছিল। একথা আর কাউকে বলতে বারণও করেছিল।

নাম্বুদিরি ঃ (রেগে) আচ্ছা ! তুই তাহলে সব কিছু জানতিস ?

গোবিন্দন ঃ সকলে মিলে ভোরবেলায় যাবো বলেছিল। আমার ভাগ্য খারাপ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ (ভীষণ রেগে) তাহ'লে তুইত আমায় ঠকাচ্ছিলি। যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে।

গোবিন্দন ঃ বাবুমশায়গো আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। সকালে যাবো বলে আমার বাক্সটা আমি ওর গাড়ীতে রেখে দিয়েছিলাম। আমার সিল্কের জামাটা আর আংটিটা এখন কী করে ফেরৎ পাবো ?

নাম্বুদিরি ঃ বাজে বকিস না—দূর হ'য়ে যা এখান থেকে।

গোবিন্দন ঃ বাবুমশায় আমার এই অবস্থায় আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। ওরা যদি নিজের ইচ্ছেমত চলে যায় তার জন্যে আমি কী করতে পারি !

[নেপথ্যে—এদিকে আয়, আয়, আয়, ভয় নেই তোকে কিছু বলবে না]

নাম্বুদিরি ঃ ওঃ এখন আসার মন হয়েছে বুঝি ? কে গোমস্তা ? লক্ষ্মীকে এখানে আসতে বলো। আমি সব ক্ষমা করে দিয়েছি।

[বৃদ্ধ প্রবেশ করলো]

বৃদ্ধ ঃ আমি একটা স্পেশাল গাড়ী ভাড়া করে ওকে এখানে নিয়ে এসেছি বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ তুমি সত্যিই কাজের লোক। কোথায় ? এখানে আসতে বল।

বৃদ্ধ ঃ (ভেতরে তাকিয়ে) এখানে আয় (নাম্বুদিরিকে) ঐ লোকটা কোথায় ?

নাম্বুদিরি ঃ লক্ষ্মী এখানে আসবে না বুঝি ?

বৃদ্ধ ঃ ওর নাম ভবানী।

নাম্বুদিরি ঃ তাহলে লক্ষ্মী কোথায় ?

বৃদ্ধ ঃ এখানে নেই।

নাম্বুদিরি ঃ (রেগে) তুমি এখন কোন পাতালপুরী থেকে আসছ ?

বৃদ্ধ ঃ পাণাবল্লী থেকে বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ সকলে মিলে আমাকে বোকা বানাবার মতলব করেছে দেখছি !

বৃদ্ধ ঃ লোকটা কি পালিয়ে গেছে বাবুমশায় ?

গোবিন্দন ঃ আমার বাক্সটা শুদ্ধু নিয়ে পালিয়ে গেছে।

নাম্বুদিরি ঃ তোকে মেরে আমি সোজা করে দেব।

বৃদ্ধ ঃ ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ লক্ষ্মী ঐ লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ ঃ আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে লোকটা পাজী, মিথ্যুক, বদমাইশ। ইস্ আমি মেয়েটাকে এখানে মিছিমিছি টেনে নিয়ে এলাম।

নাম্বুদিরি ঃ (একটু ভেবে) ঠিক আছে। আমরা তাহলে রামায়ণের পুনরাবৃত্তি করবো। ও মারীচ হয়ে লক্ষ্মীকে আকৃষ্ট করেছে (আবার কী ভেবে বৃদ্ধকে) শোনো, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা সেই ব্যবস্থাই করি।

বৃদ্ধ ঃ হ্যাঁ, লোকটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আমার দিক দিয়ে সিভিল কেস আর আপনার দিক দিয়ে ক্রিমিন্যাল……ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না বাবুমশায়।

গোবিন্দন ঃ আমার বাক্সটার কথাও ভুলে যাবেন না বাবুমশায়।

বৃদ্ধ ঃ বাঃ, ভালোই হ'ল। এই ছেলেটা সাক্ষী আছে। কিন্তু ওর সাক্ষ্যের জোর নেই। এখানকার চাকর বলে কেউ হয় তো ওর সাক্ষীকে গণ্য করবে না।

নাম্বুদিরি ঃ আরে না, না, কেস্-টেস্ দিয়ে কিছু কাজ হবে না। ঐ লোকটাকে নাহক অপদস্ত করতে হবে। তার একটা উপায়ও আছে। ঐ মেয়েটার নাম কি ? তোমার মেয়ের ?

বৃদ্ধ ঃ পাপি আম্মা, ভবানী আম্মা।

নাম্বুদিরি ঃ বয়স ?

বৃদ্ধ ঃ বাইশ। আমি আরজি তৈরী করে দেব বাবুমশায়।

নাম্বুদিরি ঃ না, না তার দরকার নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে ঐ মেয়েটা আজ থেকে আমার স্ত্রী……

বৃদ্ধ ঃ এটা ঠিক হবে না বাবুমশায়। রামুন্নি যদি কেস্ দেয় তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

নাম্বুদিরি ঃ রেজিস্ট্রী করবো। তোমার তো আর আমার ওপর অবিশ্বাস নেই ?

বৃদ্ধ ঃ তা নেই।

নাম্বুদিরি ঃ তাহ'লে এই রকমই হোক। যেমন কর্ম তেমন ফল। ব্যাটা এমন একটা শিক্ষা পাবে (ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।)

[পর্দা]

ভগবান আবার ভুল বুঝলেন

ওম্‌চেরি নারায়ণ পিল্লা

চরিত্র

বৃদ্ধা
লেডি ডাক্তার
গোবিন্দন নায়ার
কৃষ্ণ পিল্লা
জ্যোতিষী

ওমৃচেরি নারায়ণ পিল্লা অধ্যাপক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর জন্ম 1924 সালের ফেব্রুয়ারীতে। 'এই আলো তোমাদের' নামে নাটকটি কেরলা সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার পায়। নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাঁর নাটক 'প্রলয়ম্' 1972 সালে কেরলা সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পায়। তিনি সাতটি নাটক লিখেছেন। 'ভগবান আবার ভুল বুঝলেন' একাঙ্ক সংগ্রহ থেকে এই নামের নাটকটি নেওয়া হয়েছে।

ভগবান আবার ভুল বুঝলেন

একটা বাড়ীর পোর্টিকো। একটা ইজি চেয়ার, একটা বেঞ্চ আর দুটো চেয়ার। ঘরের কোণে একদিকে কৃষ্ণের আর একদিকে একটি বুদ্ধের মৃন্ময় মূর্তি। দেওয়ালে কয়েকটা ফটো আর ক্যালেণ্ডার। মূর্তি দুটোর সামনে দুটি ফুলদানী। পর্দা উঠলে দেখা যাবে যে রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। নেপথ্যে একটি মহিলা প্রসবের ব্যথায় গোঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কান্নার শব্দের সঙ্গে একটি বৃদ্ধার উদ্বেগ আর অধৈর্য স্বর শোনা গেল— হে ভগবান, যেন ভালোয় ভালোয় প্রসব হয়ে যায়!—তারপর হঠাৎ খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে 'এই পাচ্চা, এই পাচ্চা' বলে ডাকতে লাগলো। কেউ সাড়া দিল না, দেখে রেগে 'যত সব নচ্ছারের দল, দরকারের সময় একটারও দেখা পাওয়া যায় না'—বলতে বলতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো। বৃদ্ধা—(কথা বলতে বলতে রঙ্গমঞ্চে ঢুকছে। তার মুখে চোখে উদ্বেগের ছাপ। বয়স ষাটের কাছাকাছি হ'লেও স্বাস্থ্য ভাল)।—'খাওয়ার সময় সব ঠিক কাকের মত এসে হাজির হবে।'—এসব কথা বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে না বলে ঘরের কোণে গিয়ে বাইরে দূরে কী যেন দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জোরে জোরে বলতে লাগলো—'কী হলো কে জানে। বড্ড দেরী হয়ে গেল।'—তারপর পেছন ফিরতেই নেপথ্য থেকে একটা করুণ আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। উদ্বেগে ভেতরে যেতে যেতে—'হে ভগবান, হে শিব, ভালো করে প্রসব করিয়ে দাও বাবা'—বলে ভেতরে ঢুকলো। (বৃদ্ধা ভেতরে ঢোকার পরই বাইরে থেকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে একজন লেডি ডাক্তার এবং তার পেছনে চল্লিশ বছরের কিছু বেশী গোবিন্দন নায়ার স্টেজে ঢুকলো। নায়ারের হাতে ডাক্তারের ব্যাগ। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে ভেতরে নিয়ে গেল। আর্তনাদ এখন একটু কমেছে। ডাক্তার ভেতরে যেতেই—'লক্ষ্মী মা আমার, এই ব্যথা কমিয়ে ভালোভাবে প্রসব করিয়ে দাও মা' বৃদ্ধার এই কথাগুলো শোনা গেল। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। গোবিন্দন নায়ার ফিরে এসে রুমাল দিয়ে কপাল মুছে ইজি-চেয়ারে বসলো। ক্লান্তি, অবসাদ, উদ্বেগ সবকিছু তার মুখে পরিস্ফুট। কপালে রুমাল চেপে ধরে মিনিট দুই চোখ বুজে রইল। এই সময় একটি লোক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো। তার বয়স 50 থেকে 55-এর মধ্যে। মোটা ভূঁড়ি, লম্বা দাড়ি, কপালে চন্দনের রেখা। সেই রেখার মধ্যে বড় একটা

লাল কৌটা। একটা তোয়ালে পাট করে কাঁধের ওপর রাখা। চোখবন্ধ করে থাকা গোবিন্দন নায়ার আগন্তুককে দেখতে পেল না।]

আগন্তুক ঃ (এক মুহূর্ত দেখে জোরে)—কী, এত চিন্তামগ্ন যে?

গোবিন্দন ঃ (চমকে সোজা হ'য়ে বসে চোখ খুলে)—আরে জ্যোতিষী মশায় যে! (বলে উঠে পড়ল। তারপর সম্মানের সঙ্গে ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে) ভবানীর কাল রাত থেকে ব্যথা উঠেছে।

জ্যোতিষী ঃ হুঁঃ! তারপর?

গোবিন্দন ঃ ডাক্তার নিয়ে এলাম এইমাত্র। তিনি ভেতরে গেছেন।

জ্যোতিষী ঃ কোন ডাক্তার?

গোবিন্দন ঃ হাসপাতালে ভালো ডাক্তারের খোঁজ করে পেলাম না।

জ্যোতিষী ঃ ভালোই হয়েছে, একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

গোবিন্দন ঃ তারপর প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করা এই লেডি ডাক্তারটিকে নিয়ে এলাম। দ্বিতীয় আর কাউকে পেলাম না।

জ্যোতিষী ঃ বাচ্চা আর মায়ের আয়ু দীর্ঘই হবে। ভালো ডাক্তার পাওয়া গেলেই বা তারা কী করতো। ভগবানের আশীর্বাদ যথেষ্টই আছে বাচ্চা আর মায়ের ওপর।

[নেপথ্যে দু'একবার আর্তনাদের সঙ্গে জোর কান্না শোনা গেল। তারসঙ্গে বৃদ্ধার 'নারায়ণ' ডাক আর প্রার্থনা। গোবিন্দন নায়ার লাফিয়ে উঠে ভেতরে গেল। জ্যোতিষী একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভেতর দিকে তাকিয়ে রইলো। দু'মিনিটের মধ্যেই গোবিন্দন নায়ার অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে ফিরে এল।]

—কী, কী হয়েছে?

গোবিন্দন ঃ (চেয়ারে বসে)—ডাক্তার দেখছে।

[হে ধর্মশাস্তা* ! ভালোভাবে প্রসব করিয়ে দাও বাবা—বলে জোরে জোরে প্রার্থনা করতে করতে বৃদ্ধা স্টেজে এলো।]

বৃদ্ধা ঃ (জ্যোতিষীকে দেখে খুশী হয়ে)—আহা আপনি কখন এলেন? বাঃ ভগবানের কী অনুগ্রহ! আমি এক্ষুনি আপনার কথাই ভাবছিলাম। ডাক্তার বলেছে প্রসব হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। জ্যোতিষী, আজকে গ্রহগুলোর অবস্থান কেমন? একটা নাতির মুখ দেখে কি আমি মরতে পারবো? পরপর

---

* শিব আর বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তির মিলনে উৎপন্ন পুত্র ধর্মশাস্তা আয়্যাপ্পন নামেও অভিহিত।

তিনটে মেয়ে—আর একটা মেয়ে হলেই সর্বনাশ! এতগুলো মেয়ের দায়িত্ব কি কম কথা নাকি?

জ্যোতিষী : যাদের ভার বইতে হবে তাদের মত নেওয়া হলে মেয়ে জন্ম দেওয়া কবে বন্ধ হয়ে যেতো। কী আর করা যাবে? আমাদের খুশীমত তো আর হবে না।

বৃদ্ধা : না, তা নয় জ্যোতিষী, ভগবান যা দেবেন তা না নিয়ে কি উপায় আছে? আর তা ছাড়া ঐ হতচ্ছাড়া পরিবারে শুধু মেয়েই হয়। জানেন তো ভবানীর তিন বোনেরই এক-একজনের পাঁচটা ছ'টা করে মেয়ে। ঐ পরিবারে পা দিস না কতবার বললাম ছেলেটাকে—তা শুনলো? মেয়েটা তার ঢঙ্ঢাঙ্ দেখিয়ে আমার ছেলেটাকে বশ করলো।

গোবিন্দন : মা তুমি তোমার এই বক্‌বকানি একটু থামাবে?

জ্যোতিষী : ছেলের জন্ম দেওয়া বাড়ী খুদে বেড়ালে তো আর এখন চলবে না।

[ডাক্তার বাইরে এলো]

ডাক্তার : আধঘন্টার মধ্যেই প্রসব হবে। আমি একটা ইনজেকশান দিয়েছি।

[এতক্ষণ চিন্তামগ্ন গোবিন্দন নায়ার উঠে ডাক্তারের বসার জন্যে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল)—নাঃ আমি এখন বসতে পারবো না (ভেতরে যেতে হবে) ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ালো]

বৃদ্ধা : আমি এখন ওদিকটায় একটু যেতে পারিতো?

ডাক্তার : (পেছন ফিরে) আমি ডাকলে আসবেন। (চলে গেল)

জ্যোতিষী : (কী যেন চিন্তা করতে করতে) তা'হলে আধঘন্টার মধ্যেই প্রসব হবে—তাই না? (গোবিন্দন নায়ারকে)—এখন কটা বেজেছে?

গোবিন্দন : (ঘড়ি দেখে) 1·40 মিনিট।

জ্যোতিষী : (ভাবতে ভাবতে)—1·40 মিনিট, তাহ'লে 2·10 মিনিটের মধ্যে প্রসব হবে, তাই না?

বৃদ্ধা : আজ কোন নক্ষত্র, জ্যোতিষী? বিশাখা না অনুরাধা?

জ্যোতিষী : অনুরাধা। অনুরাধা (মাথা নাড়িয়ে) খুব ভাল। তার উপর আবার পূর্ণিমা। (বৃদ্ধাকে)—এখানে পাঁজি নেই? পাঁজিটা নিয়ে আসুন তো।

বৃদ্ধা : ভালো দিন—তাই না? (উঠে) আমার প্রার্থনায় ফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নারায়ণ, নারায়ণ......একটা ছেলে যেন হয় ভগবান!

[ভেতরে গেল, জ্যোতিষী এখনো কী যেন ভাবছিল]

গোবিন্দন : (আগ্রহ ভরে) গ্রহের অবস্থান সব ভালোতো জ্যোতিষী মশাই? আমার এখন জ্যোতিষশাস্ত্রে খুবই বিশ্বাস।

জ্যোতিষী ঃ (হেসে) বিশ্বাস এখন আরো বাড়বে। চারটে বাচ্চার ভার বইতে হ'লে শুধু বিশ্বাস মাত্র নয়, জ্যোতিষশাস্ত্র পর্যন্ত আপনি পড়ে ফেলবেন।

গোবিন্দন ঃ অনুরাধা ভালো নক্ষত্র বলে শুনেছি। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা খুব নাকি হয়।

জ্যোতিষী ঃ তাই-ই তো দরকার—তা নয় কি?

গোবিন্দন ঃ আমাদের বংশের এক কর্ত্তা—মায়ের মামা, অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মেছিলেন।

জ্যোতিষী ঃ তাই নাকি? তিনি নিশ্চয়ই খুব ভাগ্যবান ছিলেন।

গোবিন্দন ঃ (খুব উৎসাহের সঙ্গে) দাদুর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস কারোর ছিল না। হাতীর দাঁতের তৈরী খড়ম পরে তিনি যখন হাঁটতেন তখন তার খটাখট শব্দ শুনেই লোকে ছুটে পালাতো। (তার কথা শেষ হবার আগেই বৃদ্ধা পাঁজি নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।)

বৃদ্ধা ঃ (জ্যোতিষীর হাতে পাঁজি দিয়ে) কার কথা বলছিস?

জ্যোতিষী ঃ আপনার মামা রামন পিল্লার কথা হচ্ছিল। তিনি অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মেছিলেন—তাই না?

বৃদ্ধা ঃ (বসে খুব খুশী হয়ে) হাঁ্যা, অনুরাধা নক্ষত্র বলতেই আমার মামার কথা মনে পড়ে গেল। আমার মামার মত একটি লোক কি আর এই গাঁয়ে জন্মেছে? এখনো তাঁর নাম শুনলে লোকে কাঁপতে থাকে।

জ্যোতিষী ঃ হাঁ্যা, তার মৃত্যু হলেই বা কী? তিনি এখনো অন্যদের কাঁপিয়ে তুলছেন।

গোবিন্দন ঃ তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ানো লোকদের শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হয়েছে।

বৃদ্ধা ঃ যদি তিনি কোনো কিছু করার কথা ভাবতেন যতক্ষণ না তা করতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর চোখে ঘুম ছিল না। আহা, এমন সব লোকেরা খুব কমই জন্মগ্রহণ করে!

জ্যোতিষী ঃ জন্মালেও আপনার মামার মত অন্য লোকদের কাঁপিয়ে দেওয়াটা কঠিন হোতো। (হেসে)—লোকের এখন কাঁপুনিতে বিশ্বাস খুব কমে গেছে; তাহ'লেও কখনো-সখনো তা সম্ভব হ'তে পারে। সবই গ্রহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে।

বৃদ্ধা ঃ হাঁ্যা, হাঁ্যা, গ্রহের অবস্থানের জন্যই তা সম্ভব হয়। মামার কথা তো আমরা সকলেই জানি। কেউ যদি একবার তাঁকে অপমান করতো তাহলে তাকে এবং তার পরিবারকে একেবারে শেষ করে দিতেন। (গলার স্বর একটু নীচু করে)—এই ভবানীর পরিবারের এক কর্তার সঙ্গে গণ্ডগোল বেঁধেছিল। ব্যাপারটা খুবই সামান্য। গুষ্ঠ মন্দিরের দেখাশোনার ভার তখন

ভবানীর মামার ওপর ছিল। উৎসবের দিন ধান নেবার সময়* আমাদের বাড়ীর সামনে অন্ততঃ ঘন্টাখানেক হাতী দাঁড়িয়ে থাকার নিয়ম ছিল। ভবানীর মামা এতে রাজী হয়নি। খুবই দাম্ভিক লোকটা। খুবই দাম্ভিক। কিন্তু আমার মামার কাছে কি আর সেসব জারি-জুরি খাটে? পরের দিন ভবানীর মামার বাড়ীর ধান নেবার সময় হাতীকে নিয়ে যাবার বাজনদার নেই। তখন এসে মামার কাছে মাপ চাইলে পর বাজনদাররা গেল। তারপর যত দিন বেঁচেছিল ততদিন আর ভবানীর মামা আমার মামাকে চটায়নি।

জ্যোতিষী ঃ (পাঁজিটা খুলে দেখে) শেষে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। (হো হো করে হেসে)—তা সত্বেও লোকের কাঁপুনি থামেনি।

[নেপথ্য থেকে হঠাৎ একটা আর্তনাদ আর ক্রন্দনের শব্দ শোনা গেল। গোবিন্দন নায়ার চমকে উঠে পড়লো। দু'তিন মুহূর্ত কাণ খাড়া করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার চুপচাপ বসে পড়লো।]

বৃদ্ধা ঃ হে বাবা ধর্মশাস্তা! আর দেরী কোরোনা বাবা। (জোরে জোরে প্রার্থনা করে।) তাহ'লে অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মালে কোনো মৃত্যু বা অন্য কোনো কিছুর আশঙ্কা নেই তো? আছে নাকি জ্যোতিষী?

জ্যোতিষী ঃ নাঃ, বিশেষ কিছু না, এই মায়ের পরিবারের অল্প......

বৃদ্ধা ঃ সে থাক্‌গে। বাবার আর বাবার পরিবারের দিক দিয়ে কেমন?

জ্যোতিষী ঃ অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মালে বেশীর ভাগ বাবার দিকেই ভাল হয়। মায়ের দিকে যাই হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না—তাই নয় কি?

[এই সময় পঞ্চাশ বছরের একটি মোটাসোটা লোক স্টেজে প্রবেশ করলো। গোবিন্দন নায়ারের শ্বশুর কৃষ্ণ পিল্লা। খুব চিন্তার ভাব দিয়ে, 'কী হ'লো, কী হ'লো' বলতে বলতে ঢুকলো।]

গোবিন্দন ঃ এখনো হয়নি। শীঘ্রিই হবে বলে ডাক্তার বলেছে। (চেয়ারটা এগিয়ে দিল।)

বৃদ্ধা ঃ ডাক্তার ভেতরে আছে। ডাকলে পরে যেতে বলেছে। ডাক্তারের আসার আগে অবধি আমি ঈশ্বরকে ডেকে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। উঃ কী যে বলব! হে ভগবান!

---

* কেরলের মন্দিরে মন্দিরে উৎসবের সময় অনেক বাড়ীতে দেবতার নামে ধান উৎসর্গ করে। সেই ধান নিতে হাতী-বাজনদাররা সব আসে।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়ে এসেছি। এখানে এসে না পৌঁছোনো অবধি আমার আর কোনো কিছু মনে ছিল না।

জ্যোতিষী ঃ হাঁ্যা, ভয় পাবার তো কথাই। আমাদের দিয়ে তাইই শুধু সম্ভব—তাই না কৃষ্ণ পিল্লা ?

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ ডাক্তার কি কোনো ইন্‌জেক্‌শান দিয়েছে ?

গোবিন্দন ঃ হাঁ্যা, এই চার-পাঁচ মিনিট হ'লো একটা ইন্‌জেক্‌শান দিয়েছে।

বৃদ্ধা ঃ আর এখনি ভগবানের দয়ায় জ্যোতিষী এসে উপস্থিত। জ্যোতিষী একেবারে আমাদের চাঁদ—কিন্তু কী রকম ভাগ্য। আজ ঠিক এসে উপস্থিত !

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (আগ্রহের সঙ্গে) হাঁ্যা, তাহলে জ্যোতিষীর মতটা কী ?

বৃদ্ধা ঃ গ্রহের অবস্থান ভালোই। আপনার নিশ্চয়ই আমার শক্ত মামাকে মনে আছে ? তাঁর একই নক্ষত্র।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ তাই নাকি ? তাঁকে চেনে না কে ?

বৃদ্ধা ঃ হাঁ্যা। এটা তিনি অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মেছিলেন বলেই !

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ আমাদের ভেঙ্গুরু দাদার নক্ষত্রও অনুরাধা। তাঁর মত ভাগ্য আর কারো আছে কিনা জানি না।

জ্যোতিষী ঃ তাতো বটেই। এর বেশী সৌভাগ্য আর কে চায় ? টাকা, প্রতিষ্ঠা, নাম।

বৃদ্ধা ঃ হাঁ্যা, ভাগ্য যদি একবার আসে তাহলে সবই আসে। আর কিছু দেখতে হয় না। ঐ ভেঙ্গুরু পাপু আছে না ? ও—

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ পাপু নাম আগেকার দিনে ছিল। এখন পদ্মনাভ পিল্লা বললে লোকে চিনতে পারবে।

বৃদ্ধা ঃ হাঁ্যা তা বটে। ঐ ছেলেটা কতবার যে এখান থেকে পান্তাভাতের আমানি নিয়ে গেছে তা জানো ! এখন সে লক্ষপতি। তবে একটা কথা……হাঁ্যা…… যেখানেই দেখা হোক না কেন ছুটে এসে একবার খবরাখবর নিয়ে তবে যাবে। লোকটির এরকমটি করার কিন্তু কোনোই দরকার নেই। সে এখন এতই বড় হয়েছে।

গোবিন্দন ঃ লোকটা কী করে টাকা করেছে তা দেখতে যেও না, আর দেখারই বা কী দরকার ?

জ্যোতিষী ঃ কী করে করেছে তাতেই বা কী এসে যায়। টাকা-টাকাই—না কি ?

গোবিন্দন ঃ হাঁ্যা, টাকা কালোই হোক্ বা সাদাই হোক্ টাকা টাকাই।

জ্যোতিষী ঃ ঐ টাকার ওপর এখন চিল শকুনি উড়তে আরম্ভ করেছে কী ?

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ এখন শুধু বড়লোক নয়, সে একজন বড় নাগরিকও, জনগণের উপকারী।

গোবিন্দন ঃ ভেগুরু পদ্মনাভ পিল্লা যদি চায় তাহ'লে এমন কাজ এ রাজ্যে নেই যা সে করতে পারে না। সত্যিই লোকটি একটি আদর্শ পুরুষ।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (এ ব্যাপারে তার আগ্রহ একটু বেশী দেখিয়ে)—পদ্মনাভ দাদা যখন জন্মায় তখন ঐ পরিবারের অবস্থাটা কেমন ছিল? আরে, আমি না বললেও তো আপনারা সব জানেন। ওর মা বাড়ী বাড়ী ধান ভানতো, কোনোরকমে এক বেলার খাওয়া জুটতো। ছেলেটাকে স্কুলে পাঠানোর সঙ্গতি পর্যন্ত ছিল না। সেই ছেলেটা আজকের ভেগুরু। লক্ষপতি, সমাজে নামকরা একজন মানীলোক। এটা কী করে সম্ভব হ'লো? সব এই গ্রহের ঠিকমতো অবস্থানের জন্যে, নইলে এর আর কী ব্যাখ্যা করবেন বলুন।

জ্যোতিষী ঃ লেখাপড়া না জানলেই বা কী? কিন্তু সবকিছু কৌশল তার জানা আছে। দলিল লেখার সময়ে সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ালে সে টাকা পাবে। সে যদি কোনো জমি-জায়গার কাছাকাছি যায় তাহ'লে সেই জমি শেষ পর্যন্ত তার হাতে আসবে। একেই বলে ভাগ্য।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ ঐ মণিমঙ্গল পরিবারের, নাম্বুদিরির নায়েবের কথা শোনেন নি? তিন-তিন বছর সে ঐ বাড়ীতে রাজত্ব করেছিল। নাম্বুদিরি তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে দেশ ছাড়লেন। তাঁর নায়েব জমিদার হয়ে গেল।

গোবিন্দন ঃ নাম্বুদিরির ক্ষতি হবার সময় আর ভেগুরুর ভালো হবার সময়—যা হবার তা না হয়ে কী পারে? যার ভাগ্য আছে তার আপনা থেকেই মিলবে।

জ্যোতিষী ঃ ভেগুরুর কপাল আর নাম্বুদিরির কপাল। এই কপাল বলতে......

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ হ্যাঁ একটা কিছু পচলে তবেই না সেটা অন্যের সার হয়।

জ্যোতিষী ঃ একজনের সৌভাগ্য মানেই আর একজনের দুর্ভাগ্য।

বৃদ্ধা ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। যদি কপালে থাকে যে সব যাবে তাহ'লে না গিয়ে পারবে না। আর যদি কপালে থাকে যে ধনসম্পত্তি হবে তাহ'লে ধনসম্পত্তি তার হবেই। এসব হচ্ছে জন্মসময়ের ফল, তা ছাড়া আর কী?

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ হ্যাঁ, তাতো ঠিকই। গ্রহের অবস্থান ভালো হ'লে সব ভাল। ভেগুরুদাদাকে মিছিমিছি ঈর্ষা করে লাভ কী?

বৃদ্ধা ঃ আমার কিন্তু লোকটির ওপর খুব শ্রদ্ধা। কেন তাই যদি জিজ্ঞেস করো তাহ'লে বলি—একটা লোক যার কিছুই ছিল না সে এতখানি করতে পারলো শুধু নিজের বুদ্ধি আর সামর্থ দিয়ে।

জ্যোতিষী ঃ আর যাদের অনেক কিছুই ছিল তারা বুদ্ধি সামর্থের অভাবে আজ নিঃস্ব।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ হ্যাঁ, এখন লোকটাকে সবাই মানে। টাকা হবার সঙ্গে সঙ্গে তার

সব কিছুই হলো। এখন সাংসারিক ব্যাপারে আমাদের চেয়ে তার অনেক জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতা। এখন সে এম. এ. পাশ ছেলেদের পার্সোনাল ক্লার্ক হিসেবে রেখেছে।

গোবিন্দন ঃ সম্প্রতি ভারতের বৈদেশিক নীতি নিয়ে একটা বইও লিখেছে।

জ্যোতিষী ঃ (বাধা দিয়ে) ইংরিজীতে না মালয়ালমে?

গোবিন্দন ঃ (হেসে) মালয়ালমে। হিংসুক লোকেরা বলে সেটাও নাকি অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।

জ্যোতিষী ঃ তা যদি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েই থাকে তাতেই বা কী? যাকে দিয়ে লিখিয়েছে সে যদি কিছু না মনে করে তাহ'লে অন্যদের খারাপ লেগে লাভটা কী?

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ হ্যাঁ, ধন-বৃদ্ধের দরজায় পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে যে কোনও জ্ঞান-বৃদ্ধ। তাই না জ্যোতিষী?

গোবিন্দন ঃ সমস্ত ভারতীয় ভাষায় বইটা নাকি একই সময়ে ছাপানো হবে।

জ্যোতিষী ঃ খুব কাজের লোক। নিজের সামর্থ্যের কথা সব লিখে রাখছে। হ্যাঁ, তাই বলছিলাম আমাদের এখানেও যদি ঐ গ্রহের অবস্থান সব ঠিক থাকে তাহ'লে আমরাও জিতে যাব—তাই না?

[নেপথ্য থেকে খুব করুণ কান্নার শব্দ শোনা গেল। সকলে চমকে উঠে কথা বন্ধ করলো। বৃদ্ধা উঠে তাড়াতাড়ি ভেতরে গেল। জ্যোতিষী আবার পাঁজি খুলে ভালো করে পাতা উল্টে দেখতে লাগলো। নেপথ্যে আর্তনাদের শব্দ এই নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে লাগলো। একটু পরেই বৃদ্ধা ফিরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে গোবিন্দন নায়ার তাকে খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে লাগলো।]

বৃদ্ধা ঃ (দ্রুত গতিতে জ্যোতিষীর কাছে এসে)—এসব হ'তে আর দেরী নেই বল। গ্রহের অবস্থানটা আর একবার একটু ভালো করে দেখুন তো জ্যোতিষী।

[জ্যোতিষীর দৃষ্টি পাঁজিতে। বৃদ্ধা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাবে]

গ্রহের অবস্থান সব খুব ভালো আপনি আগেই বলেছেন। আমাদের শক্ত মামা আর ভেগুরু পদ্মনাভ পিল্লার জন্মের সময়।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ হ্যাঁ, দুজনের দুরকমের সামর্থ্য পাওয়া কি কম কথা নাকি?

গোবিন্দন ঃ কী জ্যোতিষী মশাই, আপনি যে এরকম চুপ করে আছেন?

[জ্যোতিষী এই সময় খুব গভীর কী একটা সমস্যায় অগাধ চিন্তায় ডুবে আছে বলে মনে হলো। কোনো উত্তর দিল না।]

—কাগজ পেন্সিল কি কিছু চাই নাকি?

জ্যোতিষী ঃ (মাথা তুলে এক মুহূর্ত দূরে তাকিয়ে কী যেন ভেবে)—এসব কখন হবে?

বৃদ্ধা ঃ ডাক্তার বলেছে যে সবচেয়ে বেশী হলে দশ মিনিটের মধ্যে।

জ্যোতিষী ঃ (মুখ কুঁচকে কপালে হাত দিয়ে) আর পঁচিশ মিনিট পরে এসব করানো যায় না?

[সকলে শুকনো মুখে জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে আছে]

জ্যোতিষী ঃ (গম্ভীরভাবে)—সময়টা একটু বাড়িয়ে না দিলেই হবে না, ডাক্তারকে বলো। আর পঁচিশ মিনিট পরেই অনুরাধা শুরু হবে। 215 মিনিট থেকে অনুরাধার আরম্ভ।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে গোবিন্দন নায়ারকে)—শীঘ্রি গিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো।

বৃদ্ধা ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝি বিশাখা নক্ষত্র?

জ্যোতিষী ঃ শুধু বিশাখা বলে নয়। বিশাখা নক্ষত্রে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাহলে ছেলে জন্মাবে। আর তাহ'লে……

গোবিন্দন ঃ তাহ'লে? তাহ'লে কী জ্যোতিষী মশাই?

জ্যোতিষী ঃ না, না, তেমন কিছু নয়। তবুও একবার ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে আসুন। শুধু জিজ্ঞেস করা নয়, আর পঁচিশ মিনিট পরে এসব করালেই ভাল হবে বলবেন।

গোবিন্দন ঃ (হতবুদ্ধি হ'য়ে) মা, ডাক্তারকে একবার বাইরে ডেকে নিয়ে এসো তো!

[বৃদ্ধা ভয় পেয়ে—'হে ভগবান, হে আয়্যাপ্পন—মঙ্গল করো বাবা' বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। আর সকলে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধা ভেতরে গেলে পরে জ্যোতিষী অনিচ্ছার সঙ্গে আস্তে আস্তে অন্যদের বলতে লাগলো—'বিশাখা নক্ষত্র, বৈশাখ মাস, পূর্ণিমা, বুদ্ধের জন্মের সময়।]

[অ্যাঁ? বলে গোবিন্দন নায়ার যেন একটা বিরাট আঘাত পেয়েছে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কৃষ্ণ পিল্লা চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলো।—হ্যাঁ গ্রহের অবস্থান সব ঠিক এমনিভাবে রয়েছে। বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হ'লে বাচ্চার কপালে এই ফল লেখা রয়েছে।]

গোবিন্দন ঃ (ভয় পেয়ে) বিশাখা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?

জ্যোতিষী ঃ পঁচিশ মিনিট পরে অনুরাধা আরম্ভ হবে।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (গোবিন্দন নায়ারের কাছে এসে দাঁড়ালো। খুব উদ্বেগ আর ভীত ভাবে) ডাক্তার যা চাইবে, তাই দেব, একবার তাকে গিয়ে বল। আর দশ পনের মিনিট পরে প্রসব করানোর কথা বলে তাকে রাজী করাও। (তারপর জ্যোতিষীর দিকে ফিরে) কোন উপায় আছে কি জ্যোতিষী মশাই ? বিশাখায় যদি জন্মায় তাহ'লে সেই দোষ কাটানোর কোনো উপায় আছে কি ? (জ্যোতিষী ভাবতে লাগলো) এই দোষটা কাটানোর জন্যে অন্য সব গ্রহের অবস্থার অনুকূলে আছে তো জ্যোতিষী মশাই ?

জ্যোতিষী ঃ (একেবারেই অসম্ভব এমনি ভাবে)—বিশাখায় যদি জন্ম হয় তাহ'লে আর কিছু বলার নেই। বুদ্ধ আর একবার অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবে বললে ভুল বলা হবে না। গ্রহের অবস্থান এমনি ভাবে রয়েছে। শাস্ত্রে বলেছে 'গার্হস্থ্য ধর্মরহিতো মুনিযোগমেত—দাজীবনং সকললোকহিতানুকারি'—সন্ন্যাসবৃত্তি নিয়ে লোকহিতে বনবাস জীবন যাপন করেন। অতি বিখ্যাত, কীর্তিমান, বহুজনের হিতের জন্য, বহু জনের সুখের জন্য কাজ করবে, মানে জীবন ধারণ করবে বলা যায়। হ্যাঁ, বুদ্ধের পুনরাবতার বললেও ভুল হবে না।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (গলা ভেঙে গেছে, ব্যাকুল ভাবে) বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যাবে নাকি ?

জ্যোতিষী ঃ সেই শাস্ত্রে বলে না যে সারা পৃথিবী একটা পরিবারের মত, সেইরকম অনশ্বর, যশস্বী আর সকলের আরাধনার বস্তু হয়ে থাকবে। তার মনে মা, বাবা, ভাইবোন, পরিবার ইত্যাদির চিন্তার উদয় পর্যন্ত হবে না। সব লোককে যে নিজের সহোদরের মত দেখবে তার আর মা বাবার চিন্তা কী করে থাকবে ?

[বৃদ্ধা ভীত ত্রাস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে জ্যোতিষীর দিকে এগিয়ে গেল, বিষাদমগ্ন গোবিন্দন নায়ার তার পেছনে।]

বৃদ্ধা ঃ (কাউকেই বিশেষ লক্ষ্য না করে) ডাক্তার এক্ষুনি আসছে। (কৃষ্ণ পিল্লার দুঃখপূর্ণ মুখ দেখে) কী, কী হয়েছে জ্যোতিষী মশাই ? গোলমাল কিছু হয়নি তো ? হে ভগবান শাস্তা......

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (আশ্বাসের সুরে) কিছু না, কিছু না, ভয় পাবার কিছু নেই।

জ্যোতিষী ঃ লক্ষণ সব ঠিক। দেখলেন না উনি শাস্তাকে ডাকলেন। বুদ্ধদেবেরও আর একটা নাম শাস্তা।

বৃদ্ধা ঃ আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। জ্যোতিষী মশাই কী ব্যাপার ?

জ্যোতিষী ঃ বুদ্ধ, বুদ্ধ। বুদ্ধের নাম শোনেননি ?

বৃদ্ধা ঃ বৌদ্ধমত প্রচার করেছেন যিনি (মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে)—ঐ যে ঐ কোণে......

জ্যোতিষী ঃ ঠিক তাই। উনি রাজকুমার ছিলেন, তারপর সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়েছিলেন।

বৃদ্ধা ঃ হ্যাঁ, ভবঘুরে হয়ে যাবার সময়ে যদি জন্ম নেন তো ভবঘুরেই হবে। হ্যাঁ, তার জন্যে আগে কী বলতে চাইছেন আপনি ?

জ্যোতিষী ঃ এই বিশেষ কিছু না। অনুরাধা নক্ষত্র আরম্ভ হবার আগে জন্মালে কী হয় তাই নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

বৃদ্ধা ঃ (উৎকণ্ঠিত হয়ে) কেন, কেন, অনুরাধা শুরু হবার আগে জন্মালে কী হয় জ্যোতিষী ?

[জোতিষী কপাল কুঁচকে, কিছু বলতে অনিচ্ছুক এমনি ভাবে বসে রইল।]

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (খুব বিষণ্ণ ভাবে) বুদ্ধদেবের মত হবে।

বৃদ্ধা ঃ (ভয় পেয়ে) অ্যাঁ......? বুদ্ধের মত সন্ন্যাসী হয়ে যাবে নাকি ?

জ্যোতিষী ঃ বুদ্ধের মত নয়, বুদ্ধই। লোকগুরু, যশস্বী কীর্তিমান বুদ্ধ।

বৃদ্ধা ঃ (অসহ্য দুঃখে) গুরু আর কীর্তির নিকুচি করেছে। সংসার পরিবার ছেড়ে, মা বাবার ওপর কর্তব্য না করে, পরিবারের কোনো ভালো না করে......

জ্যোতিষী ঃ বুদ্ধ দেহ রেখেছেন আজ আড়াই হাজার বছর হ'লো, কিন্তু আজও লোকে তাঁর মত মানে, তাই না কৃষ্ণ পিল্লা ? (কৃষ্ণ পিল্লা খুব দুঃখিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলতে পারল না)—বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছেন আজ দু বা আড়াই হাজার বছর। এখনো লোকে তাঁকে পুজো করছে। অ্যাটম বোমা তৈরী করছে যারা তারা পর্যন্ত বুদ্ধের বাণী নিয়ে শপথ করছে। লোকে তাঁর সোনার, শ্বেতপাথরের আর মাটির প্রতিমা গড়ছে। (ঘরের কোণে রাখা মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে) আপনি পর্যন্ত তাঁর মাটির প্রতিমা পূজো করছেন।

বৃদ্ধা ঃ পূজো করছি ! ঐ কাগজের ফুল, ক্যালেণ্ডার রেখেছি বলে কি পূজো করছি নাকি ?

জ্যোতিষী ঃ সেতো আমরাই শুধু জানতে পারছি। সব ভগবানের অনুগ্রহ মনে করে নিলেই হবে।

বৃদ্ধা ঃ হে ধর্মশাস্তা। এই বিপদটা কাটিয়ে দাও বাবা। একবারও না থেমে তোমার আঠারোটা সিড়ি ভাঙবো বাবা।*

---

* কেরলার সবরি পর্বতে আয়্যাপ্পনের দর্শনের জন্যে আঠারোটা পাথরের বড় বড় সিঁড়ি ভেঙে উঠে পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরে পূজো দেওয়া হয়।

জ্যোতিষী ঃ ধর্মশাস্তা আর বুদ্ধ একই অভিজ্ঞ লোকেরা এইরকম বলে থাকেন। তাহ'লে শাস্তার পুনরাবির্ভাবের সময় চাই না বললে……

বৃদ্ধা ঃ (রেগে) এমনিভাবে তার আবির্ভাবের জন্যে কেউই প্রার্থনা করেননি।

জ্যোতিষী ঃ হ্যাঁ আমরা যা চাই না তাই যদি ঈশ্বর দিতে আরম্ভ করেন তাহ'লে তা সত্যিই কষ্টকর হয়ে ওঠে। ভেণ্ডরুর মত চাওরা হ'লো আর পাওয়া গেল বুদ্ধের মত!

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (গোবিন্দনকে) ডাক্তারকে একটু এইদিকে ডেকে নিয়ে এসোতো। সে হয়তো তাড়াতাড়ি প্রসব করাবার চেষ্টা করছে।

[গোবিন্দন নায়ার হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা শুনে তাড়াতাড়ি ভেতরে গেল।]

বৃদ্ধা ঃ আর আধঘন্টা পরে যদি প্রসব হয়, হে ভগবান!

জ্যোতিষী ঃ তাহ'লে একেবারে ভেণ্ডরুর ভাগ্য। ভেণ্ডরুর জন্মাবার সময়……

বৃদ্ধা ঃ (কার ওপর যেন রেগে)—ভাগ্য চাই ভাগ্য! পুণ্যি কাজ না করলে এসব বলেই বা লাভ কী?

[ডাক্তার আর তার পেছন পেছন বিষণ্ণ গোবিন্দন নায়ার স্টেজে ঢুকলো]

ডাক্তার ঃ কী ব্যাপার, কী চাই আপনাদের?

গোবিন্দন ঃ (একটু অনিচ্ছার সঙ্গে) সময় হ'য়ে এসেছে কিনা জানার জন্যে।

ডাক্তার ঃ কিচ্ছু ভয় নেই। প্রসব হ'তে আর চার-পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না।

জ্যোতিষী ঃ তার জন্যেই ভয়।

বৃদ্ধা ঃ ওঃ ডাক্তার লক্ষ্মী মা আমার!

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (বাধা দিয়ে) প্রসব আর 15 মিনিট দেরী করার উপায়……

গোবিন্দন ঃ (বাধা দিয়ে)—যে করে হোক্ আরো পনের মিনিট পরে যদি প্রসব করাতে পারেন……কোনো ইম্‌জেকশান দিয়ে যদি সময়টা একটু টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

ডাক্তার ঃ (খুব আশ্চর্য হয়ে) বাঃ এত বেশ মজার কথা! এখন আমি চাইলেও কোনো উপায় নেই।

বৃদ্ধা ঃ একটা পরিবারকে বাঁচাও ডাক্তার।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ ডাক্তার, আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহ'লে আমাদের পরিবারটা একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

জ্যোতিষী ঃ হ্যাঁ একটা বিপদ কাটিয়ে দিন ডাক্তার।

ডাক্তার ঃ কী বিপদ? (সকলে চুপ)—পনের মিনিটের মধ্যে প্রসব করলে বিপদটা কী?

জ্যোতিষী ঃ গ্রহের অবস্থান দেখলে, পনের মিনিটের মধ্যে প্রসব করলে বাচ্চার কুষ্ঠি একেবারে ঠিক বুদ্ধের মত হবে।

ডাক্তার ঃ সে তো খুব ভালো কথা। এমন একজন মহান......

বৃদ্ধা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ মহান। সংসারের, পরিবারের কোনো উপকার না করে জগতের সকলের ভালোর জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো লোককে মহান বলো তুমি? তোমার নিজের যদি এমনটি হয় তাহ'লে বোঝা যাবে ভালো না খারাপ।

গোবিন্দন ঃ মা, তুমি একটু চুপ করোতো......ডাক্তার কোনো ইন্‌জেকশান দিয়ে অল্প......

ডাক্তার ঃ মা আর বাচ্চাকে কি জ্যান্ত পেতে চান?

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ না, না দরকার নেই সময় টেনে নেবার। বাচ্চার আর মায়ের কিছু না হয়।

বৃদ্ধা ঃ ডাক্তার যা হয় কিছু একটা কর।

ডাক্তার ঃ বললাম না যে দুটো জীবনের দায়িত্ব তাহ'লে আমার নয়।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ না, না, দরকার নেই, দরকার নেই। কোনো বিপদ যেন না ঘটে, আমার মেয়ে......

[ডাক্তার ভেতরে চলে গেল]

বৃদ্ধা ঃ (কৃষ্ণ পিল্লার দিকে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাকিয়ে)—বিপদ যেন না ঘটে সে কথা বললে ডাক্তার কি আর কিছু করবে? পরিবারের খারাপ হবে তারজন্যে কারো চিন্তা নেই......খুশীই হবে হয়তো সকলে।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (ইঙ্গিত বুঝতে পেরে) মেয়েটার জীবন যদি বিপদে পড়ে, তার চেয়ে বড় কি আছে?

বৃদ্ধা ঃ (রেগে) সর্বনাশ হয়ে যাক্ তাহ'লে। কতবার বলেছি যে ঐ পরিবার-মুখো হ'সনি। এখন দেখলেতো......

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (রেগে) কী দেখলেন?

বৃদ্ধা ঃ যা দেখলাম তা আর আমাকে দিয়ে বলাবেন না।

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ যা বলার তা বলে ফেলুন।

গোবিন্দন নায়ার ঃ আপনারা দুজনে একটু চুপ করবেন? বেচারী যখন প্রসব বেদনায় ছট্‌ফট্ করছে তখন আপনারা আপনাদের হিসেব-নিকেশ মিটোচ্ছেন। এখন কী করা যায় জ্যোতিষী মশায়?

জ্যোতিষী ঃ প্রার্থনা করুন। বুদ্ধদেবের কাছেই প্রার্থনা করুন।

বৃদ্ধা ঃ (রেগে) হ্যাঁ, এখন শুধু প্রার্থনা করাই বাকী আছে। এতদিন ধরে

ভগবানকে ডাকার ফলটা দেখলেন না? গোবিন্দ, তুই গিয়ে ঐ কুঞ্জি দাইকে ডেকে নিয়ে আয়তো। সে অন্ততঃ আমরা যা বলবো তাই শুনবে।

জ্যোতিষী ঃ হাঁ করে ভগবানকে ডাকার চেয়ে তাকে ডেকে আনাই ভালো, কিন্তু আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি ডাকুন।

গোবিন্দন ঃ (হঠাৎ উঠে পড়ে আবার ফিরে)—দূর, গিয়ে কিছু লাভ নেই। কুঞ্জি বাড়ী থাকলেও আসতে যেতে ঘন্টাখানেক লাগবে। ওর বাড়ী এখান থেকে দু মাইল।

জ্যোতিষী ঃ তাহ'লে……(চিন্তা করতে করতে)……হ্যাঁ যদি বুদ্ধই হয়…… তাহ'লে……বুদ্ধের ত্যাগ করার মত একটা রাজত্ব আর সম্পত্তি ছিল, কিন্তু আমাদের তো সে ভয় নেই। তাই……

বৃদ্ধা ঃ (রেগে)—যদি রাজ্য আর সম্পত্তি থাকতো তাহ'লে তো এরকম ভয় পাবার কিছু ছিল না। পোড়া দেশলাই কাঠির মতো বাইরেই ফেলে দিতাম। এখন তা'হলে কী করি ভগবান!

জ্যোতিষী ঃ যদি কুঞ্জি দাইকে না পাওয়া যায় তাহ'লে মন্দিরে কোনো পূজো-টুজো দিতে হবে। আর তো কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধা ঃ (তাড়াতাড়ি) তাহ'লে যা করবার সেটা তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের ভেণ্ডরু তৈরী করেছে যে নতুন কৃষ্ণ মন্দির তাতে পূজো দিলেই হবে। খুব জাগ্রত দেবতা সকলে বলে। ডাকলেই সাড়া দেন।

জ্যোতিষী ঃ হাঁ, দেবতা হ'লে ঐ রকমই হওয়া দরকার। এই নতুন মন্দিরটা হবার পর পুরোনো ঐ শিবমন্দিটার দিকে কি কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে এখন? ভাগ্যবান ভগবান এলে পরে অন্য দেবতাদের আর কোনো সুযোগ নেই। হ্যাঁ… ওখানেই তাহ'লে পূজো দেওয়া হোক্।

[হঠাৎ ভেতর থেকে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। গোবিন্দন নায়ার খুব চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে।]

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (খুব আকুল হয়ে) হে ভগবান, তোমায় দশ লিটার দুধের পায়স দেব বাবা……

জ্যোতিষী ঃ হ্যাঁ, তাহ'লে সকলে একাগ্রমনে ভগবানকে ডাকুন। ভালোভাবে ধ্যান কর গোবিন্দন নায়ার।

[গোবিন্দন নায়ার স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।]

বৃদ্ধা ঃ ভগবানকে ডাক্ গোবিন্দন। দশ লিটার দুধ নয়, ওটাকে কুড়ি লিটার করে দেওয়া হোক। হে কৃষ্ণ, হে সর্বশক্তিমান (চোখ বুঝলো।)

কৃষ্ণ পিল্লা ঃ (মানৎ করার মত আন্তরিকতার সঙ্গে) কালই দেব বাবা দশ কাঁদি কলা দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি।

[ভেতর থেকে বাচ্চার কান্না শোনা গেল--এইরে সব্বনাশ হয়ে গেল বলে চীৎকার করে বৃদ্ধা চেয়ারে ঢলে পড়লো] গোবিন্দন নায়ার ছুটে গিয়ে মাকে ধরে ফেললো। কৃষ্ণ পিল্লা মাথায় হাত রেখে হতাশ হয়ে বসে আছে। সমস্ত আবহাওয়া বিষাদে থমথম্ করছে। আবার বাচ্চার কান্না শোনা গেল। জ্যোতিষী সকলকে খুব ভাল করে দেখে একটু গভীর হেসে—ভগবান আমাদের প্রার্থনাকে হয়তো ভুল বুঝেছেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন যে তাড়াতাড়ি প্রসবের জন্য আমরা তাঁকে ডেকেছি।

[ডাক্তার ষ্টেজে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।]

ডাক্তার ঃ ছেলে হয়েছে, ছেলে......কী ব্যাপার? (বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে নাড়ী দেখতে লাগলো।)

জ্যোতিষী ঃ কিছু হয়নি। ভগবান ভুল বুঝেছেন, এইটুকু মাত্র। হ্যাঁ, যদি ভুলই না বুঝতেন তাহ'লে যুগে যুগে এইসব বিপদ ঘটতো নাকি? ভগবান হলেও দু তিনবার কোনো কিছু একটা হবার পর তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।

[বাচ্চা চীৎকার করে কাঁদছে]

বৃদ্ধা ঃ (মাথা তুলে বুদ্ধের মূর্তিটার দিকে হাত দেখিয়ে)---এটা, এটা ভেঙে ফেলো, ভেঙে ফেলো......(ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে আবার শুয়ে পড়লো।)

অ্যাংজাইটি নিউরোসিস

ডিকোটিস্মান

চরিত্র

শ্রীকুমার

লতা

মীনাক্ষী আম্মা

বাবু

শ্রীনু

কিট্টুন্নি

মাধব মেনন

তিকোটিয়ান নাট্যকার ছাড়াও হাস্যসাহিত্যিক এবং কবি হিসেবে সুপরিচিত। তিনি কয়েকটি কলাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য। তিনি একজন অভিনেতাও বটে। তাঁর সাহিত্যকৃতি আঠারোটি। তাঁর একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহ থেকে এই নাটকটি নেওয়া হয়েছে।

অ্যাংজাইটি নিউরোসিস

[মাধব মেননের বাড়ীর বিরাট একটা ঘর। ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। মাধব মেননের ছোট মেয়ে লতা টেবিলের ওপর রাখা রেডিওটা চালাচ্ছে। তার বয়স বারো থেকে পনের'র মধ্যে। রেডিও থেকে নকল করার একটা সহজ মালয়ালম গান আস্তে আস্তে বার হতে লাগলো। সেই গানের নকল করে লতাও গাইতে লাগলো। গানটা একটু জোরে জোরে আরম্ভ হতেই লতার বড় ভাই শ্রীকুমারন ভেতর থেকে ঘরে ঢুকলো। শ্রীকুমারের বয়স তিরিশ। তার মুখে একটা উদ্বেগের ভাব। লতা তার ভাইকে দেখতে পেল না।]

শ্রীকুমার ঃ (ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলো)—লতা !

[লতা একটু চমকে ফিরে তাকালো]

শ্রীকুমার ঃ (একটু রেগে)—গান করার খুব ভালো সময় পেয়েছিস তুই !

লতা ঃ (খারাপ সময় কি তা বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে)—কী দাদা ?

শ্রীকুমার ঃ (তাড়াতাড়ি রেডিওটা বন্ধ করে)—সব কিছুর একটা সময় আছে। যখন তখন হৈ হৈ করা, অহঙ্কার দেখানো উচিত নয় বুঝলি ?

[লতা দাদা কী বলছে কিছুই বুঝতে না পেরে শ্রীকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

—ছেলেমানুষ তা বুঝি, তাহ'লেও বয়স অনুযায়ী বুদ্ধিও থাকা দরকার। কী, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে ? তোর যদি আর কোনো কাজ না থাকে তাহ'লে বাড়ীর ভেতর গিয়ে চুপচাপ একজায়গায় বসে থাক্। কোনো শব্দ যেন শুনতে না পাই।

[লতা তার বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে, মুখের হাসি হাসি ভাব মুছে যাচ্ছে—কী বলবে, কী করবে তা বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।]

—যা বললাম তা শুনতে পেলি না ? যা, বাড়ীর ভেতর যা। গান শোনার সময় খুঁজে পেয়েছে দেখ না !

[লতা মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। দরজার কাছে এলে পর দেখা গেল লতার আর শ্রীকুমারের মা মীনাক্ষী আম্মা ভেতর থেকে বাইরে আসছে। লতার চোখে জল দেখে ওকে থামিয়ে হাত ধরে, মা জিজ্ঞেস করলো]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কা হয়েছে, মা ?

[লতা হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো।]

—কী হয়েছে বল ?

[শ্রীকুমার খুব অস্বস্তির সঙ্গে ঘরের এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে। লতা একটা কথাও না বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। কিছু বুঝতে না পেরে মীণাক্ষী আম্মা খানিক্ষণ লতার যাওয়ার পথে তাকিয়ে রইলো, তারপর ছেলের দিকে এগিয়ে এলো]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ লতা ওরকম রাগ করে চলে গেল কেন ? কী হয়েছে ?

[শ্রীকুমার মায়ের প্রশ্নের দিকে মনোযোগ না দিয়ে আগের মতই এদিক ওদিক হাঁটতে লাগলো]

—এই তোকে জিজ্ঞেস করছি ! (উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করে)—তুই শুনতে পাচ্ছিস না ?

শ্রীকুমার ঃ পাচ্ছি মা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ পাচ্ছিস? তাহ'লে কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে ?

শ্রীকুমার ঃ মা, মেয়ে হ'লে একটু আঁট-সাঁট হ'য়ে থাকতে হয়, তাদের অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ লতা কী অহঙ্কার দেখিয়েছে ?

শ্রীকুমার ঃ আমি এখানে এলে পরে দেখলাম ও এখানে বসে বসে গান করছে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ গান করলে কি অহঙ্কার দেখানো হয় নাকি ? তাহ'লে লতা মঙ্গেশকর, মুহম্মদ রফি সব বড় বড় অহঙ্কারী—তাই না ?

শ্রীকুমার ঃ তা নয় মা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ তাহ'লে কী ?

শ্রীকুমার ঃ আজ এখানে বসে এমনি করে গান করাটা কি উচিত ?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (ছেলে ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে)—হুঁ, আজকে কী ?

শ্রীকুমার ঃ (কাছে এসে গলা নীচু করে)—রেখার শরীর একটুও ভালো নেই মা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (একটু ঠাট্টার সুরে)—তোর বউয়ের অসুখটা কী ? ও তো এক্ষুনি দাঁত মেজে ঘরে ঢুকলো।

শ্রীকুমার ঃ মা, ডাক্তার কী বলেনি যে আজ বা কাল রেখা প্রসব করতে পারে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ তারজন্যে ?

শ্রীকুমার ঃ লতা যদি এখানে বসে বসে এমনিভাবে গান গায় তাহ'লে রেখার কী মনে হবে ?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ মানে তোর বউয়ের প্রসব হবে বলে এখানে কেউ কথা না বলে, খাওয়া দাওয়া না করে দম বন্ধ করে বসে থাকবে নাকি ?

শ্রীকুমার ঃ তা আমি বলিনি।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ তা বলবি কেন ? শোন, এই পৃথিবীতে কত মেয়েরা প্রসব করছে, বাচ্চা জন্মাচ্ছে, মরছে।

শ্রীকুমার ঃ (অসহ্যভাবে) মা……

মীণাক্ষী আম্মা ঃ তুই আর আমি এখানে বসে বসে চিন্তা করলেও যা হবার তা কি না হ'য়ে পারবে নাকি ? তুই একটা আস্ত গাড়োল। মেয়েটাকে মিছিমিছি কাঁদালি। আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুই তোর দুটো বন্ধুকে এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছিস। তাদের সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর করেছিস ? তারা ঘুম থেকে উঠলো কিনা, মুখ-টুখ ধুলো কিনা, চা খেলো কিনা এসব কিছুর খোঁজ নিয়েছিস ?

[নেপথ্যে হুইশিলের আওয়াজ শোনা গেল—একটা আধুনিক গানের সুর]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (সেইদিকে নজর দিয়ে)—ঐ যে ওরা আসছে (চলে যেতে যেতে) শোন, তুই বসে বসে ভাবিস না ভাবিস তোর বউ প্রসব করবে। তুই তোর বন্ধুদের খোঁজ-খবর নে।

[হুইশিলের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। মীনাক্ষি আম্মা ভেতরে চলে গেল। শ্রীকুমার অস্বস্তির সঙ্গে একজায়গায় বসলো। শ্রীনু আর বাবু, শ্রীকুমারের একই বয়সী দুজন বন্ধু এসে ঢুকলো দাড়ি কামানোর জন্যে বাবুর মুখে সাবান মাখা। হাতে সেফটি রেজর ধরা। শ্রীনু দাড়ি মাজার বুরুশে পেন্ট লাগিয়ে বাঁ হাতে ধরে আছে। ডান হাতে একটা জলন্ত সিগারেট। শ্রীনু হুইশিল দিচ্ছে। বাবুর পরণে একটা খাকী হাফ প্যান্ট, হাতকাটা বেনিয়ান পরা। কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে। শ্রীনু সাদা পায়জামা আর সার্ট পরেছে। বড় একটা তোয়ালে পাগড়ীর মত মাথায় বেঁধেছে। দুজনের হাতে রিস্টওয়াচ। ঘরে ঢুকেই বাবুর নজর প্রথমেই রেডিয়োর ওপর পড়ল। সোজা রেডিওর সামনে গিয়ে সৈন্যদের মত একটা স্যালুট করলো। তারপর বিনীতভাবে বলল—]

বাবু ঃ (রেডিওকে)—হ্যালো, আপনি যে এরকম মৌন হ'য়ে রয়েছেন! কিছু বলতে বা গান করতে পারেন না?

[শ্রীনু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীকুমারকে দেখছে। শ্রীকুমারের এসব দিকে কোনো মনোযোগ নেই। সে তখনো চিন্তামগ্ন]

বাবু ঃ (রেডিও চালিয়ে)—আস্তে আস্তে আরম্ভ করুন, মহাত্মা।

[সরে দাঁড়ালো) রেডিওর একটা গানের তালে তালে নাচার চেষ্টা করতে লাগলো।]

শ্রীনু ঃ (উৎসাহ দিয়ে) বালে······বালে······
বাবু ঃ (নাচ শেষ করে শ্রীকুমারের দিকে তাকিয়ে)—ইনি হচ্ছেন বিশ্বামিত্র, আমি মেনকা। ওনার তপস্যা ভাঙতে আমি এসেছি।

[নাচতে নাচতে শ্রীকুমারের কাছে এসে হাতজোড় করে বলতে লাগলো]—মুনি পুঙ্গব, জাগুন্, জাগুন্।

শ্রীনু ঃ (অপর পাশ দিয়ে বাবুকে নকল করে)—উঠুন, গা তুলুন।
বাবু ঃ ফুলেরা তাদের চোখ মেলছে।
শ্রীনু ঃ পাখীরা গান করছে।
বাবু ঃ প্রপঞ্চ শব্দ মুখরিত হচ্ছে।
শ্রীনু ঃ পেটে রামায়ণ পড়া শুরু হয়েছে।
বাবু ঃ বেড্ কফি এখনো যেন স্বপ্নের মত—
শ্রীনু ঃ জাগুন্।
বাবু ঃ উঠুন।
শ্রীকুমার ঃ (উঠে পড়ে খুব করুণ স্বরে) বন্ধুগণ—
বাবু ঃ শুনুন, শুনুন······
শ্রীকুমার ঃ এটা ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় নয়।
বাবু ঃ হিয়ার হিয়ার······
শ্রীকুমার ঃ ঈশ্বরের দোহাই—তোদের ঠাট্টা তামাশা থামা, (শ্রীকুমারের ভাবভঙ্গী দেখে শ্রীনু আর বাবু পরস্পরের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।)
বাবু ঃ কী ব্যাপার শ্রীকুমার?
শ্রীকুমার ঃ তোরা আমায় ক্ষমা কর ভাই!
শ্রীনু ঃ আরে, এযে দেখছি নাটক অভিনয় করছে।
শ্রীকুমার ঃ হ্যাঁ, এখানে ভেতরে আমরা একটা বিরাট নাটকের জন্য তৈরী হচ্ছি।

বাবু ঃ ভেতরে নাটক?
শ্রীকুমার ঃ হ্যাঁ, জীবনের নাটক।
শ্রীনু ঃ একটু স্পষ্ট করে বল্ না বাবা।
শ্রীকুমার ঃ আমার স্ত্রী……
বাবু ঃ (হো হো করে হেসে উঠে) দুর্ঘটনা……দুর্ঘটনা!
শ্রীনু ঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।
শ্রীকুমার ঃ আস্তে ভাই, আস্তে কথা বল্। আস্তে আস্তে হাস।
বাবু ঃ গর্ভবতী মেয়েদের বুঝি হাসি শোনা বারণ?
শ্রীকুমার ঃ ওর একটু একটু ব্যথা আরম্ভ হয়েছে।
শ্রীনু ঃ (উড়িয়ে দিয়ে)—শুধু তাই? মেয়েরা গর্ভবতী হবে। গর্ভিণী মেয়েদের ব্যথা উঠবে, ব্যথায় ব্যথায় তারা প্রসব করবে।
শ্রীকুমার ঃ (খুব অস্বস্তির সঙ্গে) আস্তে, আস্তে।
বাবু ঃ এর ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে এরই ব্যথা উঠেছে।
শ্রীনু ঃ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে খুবই ব্যথা উঠেছে।
শ্রীকুমার ঃ হ্যাঁ ভাই, তোরা ঠিকই বলেছিস। ব্যথা আমারই, তোরা অবশ্য তা স্বীকার করবি না।
বাবু ঃ আমরা স্বীকার করছি।
শ্রীনু ঃ শুধু ব্যথা নয়, প্রসব তুই করবি তাও আমরা স্বীকার করছি। এই…… তোর যখন এই সম্বন্ধ এসেছিল তখন তোকে আমরা কী বলেছিলাম?
বাবু ঃ তুই ভুলে গেছিস না? এই শেকলে মাথা গলাস্ না আমরা বলিনি?
শ্রীনু ঃ তুই কী আমাদের কথা শুনেছিলি?
বাবু ঃ হ্যাঁ, এখন বোঝো ঠ্যালা, ভালো ভাবেই বোঝ।
শ্রীনু ঃ শুধু এই নয়, এখনো অনেক আছে।
বাবু ঃ এর পরের বছর তোর বউ আবার প্রসব করবে না?
শ্রীকুমার ঃ এই, একটু আস্তে বল।
শ্রীনু ঃ তার পরের বছর প্রসব করবে না?
বাবু ঃ এমনিভাবে বছরে বছরে প্রসব করবে না?
শ্রীনু ঃ এক ডজন ছেলেমেয়ে নিয়ে তোর মাথা ঘুরবে না?
বাবু ঃ একটার চুলকনি।
শ্রীনু ঃ আর একটার হাঁপানি।
বাবু ঃ আর একটার একজিমা।
শ্রীনু ঃ আর একটার আমাশা।
শ্রীকুমার ঃ একটু আস্তে কথা বল, নয়তো চুপ কর।

বাবু ঃ শোন্, বিয়ের মত অপরাধ করলে এইসব শাস্তি ভগবান দেন। বোঝ্, বোঝ্ ঠ্যালা বোঝ্। ভালো করে বোঝ্।

শ্রীনু ঃ যাক্ ওসব কথা। কখন আমরা শিকারে যাচ্ছি?

শ্রীকুমার ঃ শিকারে?

বাবু ঃ বাঃ সেটা ভুলে গেছিস? এখানে একটা ফার্স্ট ক্লাশ নদী আছে। ডিঙ্গি নিয়ে স্নান করতে যাবো। নদী পেরিয়ে গভীর জঙ্গল, সেখানে শিকার করবো বলে তুই লিখেছিলি বলেই না আমরা এসেছি।

শ্রীনু ঃ এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম করে।

শ্রীকুমার ঃ আমাকে তোরা ক্ষমা কর।

শ্রীনু ঃ শিকারে যাবার সময় ক্ষমা করবে জীবজন্তুরা, আমরা নয়।

শ্রীকুমার ঃ আমি যা বলতে চাই তোরা একটু ধৈর্য ধরে শোন্।

বাবু ঃ শুনছি।

[বাবু আর শ্রীনু দুজনে দুটো চেয়ারে গিয়ে বসলো]

শ্রীনু ঃ বল্ শুনছি।

শ্রীকুমার ঃ আমি নেমন্তন্ন করেছি বলেই তোরা এসেছিস। চিঠিতে আমি যা লিখেছি তা সব সত্যি। কিন্তু......

বাবু ঃ (অধৈর্য ভাবে) কিন্তু?

শ্রীকুমার ঃ অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে সব প্রোগ্রাম এখনকার মতো ক্যানসেল করতে হয়েছে।

বাবু ঃ নাঃ এ শুনে তোকে ক্ষমা করতে পারি না।

শ্রীনু ঃ আমিও না।

[দুজনেই উঠে পড়ল]

শ্রীকুমার ঃ এই উভয় সঙ্কট থেকে তোরা আমায় রক্ষে কর।

বাবু ঃ তুই যে আমাদের তোর বাড়ী থেকে চলে যেতে বলিসনি তাই আমাদের ভাগ্য।

শ্রীনু ঃ মেরে গলাধাক্কা দিয়ে যে বের করে দিসনি তাও আমাদের অসীম ভাগ্য।

শ্রীকুমার ঃ তোরা আমায় ভুল বুঝিসনি ভাই। আমাকে এখন স্বামীর কর্তব্য করতে হবে।

বাবু ঃ সে দায়িত্ব তুই নিশ্চয়ই পালন করবি।

শ্রীনু ঃ আর একটা কথা। তোর এখন বন্ধুবান্ধব নেই, স্বাধীনতা নেই, তোর জগৎ এখন গুটিয়ে গুটিয়ে বউ আর ছেলেমেয়েতে এসে থেমেছে।

বাবু ঃ তোর পরলোক পাওয়া স্বাধীনতা লাভ করা আত্মার......

শ্রীনু ঃ নিত্য শান্তি কামনা করি।

বাবু ঃ আয় শ্রীনু, আর একবার কামনা করি—এর স্ত্রীর……

শ্রীনু ঃ নিত্য প্রসব হোক্।

[দুজনে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে—ওম্ শান্তি! শান্তি! বাড়ীর রাঁধুনী কিট্টুন্নি এসে উপস্থিত হলো।]

বাবু ঃ (চোখ খুলেই কিট্টুন্নিকে দেখে)—এই, এখানে এসো।

[কিট্টুন্নি এগিয়ে এল]

শ্রীনু ঃ তোমাদের বউয়ের প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছে?

কিট্টুনি (মুখে হাত চাপা দিয়ে) প্রসব করার গর্ভ তার হয়নি।

বাবু ঃ হ্যাঁ, আমারও তাই প্রশ্ন। যাক্ আমাদের মহাভাগ্য যে পার পেয়েছি।

শ্রীনু ঃ আমাদের বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।

বাবু ঃ স্নান করার পরই আমাদের চা জলখাবার আসবে।

শ্রীনু ঃ তারপরই আমাদের বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে নিয়ে যাবে। কী শুনতে পেয়েছ সব?

কিট্টুন্নি ঃ পেয়েছি।

বাবু ঃ হ্যাঁ যাও, তাড়াতাড়ি সব রেডি করো। (মুখ ফিরিয়ে শ্রীকুমারকে)—গুডবাই।

শ্রীকুমার ঃ তোরা কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস?

শ্রীনু ঃ চিঠিতে সব লিখে জানাবো।

[দুজনেই কিট্টুনির পেছন পেছন চললো। শ্রীকুমার আবার চিন্তামগ্ন হয়ে গেল। রেডিওতে একটা বাদ্যসঙ্গীত বাজছে তাতে শ্রীকুমারের অস্বস্তি আর উদ্বেগ বেড়ে চলছে। একটু পরে শ্রীকুমারের বাবা মাধব মেনন ঘরে ঢুকলো। শ্রীকুমারকে অমনি ভাবে বসে থাকতে দেখে সন্দেহের বশে একটু দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। তারপর সোজা গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করলো। রেডিওর শব্দ থেমে গেল, শ্রীকুমার কিছুই জানতে পারলো না। মাধব মেনন একটুখানি শ্রীকুমারের দিকে তাকিয়ে দেখে ডাকলো—]

মাধব ঃ শ্রীকুমার!

[শ্রীকুমার বাবার গলা শুনে চমকে জেগে উঠলো]

—তোর বন্ধুরা সব চলে যাচ্ছে। তুই যে ওদের এগিয়ে দিতে গেলি না বড়?

শ্রীকুমার ঃ ওরা আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

মাধব ঃ বাসস্টপ অবধি ওদের সঙ্গে তোর কি যাওয়া উচিত ছিল না? তোর হয়েছেটা কী?

শ্রীকুমার ঃ কিছু না বাবা।

মাধব ঃ তা বললে হবে কেন। তোর যেন কী একটা হয়েছে।

শ্রীকুমার ঃ মাথা ব্যথা করছে। (আরো প্রশ্নের হাত এড়াতে ভেতরে চলে গেল।)

মাধব ঃ (একটুখানি কী ভেবে ডাকতে লাগলো) মীণাক্ষী……মীণাক্ষী।

[মীণাক্ষী আম্মা ডাক শুনতে পেয়ে এসে উপস্থিত হলো।]

মাধব ঃ শ্রীকুমারের বন্ধুরা কি চলে গেছে?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কফি খাচ্ছে।

মাধব ঃ শ্রীকুমারের কী হয়েছে?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ওর মতো এমন একটা গাধা ছেলে আর দেখিনি। রেখার আজ না কাল প্রসব করার দিন ডাক্তার বলেছে।

মাধব ঃ তাতে তো খুশী হবার কথা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ও ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

মাধব ঃ কেন? রেখার কী ব্যথা উঠেছে?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ উঠলেই বা কি? আমি আটটা ছেলেমেয়ে প্রসব করিনি? তুমি তখন কোথায় ছিলে? আমার কাছে বসে হা-হুতাশ করছিলে?

মাধব ঃ হ্যাঁ, এক একটা যুগ শেষ হচ্ছে আর মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ঘাবড়ে যাবার ব্যাপারে মেয়েটাও কম যায় না।

মাধব ঃ সেটা ওর দোষ নয়। এই যুগের দোষ। তার জন্যে হা-হুতাশ করে লাভ কী?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ আমি এইরকম দেখলে চুপ করে থাকতে পারি না।

মাধব ঃ তোমার দোষই তাই। একটু কম কথা বললেই হয়।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ এই রকম পাগলামি করলে চুপ করে থাকা যায় নাকি?

মাধব ঃ রেখা কী শুয়ে আছে নাকি?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ আজ চার-পাঁচ দিন সব সময় শুয়ে আছে। কী কাণ্ড! হ্যাঁ, আজকালকার যুগেরই দোষ। এরপর আরো যে কীসব দেখতে হবে তা কে জানে?

মাধব ঃ তার জন্যে তোমার কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। তা দেখার জন্যে তুমি বা আমি কেউ এখানে থাকবো না। তাই কি ভালো না?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই হোক না কেন আমার দেখার দরকার নেই। যে যার চোখের সামনে তাদের বোকামী দেখাক—হ্যাঁ, ডেকেছিলে কেন?

মাধব ঃ শ্রীকুমারের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ওর বন্ধুরা বোধহয় বেরিয়ে পড়েছে। তুমি একটু ওদিকে যাওতো। ওদের একটু এগিয়ে দিয়ে এসো।

মাধব ঃ হ্যাঁ যাচ্ছি (চলে গেল।)

লতা ঃ মা এখন আধুনিক গান আছে। আমি একবার রেডিওটা খুলি?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ না খুকী, দরকার নেই।

লতা ঃ খুব ভালো গান মা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ আজ এই একটা দিন একটু সহ্য কর। তোর দাদার মিছিমিছি রাগ হবে।

লতা ঃ গান শোনা তো বৌদির পক্ষে ভালো মা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ তুই গিয়ে কোনো বইটই নিয়ে পড়। এখানে গণ্ডগোল করিসনি মা।

লতা ঃ (রেডিওর কাছে গিয়ে) আমি খুব আস্তে আস্তে চালাবো মা।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (গম্ভীর ভাবে) তোকে যা বলছি শোন্ অবাধ্যতা করিস না।

[লতা রাগ করে চলে গেল! কিট্টুন্নি একটা কাঁসার পাত্রে ভর্তি জল নিয়ে এলো।]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কী এটা?

কিট্টুন্নি ঃ জলঘড়ি।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কী জন্যে?

কিট্টুন্নি ঃ এটা এখানে রেখে (নীচে রাখলো। একটু ফুটো ওয়ালা নারকেলের মালা জলের ওপরে উঁচু করে রাখলো।)—ফুটো দিয়ে জল উঠে নারকেল মালা ভর্তি হবার সময় একটা একটা করে গুণতে বলেছে)

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কে? শ্রীকুমার?

কিট্টুন্নি ঃ হ্যাঁ।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ভগবান, এসব কী পাগলামী ছেলেটা করছে গো? ওরে এখানে দেখাল ঘড়ি রয়েছে। তিন-চারটে রিষ্টওয়াচ রয়েছে। এসব সত্ত্বেও জলঘড়ির থেকে সময় দেখতে হবে?

কিট্টুন্নি ঃ ঠিক মতো সময় দেখার জন্যে দাদাবাবু জলঘড়ি রেখে গুণতে বলেছে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (রেগে)—হ্যাঁ গোণ্, গোণ্ ভালো করে গোণ। তবে আমার চোখের সামনে দরকার নেই।

[সহ্য করতে না পেরে ভেতরে চলে গেল। কিট্টুন্নি জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।]

শ্রীকুমার ঃ (খুব অস্বস্তির সঙ্গে ঘরে ঢুকলো)—কিট্টুন্নি গুণতে যেন ভুল না হয় বুঝেছ? জন্মমুহূর্ত ঠিকমতো জানতে না পারলে বাচ্চার ভবিষ্যৎ গুণে বলা যাবে না। তাই খুব নজর রাখবে। সবটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

কিট্টুন্নি ঃ কতক্ষণ এইরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

শ্রীকুমার ঃ সে ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই বলতে পারবে না।

কিট্টুন্নি ঃ এখনো ব্যথা আছে?

শ্রীকুমার ঃ হ্যাঁ, একটু একটু ব্যথা করছে বলছিল। (কী ভেবে)—কিট্টুন্নি তোমার ছেলেমেয়ে নেই?

কিট্টুন্নি ঃ আছে।

শ্রীকুমার ঃ কটি ছেলেমেয়ে?

কিট্টুন্নি ঃ (গুণে)—মাধবন, কল্যাণী, আম্পুকুট্টি, পদ্মিনী, শঙ্করণ, কুট্টি, পাপু, বেণু......তারপর......

শ্রীকুমার ঃ তোমার কটি ছেলেমেয়ে তোমার মনে নেই?

কিট্টুন্নি ঃ কী করে মনে থাকবে? বেণুর জন্ম হওয়া অবধি আমি বাড়ীতেই ছিলাম। পরে......

শ্রীকুমার ঃ তোমার বউয়ের প্রসব করতে কষ্ট হয়েছিল?

কিট্টুন্নি ঃ প্রথম প্রথম হয়নি। পরে ও খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীকুমার ঃ তাহ'লে?

কিট্টুন্নি ঃ তখন প্রসব করতে খুব কষ্ট হয়েছিল।

শ্রীকুমার ঃ ডাক্তার ডেকেছিলে?

কিট্টুন্নি ঃ বেশ বলছেন! প্রথমতঃ ওখানে ডাক্তার নেই। ঘরে ডাক্তারকে ডাকতে গেলে আট-দশ মাইল হাঁটতে হবে। ডাকলেও আসতে চায় না। আসলেও অনেক টাকা চায়। আমার পক্ষে কী এসব করা সম্ভব?

শ্রীকুমার ঃ তাহ'লেও কষ্ট হ'লে ডাক্তার ডাকা উচিত (এদিক ওদিক হাঁটা-চলা করতে লাগলো। তারপর নিজের মনে বলতে লাগলো)—প্রসব করাতে একটা ডাক্তারের খুবই দরকার। ডাক্তার কাছে থাকলে ভয় পাবার কিছু নেই। (তারপর মুখ ফিরিয়ে কিট্টুন্নিকে দেখে) কিট্টুন্নি শোনো, এখান থেকে নড়ো না আমি এক্ষুনি আসছি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। (তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকলো।)

কিটুন্নি ঃ (জলভরা ঘড়ার দিকে দেখে) ওঃ এখনি কোমর ব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম করে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি? (বসলো) কে পাপ করলো আর তার ফল ভোগ করছি আমি! এখন কতক্ষণ যে বসে থাকতে হবে তা কে জানে?

মাধব ঃ (ঘরে ঢুকে)—এই তুই. দেখছি ভালো একটা কাজ পেয়েছিস। শ্রীকুমার কোথায়?

কিটুন্নি ঃ বাইরে গেছে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (তাড়াতাড়ি ঢুকে)—এই কিটুন্নি, রান্নাঘরের সব কাজ পড়ে রয়েছে আর তুই এখানে চুপচাপ বসে আছিস? (জলঘড়ি দেখে) অ্যাঁ—এটা এখনো এখানে? যা, এটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে যা।

[কিটুন্নি উভয় সঙ্কটে পড়লো]

—আচ্ছা তুই না ফেললে আমি ফেলছি। (এগিয়ে গেল।)

মাধব ঃ মীণাক্ষী ফেলোনা. ফেলোনা। শ্রীকুমার বলেছে বলেই না কিটুন্নি ওটা ওখানে রেখেছে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ হ্যাঁ, তা আমি জানি। তাই তো ওটাকে ফেলে দিতে বলছি।

মাধব ঃ না, না. দরকার নেই। মার যা বিশ্বাস।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ বিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। এসব করার এখনো সময় হয়নি। রেখা ভাত খেয়ে এই তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

মাধব ঃ যাক্, যাক্ তুমি ক্ষমা করে দাও।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ছেলেটা ভয় পেয়ে মন খারাপ করে কোথায় গেছে?

মাধব ঃ বাইরে গেছে বোধহয়।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ এখন রেখার প্রসবের পর এলেই ভালো হয়।

মাধব ঃ হ্যাঁ, ততক্ষণ কিটুন্নি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি রান্নাঘরে যাও। তোমার জেদের জন্যে শ্রীকুমার যেন কষ্ট না পায়।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ছেলের বোকামি দেখতে যদি বাবার ভাল লাগে তাহ'লে তাই হোক্।

[চলে গেল]

[মাধব মেনন খবরের কাগজটা দেখতে লাগলো। একটু পরেই সামনে ডাক্তার, পেছনে ডাক্তারের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে শ্রীকুমার এসে উপস্থিত হলো।]

ডাক্তার ঃ নমস্কার।

মাধব ঃ (মাথা তুলে) নমস্কার ডাক্তারবাবু—কী ব্যাপার, আপনি যে এখানে ?

ডাক্তার ঃ খুব জরুরী কল বলে শ্রীকুমার ডেকে এনেছে।

শ্রীকুমার ঃ (একটু দ্বিধায় পড়ে)—হ্যাঁ বাবা, রেখাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা ভালো।

মাধব ঃ আপনি ভেতরে যান ডাক্তারবাবু। এর মা ওখানে আছে।

[ডাক্তার ভেতরে গেল। শ্রীকুমারও তার পেছন পেছন যাচ্ছে। মাধব মেনন ডাকলে)—শ্রীকুমার শোন্। শ্রীকুমার ব্যাগটা ডাক্তারের হাতে দিয়ে ফিরে এল।]

মাধব ঃ (একটু রেগে) তোকে ডাক্তার ডাকতে কে বলেছে ?

শ্রীকুমার ঃ বাবা, ডাক্তার এখন এখানে থাকলে কি ভাল হয় না ?

মাধব ঃ তাই নাকি ? তাহ'লে ডাক্তারের আর ফিরে যাবার দরকার নেই ; উনি এখানেই থাকুন। শ্রীকুমার. তুই এ কী পাগলামি করছিস ? ডাক্তার ডাকার দরকার হ'লে তোর মা কি তোকে বলবে না ? তুই এত বোকা হয়ে গেছিস ?

শ্রীকুমার ঃ বাবা, আমি ভেবেছিলাম……

মাধব ঃ বাস, বাস, আমার আর কিছু শোনার দরকার নেই।

[শ্রীকুমার একটু অপমান বোধ করে ভেতরে ঢুকলো, মাধব মেনন আবার কাগজটা পড়তে লাগলো।]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (ভেতর থেকে দৌড়ে এসে মাধব মেননকে জিজ্ঞেস করলো)—আচ্ছা তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে ?

মাধব ঃ আমার না তোমার ?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কেন, ডাক্তার ডেকেছ কেন ?

মাধব ঃ যে ডেকেছে তাকে জিজ্ঞেস করো।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কে ডেকেছে ?

মাধব ঃ কে ডেকেছে তুমিই বল না ?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ শ্রীকুমার ?

মাধব ঃ তাতে সন্দেহ আছে ?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কোথায় সে ? কোথায় ?

[ভেতর থেকে লতা ভয় পেয়ে ডাকছে—]

লতা ঃ মা, মা শীঘ্রি এসো—শীগ্‌গির।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ কী, কী হয়েছে ?

লতা ঃ দাদা, মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (ভয় পেয়ে) মাথা ঘুরে পড়ে গেছে ?

মাধব ঃ যাও গিয়ে দেখ।

[মীণাক্ষী ভেতরে গেল। কিট্টুন্নিও জলঘড়ির কথা ভুলে গিয়ে ভেতরে দৌড়োলো]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (নেপথ্যে) শ্রীকুমার, শ্রীকুমার কী হয়েছে তোর ? (মাধব মেনন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। একটু পরে কিট্টুন্নি, লতা, মীণাক্ষী আম্মা সকলে মিলে ধরে শ্রীকুমারকে নিয়ে এলো।)

মাধব ঃ (চমকে উঠে)—কী……কী হয়েছে ?

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (শ্রীকুমারের মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে—শ্রীকুমার (গলার স্বর ভেঙে গেছে)—খোকা—শ্রীকুমার।

লতা ঃ (কাঁদতে কাঁদতে) দাদা, দাদা।

মাধব ঃ শ্রীকুমার, খোকা ! মীণাক্ষী এখানে বোকার মত বসে না থেকে ডাক্তারকে ভেতর থেকে ডেকে আনো।

[মীণাক্ষী আম্মা তাড়াতাড়ি ভেতরে গেল। মাধব মেনন চেয়ারটা টেনে শ্রীকুমারকে তার দেহে হেলান দিয়ে রাখলো। চাদর দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। ডাক্তার ঢুকলো, তার পেছনে মীণাক্ষী আম্মা]

মীণাক্ষী আম্মা ঃ ডাক্তার বাবু খোকার কী হয়েছে ? দেখছেন কেমন ভাবে চোখ বন্ধ করে রয়েছে। হে ভগবান !

ডাক্তার ঃ ভয় পাবেন না। (কাছে গিয়ে নাড়ী ধরে হার্টের শব্দ সব ভালো ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলো। সকলে দমবন্ধ করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে দেখছে দেখা শেষ করে ডাক্তার গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়ালো)।

মাধব ঃ কী হয়েছে ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার ঃ একটু সিরিয়াস।

মাধব ঃ রোগটা কী ?

ডাক্তার ঃ অ্যাংজাইটিস নিউরোসিস।

মাধব ঃ তার মানে ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ, লক্ষণ দেখে তাই মনে হচ্ছে। ওষুধ দেবার দরকার নেই।

মীণাক্ষী আম্মা ঃ (কেঁদে ফেলে) ডাক্তার বাবু অমন করে বলবেন না আমার ছেলেকে আপনার বাঁচাতেই হবে।

মাধব ঃ কী বলছেন আপনি ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার ঃ যা বলছি তা শুনুন। ভয়ের কিছু নেই। রোগটা সিরিয়াস হলেও ভয় পাবার কিছু নেই। এনার স্ত্রীর প্রসবের পর ইনি ভালো হয়ে যাবেন। তার জন্যে ওষুধের কোনো দরকার নেই। ততক্ষণ অবধি একটু সিরিয়াস হয়ে থাকবেন। আপনারা সকলে এখন ছেলের রোগ সারার জন্য নয়—যাতে আপনাদের বৌমা তাড়াতাড়ি প্রসব করে তার জন্যে প্রার্থনা করুন।

[সকলে কিছু বুঝতে না পেরে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।]

মাধব ঃ প্রসব হবার কী সময় হয়ে এসেছে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার ঃ এখনো দুদিন আছে।

মাধব ঃ তা'হলে এর এই.....কী যেন বলেন?

ডাক্তার ঃ অ্যাংজাইটিস নিউরোসিস।

মাধব ঃ হ্যাঁ তাই......এটা দুদিন থাকবে?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ।

মাধব ঃ মাই গড্! আজকালকার ছেলেমেয়েদের কী হলো!

সম্পত্তি ভাগ

তোপিল ভাসি

চরিত্র

কর্তা
পানিক্কর
জামাই
কোচ্চুভেলু
দেবকী
দলিল-লেখক ছেলে
কুট্টন
মা

জন্ম 1924 সালের এপ্রিলে। দীর্ঘকাল ধরে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে দরিদ্র জনগণের নাট্যকার—এই নামে পরিচিত। ইনি কতকগুলি বিখ্যাত নাটক লিখেছেন। কেরল গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বারা কেরলের সর্বত্র অভিনীত। 'তোমরা আমায় কম্যুনিস্ট করেছ', 'নতুন আকাশ, নতুন পৃথিবী'—তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটক। তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই নাটক। নাটকের সংখ্যা চোদ্দ। 'পরিবার' এই নামের একাঙ্ক নাটক সংগ্রহ থেকে এই একাঙ্কটি নেওয়া হয়েছে।

সম্পত্তি ভাগ

[একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের বাড়ীর সামনের দিকটা। পূব দিকে দরদালানের মত, দক্ষিণে বারান্দা নীচু হয়ে উঠোনের সঙ্গে মিশে গেছে। বারান্দা গোবর আর কয়লার গুঁড়ো দিয়ে বেশ সুন্দর করে মাজা-লেপা। বারান্দার দক্ষিণে একটা পুরোণো খুব বড় কাঠের সিন্দুক, তাতে ধান রাখা। সিন্দুকের ওপর দক্ষিণভাগে একটা মাদুর পাতা। সিন্দুকের দক্ষিণ দিকে লাঙল আর জোয়াল হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে।

সিন্দুকের ওপর উত্তর দিকে মুখ করে বাড়ীর কর্তা পা'দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে হাত দু'টো দিয়ে হাঁটু দু'টো ঘিরে বসে আছে। বয়স ষাটের ওপর। কিন্তু এখনো খুব ভালো করে খাটতে পারে এমন শক্ত মজবুত চেহারা। চুল ছোট করে ছাঁটা। পরণে একটা গামছা, হাঁটু অবধি পরা। ডান হাতে একটা সুপারি কাটার ছুরি। মাঝে মাঝে পানের পিক্ ফেলছে আর নড়ে যাওয়া দাঁতের মধ্যে আটকে থাকা সুপারির টুকরোগুলোকে জিভ দিয়ে বার করে থু করে ফেলছে। তার মুখে একটা বিষাদ ভাব। কী যেন ভাবছে। কাছেই পানের বাটা।

পূব দিকের বারান্দার দক্ষিণ ভাগে পাতা মাদুরে দলিল-লেখক পাচ্চা পানিক্কর বাড়ীর কর্তার দিকে মুখ করে ঝুঁকে একটা কাগজে কীসব যেন লিখছে আর হিসেব করছে। তার বয়স পঞ্চাশের মত। শুকনো শরীর, সাদা ফ্রেমের সাদা চশমা। পরণে পকেট লাগানো হাফহাতা সার্ট, পরণে মুণ্ডু (কেরলের জাতীয় পোষাক, লুঙ্গির মত)। গায়ের চাদরটা পাট করে মাদুরের একপাশে রাখা।

ডান পা'টা গুটিয়ে সেই পায়ের হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে হাতে একটা কলম নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে পানিক্করকে দলিল লেখার সাহায্যকারী ছেলেটা বসে আছে। তার বয়স আঠারোর মত। যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে ফেলবে এমনি ভাব নিয়ে তৈরী হয়ে পানিক্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তার পরণে তার গুরুর মত পকেট লাগানো হাফহাতা সার্ট। সার্টের পকেটে কালি লেগে আছে।

দরদালানের দক্ষিণ-পূবদিকে পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি লোক বসে এক টুকরো কাগজে খয়া একটা পেন্সিল দিয়ে কীসব যেন লিখছে। লোকটি এ বাড়ীর বড় জামাই। তার গ্রামের নাম কিরিকাট। তাই

তাকে কিরিকাটের জামাই বলা হয়। তার চেহারাটা অনেকটা হাফ গুণ্ডার মত।

বারান্দার একেবারে পশ্চিমদিকের দেয়ালের একপাশে হেলান দিয়ে দক্ষিণদিকে চেয়ে কাঁধে একটা বাচ্চাকে শুইয়ে মুখ ভার করে কর্তার বড় মেয়ে কিরিকাটের বউ দেবকী দাঁড়িয়ে। দেবকীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে যেন একটা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে।

কর্তার ছোট ছেলে একুশ বছরের কোচ্চু ভেলু সিন্দুকের পূবদিকের কোণে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, যেন ভগবান থেকে দলিল-লেখক পাচ্চা পানিক্কর, সকলের ওপর তার রাগ। সে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে। সময় বিকেল চারটে।]

পানিক্কর ঃ (মুখ তুলে হাতে চশমাটা নিয়ে—পড়া বা লেখার দরকার শেষ হলে এক মুহূর্তও চশমা সে নাকের ডগায় রাখছে না, হয় হাতে নিয়েছে, নয় কপালের ওপর তুলে ধরছে। কর্তাকে লক্ষ্য করে)—পৌনে চোদ্দ সেন্ট হিসেবে এক জনের ভাগে পড়ছে।

কর্তা ঃ (হঠাৎ চিন্তা থেকে জেগে উঠে)—অ্যাঁ?

পানিক্কর ঃ পৌনে চোদ্দ সেন্টের পরে আরো এক সেন্ট বাকী থাকবে।

কর্তা ঃ ঐ একসেন্ট ছোটো মেয়ের ভাগে লিখে রাখো। (কোচ্চু ভেলু মুখের ভাব আরো তিক্ত করে বাবাকে এক নজরে দেখে আগের মত দাঁড়িয়ে রইল।)

কিরিকাটের জামাই ঃ (তার লেখা কাগজের দিকে দেখে) কত সেন্ট বললেন?

পানিক্কর ঃ পৌনে চোদ্দ সেন্ট করে।

জামাই ঃ তা কী করে হবে?

পানিক্কর ঃ (একটু সন্দেহ করে তার লেখা কাগজের দিকে তাকিয়ে)—আপনার হিসেবে কত হয়েছে?

জামাই ঃ তা দেখার আপনার দরকার নেই। আপনার হিসেব অনুযায়ী দেবকীর ভাগে কত সেন্ট জায়গা পড়বে?

পানিক্কর ঃ (কাগজের দিকে তাকিয়ে)—দেবকী মানে পঞ্চম ভাগীদার—তাই তো?

কর্তা ঃ না, পঞ্চম ভাগীদার লক্ষ্মীকুট্টি।

পানিক্কর ঃ (কাগজ থেকে চোখ না সরিয়ে)—হ্যাঁ, হ্যাঁ লক্ষ্মীকুট্টি। আর এই নামটা?

জামাই ঃ মাইনরের মা।

পানিক্কর ঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, চতুর্থ ভাগীদার।

কর্তা ঃ হ্যাঁ চতুর্থ ভাগীদার।

পানিক্কর ঃ (কাগজের দিকে তাকিয়ে) চতুর্থ ভাগীদারের ভাগে (অ্যাঁ—বলে একটুখানি সময় দেখে) সবশুদ্ধ পৌনে উনসত্তর সেন্ট পড়বে।

জামাই ঃ আমায় দেখছি এখন তাহ'লে আবার আপনার ঐ আঁক কষা শিখতে হয়।

পানিক্কর ঃ আচ্ছা আমি বলছি। (সোজা হ'য়ে বসে)—পৌনে চোদ্দর পৌনে ভাগ পাঁচজনে পেলে পৌনে চার। বাকী $13 \times 5 - 65$। তাহ'লে $68\frac{3}{4}$ অর্থাৎ পৌনে উনসত্তর হ'লো নাকি ?

জামাই ঃ দাঁড়ান, অমনভাবে গুণবেন না। কেন এই পাঁচ ভাগে ভাগ করছেন ?

পানিক্কর ঃ এক-একটা শেয়ার, চারটে বাচ্চা আর তাদের মা।

জামাই ঃ (এবার যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এমনি অর্থসূচকভাবে মাথা নেড়ে) হাঁ—হ্যাঁ।

[কিরিকাটের জামাইবাবুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কোচ্চুভেলু রাগে তার আপদমস্তক একনজরে দেখে নিল।]

পানিক্কর ঃ (কিরিকাটের জামাই-এর কথা বলার ভঙ্গী দেখে এর মধ্যে কী একটা গোলমাল আছে বুঝতে পেরে)—যদি এ নিয়ে কোনো ঝগড়া বিবাদ থাকে তাহ'লে আপনারা তা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিন। দশ ভাগ হবে—পাঁচটা শেয়ার চতুর্থ ভাগীদারের ভাগে লিখতে কত্তা আমাকে বলেছিলেন, আমি সেই মত করেছি। (এখন সে শেষ সিদ্ধান্ত কী তা শোনার জন্যে হাতের কাগজ নীচে রেখে চশমা তার ওপর রাখলো।)

জামাই ঃ (সে অন্যায়ের সমর্থন করবে না এমনভাবে)—তাই যদি হয় তাহ'লে সেইরকমই হোক্ (এমনি অর্থপূর্ণভাবে)—হাঁ তাই হোক্ (উঠে দাঁড়ালো।)

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে জামাইবাবুকে)—এর মধ্যে কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না যেন জামাইবাবু।

কর্তা ঃ কোচ্চুভেলুকে)—এই, তুই চুপ কর। তুই এর মধ্যে মাথা গলালে ঝগড়া না হ'য়ে যাবে না।

জামাই ঃ আমার চালাকি করার কোনো দরকার নেই। তোমাদের দেওয়া আধসেন্ট জমিও আমার দরকার নেই।

[একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠোনে নেমে পড়লো]

কর্তা ঃ (জামাইকে একটু অনুনয় করে)—এরকমভাবে বোলো না। আর যে দু' তিনটে ছেলে-মেয়ে আছে তাদের কি আমি বাড়ী থেকে বের করে দেব নাকি ?

দেবকী ঃ (খুব দুঃখ পেয়ে)—আমার চারজনকে আমি কোথা থেকে তাহলে ভাগ এনে দেব ?

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে বাবার দিকে তাকিয়ে)—তুমিই এইসব গণ্ডগোল করে রেখেছ।

কর্তা ঃ তোরা এখন যা বলার তাই আমায় শুনতে হবে ! আমার অনেক দোষ আছে।

কোচ্চুভেলু ঃ (রাগ আর দুঃখের সঙ্গে পানিকরকে)—বিয়ের পরই দিদির ভাগটা ভাগ করে দিলে আজ আমাদের এমনিভাবে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'তো না পানিকর দাদা।

[কোচ্চুভেলুর এই কথার ন্যায্যমূল্য আছে এমনিভাবে দলিল-লেখক মাথা নাড়তে লাগলো।]

জামাই ঃ হ্যাঁ, তখন পেলে তার থেকে লাভও আদায় করতে পারতাম।

পানিক্কর ঃ (কাউকেই না চটাবার ভাবে)—কিরিকাটের জামাই তার নিজের কথা বলছে।

কোচ্চুভেলু ঃ (জামাইবাবুকে উত্তর দেওয়ার ভাবে) ঐ পুরোনো গল্প আর করবেন না আপনি।

কর্তা ঃ এই কোচ্চুভেলু—তুই এইসব বাজে কথা কেন বলছিস কোচ্চুভেলু…… তুই…… ?

কোচ্চুভেলু ঃ (বাবার কথায় কাণ না দিয়ে)—তখন দিলে সম্পত্তি সব বেচে খেতেন।

দেবকী ঃ বেচে খেলেও ভাইদের কারোর কাছেই দুমুঠো ভাত জোগাড় করে দেবার কথা বলতাম না।

কর্তা ঃ (রেগে মেয়েকে)—এই, তুই এমনভাবে কথাবার্তা বলিসনে। (জামাইকে দেখিয়ে)—ও বললেও তুই বলিসনে। কারোর যদি কিছু হয় তখন সে সাহায্যের জন্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে না এসে পারে না। (পানিক্করকে) তাই না পানিক্কর ?

দেবকী ঃ (দৃঢ়ভাবে) না, আমি কখনো আসতাম না।

পানিক্কর ঃ (কাউকেই না চটানোর ভাবে)—তা সেরকম এলে খারাপ কিছু দেখায় না। অন্য লোকের কাছে তো আর আসছ না।

জামাই ঃ (সে এসব ছোটখাটো ব্যাপারের অনেক ওপরে এমনি ভাব দেখিয়ে) —এইসব ছেলেমানুষেরা কিছু বললে আমাদের তাতে কাণ দিয়ে লাভ কী ? কী বলো পানিকর দাদা?

কোচ্চুভেলু ঃ (ছেড়ে না দিয়ে)—হ্যাঁ, এমনিভাবে ছেলেপিলেরা কিছু বললে তা নস্যাৎ করে দেবেন না। আগে ভাগটা পেলে আপনি তাকে বাড়িয়ে লাভ উঠোতে বললেন। আগে যা পেয়েছিলেন তা এখন কোথায়?

জামাই ঃ (রেগে) আগে দেবকীকে বাচ্চাদের নামে ভাগ লিখে দেওয়া হয়েছিল?

কোচ্চুভেলু ঃ তখন ঐ সম্পত্তিতে আমাদেরও ভাগ ছিল। চারশ' টাকা যৌতুক আপনাকে দেওয়া হয়েছে। টাকাটা দেওয়া হয়েছিল কিছু একটা করার জন্যে —একটা চায়ের দোকান বা পান-বিড়ির দোকান দিতে। তা না, সমস্ত টাকাটা খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন!

দেবকী ঃ (কোচ্চুভেলুকে)—তিন-চারটে বাচ্চাকে বড় করেছে কে? তুই নাকি?

জামাই ঃ (রেগে) টাকা দিয়ে সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলে কেন? মেয়েকে বাড়ীতে বসিয়ে রাখলেই হতো। তাহ'লে আর শেয়ার দেওয়ার দরকার হতো না।

কর্তা ঃ (হঠাৎ রেগে গিয়ে)—তুমি এরকম কথা বোলো না জামাই। ছেলেটা যদি না জেনে শুনে কিছু বলে থাকে তার জন্যে বাচ্চাদের সামনে তোমার এরকম বলাটা উচিত হয়নি।

জামাই ঃ যে ছেলে কিছু জানে-শোনে না সে এরকম করে বলে নাকি?

দেবকী ঃ (বাবাকে) উনি কিছু একটা বলতেই বাবা তোমার গায়ে লাগল। তোমার ছেলে কী বললো সেটা বুঝি তুমি শোনোনি? আমাকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় চারশ' টাকা খরচের হিসেব ও বলল না? (কষ্ট পেয়ে) আমার আর আমার বাচ্চাদের হয়ে বলার কেউ নেই।

[শোক বাড়লো]

পানিক্কর ঃ সকলে মিলে এরকম ঝগড়াঝাঁটি না করে মিলেমিশে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক করতে হবে।

কর্তা ঃ (মেয়েকে) কোচ্চুভেলু ওরকম বলেছে বলে তোর খারাপ লাগলো। (অন্য গলায়) তোর ত একবার ভাবা উচিত—তোর মত একটা ভাগ লক্ষ্মীকুট্টিও পাবে। তোর স্বামীকে রাজী করিয়ে লক্ষ্মীকুট্টির জন্যে কিছু করার কথা বলবি তো তুইই। (নিঃশ্বাস ফেলে) আজ তার হয়ে বলার আছি মাত্র আমি।

দেবকী ঃ (একটু সাহস করে)—কেন? কেন এমনটি হলো?

জামাই ঃ (স্ত্রীকে) তুমি চুপ করে থাকো।

কর্তা ঃ (দুঃখ আর রাগ মেশানো স্বরে)—কেন এমনটি হলো? তা যদি বলি,

তুই তাহ'লে আমার সঙ্গে কথা বলবি না। তোর বিয়েতে যে টাকা আমি দিয়েছি তার আদ্ধেক আমার হাতে থাকলে আমার খুকীকে এখান থেকে আমি কবে পাঠিয়ে দিতাম। (পানিক্করের দিকে তাকিয়ে) তাই না পানিক্কর?

পানিক্কর ঃ (একটু সন্দেহের সুরে) তা বৈকি!

দেবকী ঃ লক্ষ্মীর তো দুটো ষণ্ডাগণ্ডা ভাই আছে। ওদের একজন তো তাকে কিছু দিতে পারে। ওর বিয়ের সম্বন্ধের জন্য তিন-চার পার্টিকে নিয়ে এসেছে —আমার ছেলের বাবা, আর কেউ নয়।

জামাই ঃ (সে যেন কত ত্যাগ স্বীকার করেছে এমনিভাবে)—আঃ তুমি আবার এসব কথা তুলছ কেন?

[ততক্ষণে দলিল লেখার সাহায্যকারী ছেলেটা দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমোতে শুরু করেছে।]

কোচ্চুভেলু ঃ (দেবকীর কথার উত্তর দিয়ে) ওঃ—ওরা এইসব বলে নিজেদের দাম বাড়াচ্ছে দেখ না।

দেবকী ঃ (সব রাগ তার ওপর ঝেড়ে)—দূর হ তুই!

পানিক্কর ঃ কোচ্চুভেলু তুমি একটু চুপ করো তো। তোমার বাবা রয়েছেন না? তিনিই এসব নিয়ে কথা বলবেন।

কর্তা ঃ (মেয়েকে) তুই যে ভাইয়ের কথা বললি সেটা কি কোচ্চুভেলুকে উদ্দেশ্য করে নাকি? ওর কি একটা চাকরী-বাকরি আছে? আর যদি বড় ভাইয়ের কথা মনে করে বলে থাকিস তা'হলে তার সম্বন্ধে কথা বলার তোর কোনো অধিকার নেই। সে আপিস থেকে যা নিয়ে আসে তাই দিয়ে সংসার চলে। চাষ-বাস করে আর কতটুকু পাওয়া যায়? সে সকলেই জানে। (পানিক্করের দিকে তাকিয়ে) ও এখন যদি বিয়ে করে চলে যায় তাহ'লে এইটুকুও পাওয়া যাবে না পানিক্কর। পরশুদিন বললো—ছোট বোনটার বিয়ে না হওয়া অবধি সে কোনো মেয়েকে ঘরে তুলবে না। ওকে দিয়ে তোর যদি কোনো উপকার হয় তো হোক্।

দেবকী ঃ (রেগে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—অফিসের টাকা সব বোনের তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে আছে বলে আমাকে দিয়ে দিচ্ছে!

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে) অকৃতজ্ঞের মতো কথা বলো না।

দেবকী ঃ (রেগে) কেন, কি কৃতজ্ঞতা দেখানোর আছে? (চেঁচিয়ে) হ্যাঁ—হ্যাঁ ভাইয়েরা, মা, বাবা সব আমার আর আমার ছেলেমেয়েদের খরচ দিচ্ছে; আমাকে দিয়ে আর বলিও না।

কর্তা ঃ (অর্থপূর্ণ স্বরে)—হুঁ। গরু মরে গেলে দইয়ের টকও কমে যায়—তাই না?

পানিক্কর ঃ (দলিল লেখার ছেলেটাকে ঘুমোতে দেখে)—এই, এই তুই যে ঘুমোচ্ছিস বড়!

[ছেলেটা ধড়ফড়্ করে উঠে পড়ল]

দেবকী ঃ (বাবার কথার উত্তরে)—মায়েও এই কথা বলে। তোমরা আমার জন্যে কী করেছ যে বলছ যে দইয়ের টক কমে যায়? তোমরা যদি কিছু করে থাকো তা আমার সম্পত্তি এখানে আছে বলে, মা-ভাই কারোর দয়ায় নয়। (পানিক্করকে) আমাকে দিয়ে বলালে, না বলে কি পারা যায় নাকি?

[হঠাৎ—'হ্যাঁ তোকে বলতে হবে'—বলে দেবকীর মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। জীবনে অনেক ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করা এক বৃদ্ধা। একটা গামছা দিয়ে বুক ঢাকা। মেয়ের কথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ আর দুঃখিতভাবে প্রবেশ করলে।]

মা ঃ হ্যাঁ তোকে বলতে হবে, বলতেই হবে। আমার চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে তোর ওপরই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা আমার ছিল। তাই তোকেই বলতে হবে। (বলতে বলতে তার কণ্ঠ আরো বাড়তে লাগলো)—তোর জন্যে আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি তা আর কোনো ছেলেমেয়ের জন্য করিনি। তোর দু'বছরের সময় তোর সারা মাথায় ঘা হয়ে গিয়েছিল। মাথার পেছনে একটা নারকেলের মত ফুলে ফেটে গিয়েছিল। (পানিক্করকে) বাচ্চাকে কি এই অবস্থায় দোলনায় শুইয়ে রাখা যায়? (পানিক্কর মাথার ঘা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এমনিভাবে মুখ কুঁচকালো, তারপর মা যা বলছে তা যেন ঠিকই, এমনিভাবে মাথা নাড়লো)—মাদুরে শোয়ানো যায়? কারোর হাতে বাচ্চাকে দেওয়ার একটা লোক ছিল? দশদিন একে কাঁধে রেখে আমি দাঁড়িয়ে বসে কাটিয়েছি। (নাক ঝেড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেয়ের দিকে ফিরে)—এসব করেছি তোর সম্পত্তি এখানে আছে বলে তুই বলবি। হ্যাঁ……তুই তাইই বলবি। (পানিক্করকে দেখিয়ে) ঐ যে একটা লোক বসে আছে তার শোনার জন্যেও বলছি (পানিক্করকে) একে এখান থেকে পাঠিয়ে দেবার পর চার-চারটে বাচ্চার মা হয়েছে। ওণম[1] বা তিরুবাতিরায়[2] 'আমার মায়ের ঠাণ্ডা লাগে' বলে একটা গায়ের চাদর কিনে দিয়েছে? একবার জিজ্ঞেস করে

1 ওণম—কেরলের জাতীয় উৎসব। ফসল কাটার পর এই উৎসব আরম্ভ হয়।

2 তিরুবাতিরা—উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের উৎসব। শিবের মতো বর পাবার জন্য শিব পূজো করে।

দেখ। (পানিক্কর আগের মতই মাথা নাড়তে লাগলো) একটু তামাক পাতা কিনে (কাঁধে হাত রেখে মনোকষ্টে মাথা নীচু করা বাড়ীর কর্তাকে দেখিয়ে) এই বুড়োটাকে 'বাবার পান খাবার জন্যে দিলাম' বলে কিছু দিয়েছে কিনা একবার জিজ্ঞেস করে দেখো। (একটু রেগে আবার মেয়ের দিকে ফিরে) তুই এখন তোর মা বাবার দোষ দিয়ে সম্পত্তির ভাগ নেবার জন্যে তোর লোকটাকে ডেকে নিয়ে এসেছিস। (কিরিকাঠের জামাই একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো। দেবকীর মা আবার পানিক্করের দিকে ফিরে মনের দুঃখে বলতে লাগলো)—ও চারটে বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। তিনটের ভার আমি নিয়েছিলাম। বাচ্চা হওয়ার পর ফিরে যাবার সময় চুকচুকে হয়ে গেছে না না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে—ঐ তো ওর স্বামীও রয়েছে, একবার জিজ্ঞেস করে দেখো না। (আবার মেয়ের দিকে ফিরে মনের দুঃখে)—এইসব দেখে শুনে আমার যে কতখানি কষ্ট হয় তা তুই বুঝবি কী করে? (কর্তার দিকে হাত দেখিয়ে) আজ ঐ বুড়োর যদি কিছু হয় তা'হলে আমার আর একটা মেয়েকে দেখার কেউ নেই। (গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে) আজ আমি মরে গেলে এই বুড়োটাকে এক গেলাস জল দেবার পর্যন্ত কেউ নেই। আমার দুঃখ হয়, খুবই দুঃখ হয় (আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে গামছায় মুখ ঢেকে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।)

দেবকী ঃ (একটা কিছু বলতে হয় বলে)—হ্যাঁ আমারও অনেক দুঃখকষ্ট আছে।

কর্তা ঃ (তেমনি ভাবে বসে আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)—আমাদের কর্তব্য আমাদের করতে হবে—কী বলো পানিক্কর?

পানিক্কর ঃ খুব দুঃখ পেয়ে মা এইরকম কথাগুলো বললেন। নইলে এমনিভাবে কথা বলার মানুষ এদের মা নন।

জামাই ঃ (নিজের দোষ স্খালন করার চেষ্টায় আর এমনিভাবে আমাকে ছোট করার চেষ্টা ক'রো না এইভাবে)—পানিকর দাদা, বলার আমারও অনেক কিছু আছে। উনি যে রকম করে বললেন সে রকমভাবে যদি আমি বলি তাহ'লে যারা শুনবে তারা মা-বাবাকেই দোষ দেবে।

কোচ্চুভেলু ঃ আপনার সে সব ভাবার দরকার নেই, যা বলতে চান বলে ফেলুন।

জামাই ঃ (সে যে একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছে তা সে নিজেই বুঝতে পারছিল। তাই রেগে আর সেই রাগটা সব বউয়ের উপর ঝেড়ে ফেলে)—কী, তোমার এবার তৃপ্তি হয়েছে তো? ভাই আর মাকে দিয়ে এমনিভাবে আমাকে অপমান করে খুশী হয়েছ তো? (রেগে স্ত্রীকে মারার জন্যে হাত তুলে বারান্দায় একলাফে উঠে) তোমার কাণ দুটো মলে দিতে হয়। সম্পত্তির

ভাগ নিতে আমি আসবো না, আসবো না, কতবার বললাম। তা না শুনে তুমি আমায় এখানে টেনে এনেছ। এবার তৃপ্তি হয়েছে তো? এবার আমি বোধহয় যেতে পারি। (মুখ ফিরিয়ে উঠোনে নামতে আরম্ভ করলো।)

কোচ্চু ভেলু ঃ (এসব চালাকি এখানে চলবে না এমনিভাবে পরিহাসের হাসি হেসে)—আপনি কার চোখে ধূলো দিচ্ছেন জামাইবাবু ?

জামাই ঃ (সেইভাবে রেগে কোচ্চু ভেলুর দিকে ফিরে)—তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'লো না। আমি তোমাকে কিছু বলিনি। (তারপর বারান্দার উত্তরে গিয়ে কারোর দিকে না তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল।)

কর্তা ঃ (কোচ্চু ভেলুকে) এই, তুই একটু চুপ করবি ?

দেবকী ঃ (দুঃখের সঙ্গে)—আমার কেউ নেই—সকলেই আমার বিরুদ্ধে। (কাঁদতে কাঁদতে) হে ভগবান! আমার আর আমার বাচ্চাদের এই অবস্থা হ'লো। (নাক ঝেড়ে কাঁদতে লাগলো।)

[একটুখানি সময় সকলে চুপ করে রইল]

পানিক্কর ঃ সকলে যে যার মনের কথা বলে ফেলুন। ভেতরে ঢেকে না রেখে সব খুলে-খেলে বলে ফেলাই ভালো। এখন কাজের কথা হোক।

কর্তা ঃ তার জন্যে আমাকে কী করতে হবে ?

পানিক্কর ঃ জামাইবাবু তখন কী বলতে চাইছিলেন ?

কর্তা ঃ ওর আরো একটা ভাগ চাই।

জামাই ঃ (কারোর দিকে না তাকিয়ে সেই একইভাবে বসে) আমার এক ছটাক জমিও চাই না। আপনার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীদের কিছু দেবার মন থাকলে দিন। আমাকে এ নিয়ে আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করবেন না। আমি কিছু বলবোও না।

পানিক্কর ঃ এখন আমরা সম্পত্তি পাঁচ ভাগে ভাগ করবো বলে ঠিক করেছি। মাইনরদের চার আর তাদের মায়ের এক। আপনি আরো একটা ভাগ চাই বলছেন।

জামাই ঃ (সেই একই ভাবে বসে) অমনিভাবে আর এক ভাগ সম্পত্তি দেবকীর চাই তাই বলবে নাকি ? ও কি পাগল ?

পানিক্কর ঃ (ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে) তাহলে কেমন ভাবে ভাগ হ'বে ?

[কিরিকাটের জামাই ইচ্ছে করেই এর উত্তর দিল না।]

পানিক্কর ঃ (কর্তার দিকে ফিরে) উনি কী বলতে চাইছেন ?

কর্তা ঃ দেবকীর এখন চার মাসের গর্ভ তাই বলতে চাইছে। (পানিক্কর 'ও !

এখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি' এমনিভাবে মাথা নেড়ে পানের বাটা খুলে পান সাজতে লাগলো।)

জামাই ঃ (কর্তার দিকে ফিরে) মামা* এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। বসে বসে শুনছি বলেই বলতে বাধ্য হচ্ছি। চারটে সন্তান হ'লে চারজনের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করতে হয়।

কর্তা ঃ কেন, আমি কার ওপর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি?

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে) আমাদের কিছু না দিয়ে পথে বসিয়ে সব বড় মেয়েকে দিতে যাচ্ছ!

জামাই ঃ (কোচ্চুভেলুর কথায় কাণ না দিয়ে) দেবকী এখন গর্ভবতী। একথা বলার মানে কী? আমি কি সম্পত্তির আর একটা শেয়ার পাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছি?

[দলিল-লেখকের সাহায্যকারী ছেলেটি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে]

কর্তা ঃ (একটু অপ্রস্তুত ভাবে) আমি সেরকম কিছু মনে করে বলিনি।

পানিক্কর ঃ (জামাইকে) হ্যাঁ, তাহ'লে এ ব্যাপারটার কেমনভাবে কী করতে হবে বলে দেবেন। সকলে যদি এইরকম জেদ করে বসে থাকেন তাহ'লে ফয়সালা হবে কেমন করে? (তামাক পাতা মুখে দিল।)

জামাই ঃ সেটা দেবকীকে জিজ্ঞেস করুন। (একটু পরে)—আমি বলি কি সন্দেহ করার কোনো দরকার নেই। পাঁচ ছ'মাস পরে সম্পত্তি ভাগ করলেই চলবে।

কোচ্চুভেলু ঃ তখন তাহ'লে আরো দুটো ভাগ নিতে পারবেন।

কর্তা ঃ (হঠাৎ রেগে ছেলের দিকে ফিরে)—ছিঃ ছিঃ, এইভাবে কথা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে না? তুই এসব কোত্থেকে শিখেছিস?

কোচ্চুভেলু ঃ আমার অভাব আছে। এই সাড়ে তেরো সেন্ট জমির ওপর নির্ভর করে আমি কেমন ভাবে চালাবো?

জামাই ঃ (একটা সুযোগ পেয়ে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার করে)—শুনুন পানিক্কর দাদা, ওর কথা শুনুন। নিজের বড়দিদির সম্পর্কে কেমন ভাবে কথা বলছে দেখুন। (গম্ভীর ভাবে) এদের আমি আর কী বলবো। ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা!

কর্তা ঃ (একটা কিছু ঠিক করেছে এমনিভাবে সোজা হ'য়ে বসে)—হ্যাঁ এখন সম্পত্তির ভাগে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। এগারো সেন্ট করে ভাগ কর

---

* কেরলে হিন্দুদের মধ্যে মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনের বিয়ে হয়। সেই হিসেবে বাড়ীর কর্তা জামাই-এর শ্বশুর এবং মামা। দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের 'বিয়ের ফাঁদ' নাটক।

পানিক্কর। ছয় ভাগ চতুর্থ ভাগীদারের নামে লেখো। (একটা কাজ এতক্ষণে ঠিক মত করতে পেরেছে এমনিভাবে)—পানের বাটাটা এদিকে এগিয়ে দাও তো।

[পানিক্কর পানের বাটাটা এগিয়ে দিল।]

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে) বাবা, তুমি অমনভাবে ঠিক করলে তো চলবে না।

কর্তা ঃ (কোচ্চুভেলুকে) তাই নাকি? বাজে বকিসনি, আমি যা বলছি তা তুই শুনবি।

কোচ্চুভেলু ঃ আমাকে কারোর কিছু বলতে হবে না।

কর্তা ঃ (শাসনের সুরে এবং অর্থপূর্ণভাবে) কোচ্চুভেলু!

কোচ্চুভেলু ঃ (জেদ ধরে) বাবা তুমি এ নিয়ে কিছু বোলো না। পৌনে চৌদ্দ সেন্ট থেকে অর্ধেক সেন্টও কমলে আমি সই দেব না।

কর্তা ঃ (ছেলের অবাধ্যতা দেখে মনে কষ্ট পেয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে)—বিষয় সম্পত্তির কথা উঠলে মা'ও নেই, বাবাও নেই। (পানিক্করের দিকে তাকিয়ে) পানিক্কর কপি কর। কুট্টন এলে পর সব ঠিক করবো। (পান চিবোতে লাগলো।)

কোচ্চুভেলু ঃ দাদা তো বলবেই। দাদার মত একটা চাকরী আমার থাকলে আমার আধসেন্ট জমিরও দরকার ছিল না।

দেবকী ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই সেই ছেলে বটে।

পানিক্কর ঃ (দলিল কপি করার ছেলেটাকে ঠ্যালা মেরে উঠিয়ে)—এই ওঠ্ ওঠ্—তুই যদি এমনিভাবে ঘুমোতে থাকিস তাহ'লে আমাদের কর্তব্য তুই বুঝে-সুজে লিখতে পারবি? (কর্তাকে) তাহ'লে আপনি যা বললেন সেই রকমই লিখি?

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে পেছন ফিরে)—ওটা শুধু মিছিমিছিই লেখা হবে।

কর্তা ঃ (সে কথায় কর্ণপাত না করে)—হ্যাঁ লেখ।

জামাই ঃ মিছিমিছি এরকম লিখে লাভটা কী?

কর্তা ঃ (পানিক্করকে) তুমি লেখো তো। কুট্টন এলে পর সব ঠিক করবো।

কোচ্চুভেলু ঃ যদি অমনি জেদ ধরে থাকে তাহ'লে ওকে সাড়ে তেরো সেন্ট জমি দিলেই হবে।

পানিক্কর ঃ (কপি করার ছেলেটাকে) কীরে তুই কতখানি অবধি লিখেছিস?

ছেলেটা ঃ (কাগজটা দেখে) লিখেছি……করেছি।

পানিক্কর ঃ ছ্যা, 'করেছি' এর মানেটা কী—অ্যাঁ?

ছেলেটা ঃ (দেখে দেখে পড়তে লাগলো) আমাদের প্রথম ছেলের নামে প্রথম

ভাগ, দ্বিতীয় ছেলের দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় মেয়ের তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ মেয়ে আর তার মাইনর ছেলেমেয়েদের নামে চতুর্থ ভাগ……এমনি ভাবে আমরা পাঁচটা ভাগ করেছি।

পানিক্কর ঃ ওঃ হ্যাঁ……করেছি। (একটু ভেবে) হ্যাঁ আর একটা জিনিস ঠিক করতে হবে। (কর্তার দিকে ফিরে) চতুর্থ মেয়ের নাম তার মাইনর সন্তানদের আর গর্ভস্থ শিশুকেও চতুর্থ ভাগীদার বলে ধরে নেওয়া হবে।

[ছেলেটা ঐ রকম ভাবে লিখলো। কর্তা ঠিক আছে বলে মাথা নাড়লো।]

জামাই ঃ (পানিক্করকে) পানিক্কর দাদা, মাইনরেরা শুধু একথা বললেই কী হয় না।

কর্তা ঃ (মুখ ভর্তি পান নিয়ে মুখ ওপর দিকে তুলে যাতে পানের পিক্ না পড়ে এমনি ভাবে) না, না, গর্ভের শিশুর কথা বিশেষ ভাবে বলতে হবে। (তারপর উঠোনে পানের পিক্ ফেলে যেন একটা যুদ্ধ জয় করেছে এমনি ভাবে বসে রইল।)

কোচ্চুভেলু ঃ (সেই একই ভাবে) এসব শুধু লিখেই রাখো।

দেবকী ঃ বাবা, ও যা বললো শুনতে পেলে না?

কর্তা ঃ (দেবকীকে) তুই চুপ করতো। (পানিক্করকে) চতুর্থ ভাগীদারের সকলের নাম লেখার সময় শিশুর নামটাও কি উল্লেখ করা চাই?

পানিক্কর ঃ হ্যাঁ চাই।

জামাই ঃ হ্যাঁ উল্লেখ করুন, আমার কোনো আপত্তিই নেই।

পানিক্কর ঃ (ছেলেটাকে) প্রথম পাতাটা নে। (ছেলেটা প্রথম পাতাটা খুঁজে বার করলো।)

পানিক্কর ঃ গৃহিণী আটাশ বছরের দেবকী আম্মা—(ছেলেটাকে) খুঁজে পেয়েছিস?

ছেলেটা ঃ (একটু খুঁজে) হ্যাঁ, পেয়েছি।

পানিক্কর ঃ আটাশ বছর বয়সের গৃহিণী দেবকী আম্মা তার নিজের অধিকারে এবং তার মাইনরদের এবং এদের ভাগনে ভাগনিদের (মনে না থাকায় কাগজটা দেখে পড়তে পড়তে) পাঁচ বছৰের রাধা, চার বছরের নলিনাক্ষী, দুবছরের পদ্মিনী, এক বছর ভর্তি না হওয়া সোমন, মায়ের গর্ভস্থ শিশুর (সেই দিকটায় আঙুল দেখিয়ে কেরানী ছেলেটাকে) এই যে এখানে (বসে থাকা কর্তাকে) গর্ভস্থ শিশুর জন্যে বিশেষ করে লেখা পার্টিশানের দলিল।

কর্তা ঃ (ঠিক ঠিক বলার ভঙ্গীতে) হ্যাঁ দলিল……

পানিক্কর : (কেরানী ছেলেটাকে) যতখানি লিখেছিস তারপর থেকে লিখতে আরম্ভ কর।

[ছেলেটা লেখার জন্যে তৈরী হয়ে বসল]

পানিক্কর : (লেখার জন্যে বলতে লাগলো) ওপরে যেরকম ভাবে লেখা হয়েছে······সেইরকম······

ছেলেটা : (অতখানি লিখে) হ্যাঁ সেইরকম ?

পানিক্কর : আমরা······

ছেলেটা : আমরা—

জামাই : (পানিক্করের কাছে গিয়ে) দাঁড়ান, দাঁড়ান পানিক্কর দাদা। (কর্তাকে) বাড়ীর ব্যাপারটা কী করবেন ?

কর্তা : বাড়ীটা লক্ষ্মীকুট্টি পাবে। ও নিয়ে কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমাদের মৃত্যু না হওয়া অবধি আমার আর ওদের মায়ের এখানে বাস করার অধিকার থাকবে।

জামাই : এটা কীরকম বিচার হলো ? আজ অবধি সব পরিবারেই সম্পত্তি ভাগের সময় বাড়ীর বড় মেয়েই বাড়ীর ভাগ পায়।* বেশ তো পানিক্কর দাদাই বলুক্ না কেন।

[পানিক্কর কিছু না বলতে পেরে সংকুচিত হ'য়ে বসে রইল।]

কর্তা : (জেদের সঙ্গে) এ নিয়ে তোমার কিছু বলার দরকার নেই! বাড়ী আমি লক্ষ্মীকুট্টিকেই দেব।

দেবকী : আমি তাহ'লে অন্য লোকের বাড়ী গিয়ে থাকি। মামা-মামী ননদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকি এইটাই বুঝি তুমি চাও বাবা ?

কর্তা : (রেগে) দেবকী তুই বড্ড বেশী সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস !

দেবকী : ঠিক আছে। আমার তাহ'লে একটা থাকার জায়গা করে দাও।

কর্তা : তোর সম্পত্তি দিয়ে তুই বাড়ী কর।

জামাই : তার জন্যে অন্যের সুপারিশের দরকার নেই।

কোচ্চু্ভেলু : (দিদি আর জামাইবাবুকে উদ্দেশ্য করে) এই সম্পত্তির সবটা পাবার মোহ রয়েছে ওদের।

জামাই : দেবকীর জন্যে কারোর কিছু করতে হবে না। শুধু একটা কাজ করুন। বাড়ীর দাম ঠিক করুন। যে পারবে সে কিনে নেবে।

কর্তা : (দৃঢ়স্বরে)—বাড়ীর দামও দেব না, বাড়ীও দেব না।

---

* নায়ার পরিবারের বাড়ীর বড় মেয়ে বাড়ীর ভাগ পায়।

কোচ্চুভেলু ঃ বাড়ী অথবা তার বদলে কিছু আমার পাওয়া দরকার।

কর্তা ঃ (ব্যথা পেয়ে)—কারোর দেখছি কারোর ওপরই স্নেহ-ভালবাসা নেই। এরা সব এই রকম হয়ে গেছে—হে ভগবান!

[কিরিকাটের জামাই এর মধ্যে উঠে স্ত্রীর কাণে কাণে কী যেন ফুসফুস করতে লাগলো।]

কোচ্চুভেলু ঃ আমি তাহ'লে কোথায় থাকবো?

কর্তা ঃ তুই একটা পুরুষ মানুষ না?

কোচ্চুভেলু ঃ তাই বলে কি রাস্তায় দাঁড়াবো নাকি?

কর্তা ঃ একটা মেয়ের রাস্তায় দাঁড়ানোর চেয়ে সেটা অনেক ভাল।

কোচ্চুভেলু ঃ জামাইবাবু দিদির কাণে কাণে একটার পর একটা কী বলে চলেছে দেখ।

জামাই ঃ (মুখ ফিরে কোচ্চুভেলুর কথাগুলো তার একটুও পছন্দ না হবার ভাবে)—কোচ্চুভেলু, তুই আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে আসিসনি।

কোচ্চুভেলু ঃ (রেগে) আপনি দিদিকে একটার পর একটা কী বলতে বলছেন?

দেবকী ঃ সে আমাদের ব্যাপার।

কোচ্চুভেলু ঃ (কথার উত্তরে কথা বলে)—এটা আমাদেরও ব্যাপার।

জামাই ঃ অসভ্যের মত কথাবার্তা বলতে শিখেছ শুধু।

কোচ্চুভেলু ঃ (সেই একইভাবে রেগে)—আপনি ওরকমভাবে যা-তা কথা আমাকে বলবেন না।

কর্তা ঃ (শাসনের সুরে)—এই কোচ্চুভেলু!

দেবকী ঃ (রেগে কোচ্চুভেলুকে)—এই কোচ্চুভেলু, তুই ওঁর ওপর এমনি ভাবে কথা বলছিস।

কোচ্চুভেলু ঃ (আরোও রেগে দিদিকে)—তুমি বেশী কথা না বলে চুপ করে থাকো—হ্যাঁ......

জামাই ঃ (রেগে কাছে এগিয়ে এসে)—এই, আমি আমার বউয়ের বাড়ীতে বাস করি না, আমাকে বেশী রাগাস না।

পানিক্কর ঃ আপনারা এরকম ভাবে ঝগড়া করবেন না।

কোচ্চুভেলু ঃ (সামনে এগিয়ে)—রাগালে কী করবে তুমি?

কর্তা ঃ (চেঁচিয়ে শাসনের সুরে)—এই কোচ্চুভেলু!

জামাই ঃ (আরো রেগে এগিয়ে এসে) তুই কাকে এত ভয় দেখাচ্ছিস?

কোচ্চুভেলু : (সেই একইভাবে সামনে এগিয়ে গিয়ে)—তোমাকে।

[কর্তা এরমধ্যে ছেলেকে 'এই হতভাগা' বলে ধানের সিন্দুক থেকে নামল।]

জামাই : (কোচ্চুভেলুর খুব কাছে গিয়ে) আমাকে দেখাতে হবে না, তোর বাবাকে দেখা।

[বলা শেষ হবার আগেই কোচ্চুভেলু জামাইকে এক থাপ্পড় মারলো। জামাই কোচ্চুভেলুকে এক ঘা দিল। সেটা ওর গায়ে লাগলো না। দুজন দুজনকে মারতে চেষ্টা করছে, তারমধ্যে কর্তা এসে পড়লো। দুজনের দু-ঘা কর্তার ওপর পড়লো। কালির বোতল উল্টে পড়ে পানিক্করের ধুতির পেছনে পাঁপড়ের আকারে কালি লেগে গেল। পানিক্কর বোতল আর কাগজ সরিয়ে রেখে একটু দূর থেকে—'থামো থামো, এসব কী হচ্ছে' বলতে লাগলো আর থেকে থেকে ধুতির কালিপড়া জায়গাটা ধরে দেখতে লাগলো। দেবকী—'ও মাগো আমার বাচ্চাদের বাবাকে মেরে ফেললো' বলে চীৎকার করে তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে কোচ্চুভেলুকে আঁচড়াতে খিমচোতে লাগলো। ওর কাঁধে ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চাটা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলো। বাড়ীর গিন্নী দেবকীর মা 'হে ভগবান তুমি আমাদের এত দেখালে' বলে দৌড়ে এসে নিজকে নিজে মারতে মারতে চীৎকার করতে লাগলো। লক্ষ্মীকুট্টি ভয় আর খুব দুঃখ পেয়ে বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দলিল লেখার ছেলেটা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে শুধু মারধোর আর চীৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কর্তার বড় ছেলে কুট্টন চীৎকার করে ছুটে এল। হাতে রাখা টিফিন ক্যারিয়ারটা নীচে নামিয়ে রেখে—'কী, কী হয়েছে, ব্যাপারটা কী' বলতে বলতে জামাইবাবু আর কোচ্চুভেলুকে টেনে আলাদা করার চেষ্টা করতে লাগলো। ওদের আলাদা করতে এবার পানিক্করও এগিয়ে এল। তখনো পানিকর ওর ধুতির কালিলাগা জায়গাটা পাকিয়ে বাঁ হাতে ধরে আছে। কুট্টন সামনে এগিয়ে এসে শাসনের সুরে কোচ্চুভেলুকে 'এই সরে দাঁড়া' বলতে কোচ্চুভেলু সরে দাঁড়ালো। তার ধুতিটা খুলে পড়েছিল। সেটা বেঁধে সরে দাঁড়ালো। জামাইও সরে দাঁড়ালো। কুট্টনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দেবকী সরে দাঁড়িয়ে বুকে করাঘাত করে কাঁদতে লাগলো।]

কুট্টন : (ক্ষোভ আর উৎকণ্ঠায়)—কী, কী হয়েছে? কী ব্যাপার?

দেবকী : (কাঁদতে কাঁদতে) সকলে মিলে ওনাকে খুন করতে গিয়েছিল।

মা : (খুব দুঃখের সঙ্গে) পাড়া-প্রতিবেশী এসব দেখে হাসবে। (দেবকীর কোলে শুয়ে থাকা বাচ্চাটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল।)

দেবকী : (কাঁদতে কাঁদতে) থাক্ থাক্ দরকার নেই। ও আমার কাঁধে শুয়েই কাঁদুক।

কুট্টন : (আদেশের সুরে) বাচ্চাটাকে মায়ের কাছে দে।

মা : (বাচ্চাটাকে দেবকীর কাঁধ থেকে নিয়ে) হে ভগবান, এসব কী আমায় দেখতে হচ্ছে!

[কর্তা এর মধ্যে এক হাত দিয়ে খুলে পড়া ধুতিটা ধরে অন্য হাতটা দিয়ে বুকটা চেপে দাঁত কামড়ে ব্যথাটা চেপে রাখার চেষ্টা করে আস্তে আস্তে সিন্দুকটার দিকে এগোতে লাগলো।]

কুট্টন : (বাবার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে) বাবা, বাবা, কী হয়েছে? (গিয়ে বাবাকে ধরে ফেলল।)

কর্তা : (ব্যথা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে) কিছু হয়নি, কিছু না।

মা : (উৎকণ্ঠা ভরে) কী হয়েছে খোকা? কী হয়েছে তোর বাবার? (কাছে এল।)

কুট্টন : কী হয়েছে বাবা?

কর্তা : কিছু না......কিছু না। হাতে না মাথায় কোথায় যেন লেগেছে।

কুট্টন : বাবা তুমি এখানে বোসো তো। (বাবাকে বসিয়ে বুকে পিঠে হাত বোলাতে লাগলো।)

[আর সকলে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো]

মা : (খুব কষ্ট পেয়ে) উনি কত কষ্ট করে, কত পরিশ্রম করে, ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন। এখন সম্পত্তি ভাগ করার সময় তিনি তাঁর উপযুক্ত প্রাপ্য পেলেন। (কান্না রোধ করতে বাচ্চাটাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।)

[ঝগড়ার সময় কিরিকাটের জামাইর সার্ট সুপুরির পাতার মত ছিঁড়ে গেছে। কোচ্চ্‌ভেলুর মুখে এখানে ওখানে নখ দিয়ে আঁচড়ানোর জায়গা থেকে অল্প অল্প রক্ত বেরোচ্ছে। দেবকীর নকল চুল খুলে গিয়ে দলিল কপি করার একটা কাগজের ওপর পড়ে রয়েছে। জামাই তার আগের জায়গায় গিয়ে বসলো। থেকে থেকে সে ছেঁড়া সার্টের দিকে তাকাচ্ছে। কোচ্চ্‌ভেলু যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে আগের মত দূরে

[বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। পানিক্কর তার কালি লাগা কাপড়ের জায়গাটা সেই একই ভাবে বাঁ হাতে ধরে কী একটা জিনিসের এখানে ওখানে খোঁজ করছে।]

কুট্টন ঃ (বাবার বুকে হতে বুলিয়ে) পানিক্কর দাদা তুমি কী খুঁজছ ?

পানিক্কর ঃ (সেই একই ভাবে দেখতে দেখতে) না, না, কিছু না। (ডান হাতে হঠাৎ কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ পেয়েছি। চশমার একটা কাঁচ খুলে গেছে। (তারপর ধুতিটার দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে) ইস্ ধুতিটায় এতটা কালি লেগে গেছে ! ধুলে কালি উঠবে বলে মনে হয় না। (এখনো ভয়ে-ভরে দাঁড়িয়ে থাকা দলিল লেখার ছেলেটাকে দেখে কাপড়ে কালি পড়ার রাগ তার ওপর ঝেড়ে) এই, এখানে আয় এদিকে। মারতে হয় এক ঘা তোর মাথায় ! (রেগে হাতে পাকিয়ে রাখা কালির জায়গাটা ধরে বাইরে বেরোলো।)

[পানিক্করকে এমনি ভাবে কাপড় ধরে বাইরে যেতে দেখে এতক্ষণ উৎকণ্ঠা ভরে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীকুট্টির হাসি পেয়ে গেল। দলিল লেখার ছেলেটা সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।]

কুট্টন ঃ (তার বোনের বর থেকে থেকে ছেঁড়া সার্টটার দিকে দেখছে দেখে নিজের সার্ট খুলে তার সামনে রেখে) ঐ ছেঁড়া সার্টটা খুলে এইটা পরো।

[জামাই সার্টটা নিয়ে আগের মত মাথা নীচু করে বসে রইলো।]

কুট্টন ঃ (আবার বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে) এখন কেমন লাগছে বাবা ?

কর্তা ঃ বেশী লাগেনি খোকা উঃ—

[পানিক্কর আর একটা ধুতি পরে অন্য ধুতিটা পাকিয়ে হাতে নিয়ে ফিরে এল।]

পানিক্কর ঃ (রাগত ভাবে ছেলেটাকে) এই কালিটা ধুয়ে ফেলে কাপড়টা রোদে শুকোতে দে। কালি উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

[ছেলেটা ধুতিটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'লো]

কুট্টন ঃ কালি উঠে যাবে পানিক্কর দাদা।

পানিক্কর ঃ (একই রাগত ভাবে) হ্যাঁ......উঠেছে আর ! (ধুতি নিয়ে যাওয়া ছেলেটিকে লক্ষ্য করে) এই, যদি খোল থাকে তাহ'লে একটু চেয়ে নিয়ে কালি পড়ার জায়গাটা রগড়ে দেখ।

কুট্টন ঃ (পানিক্করকে) কী হয়েছে সব ব্যাপারটা বলুন তো পানিক্কর দাদা।

[পানিক্করের বিরক্তি তখনো যায়নি]

কুট্টন ঃ (আবার) হ্যাঁ ব্যাপারটা কী পানিক্কর দাদা ?

পানিক্কর ঃ (ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে) ওঃ কিরিকাটের জামাই আর কোচ্চ্বেলু এই দু একটা কথা কাটাকাটি করেছে। (চশমাটা শক্ত করে পরলো।)

কুট্টন ঃ (কোচ্চুবেলুকে) সম্পত্তির ব্যাপার উঠলে পর তুই যেন মানুষটাকে মানুষ বলে জ্ঞান করিস না কোচ্চুভেলু।

কোচ্চুভেলু ঃ (দাদার দিকে তাকিয়ে রাগত ভাবে) তুমি তো তাই বলবে। তোমার চাকরী আছে। আমাকে একটা চাকরী খুঁজে দিতে আজ কতদিন ধরে তোমায় বলছি।

কুট্টন ঃ তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমি ইচ্ছে করেই তোর জন্যে কাজের চেষ্টা করিনি।

কোচ্চুভেলু ঃ কারো ইচ্ছে অনিচ্ছে নয়—আমার নিজের ব্যাপার আমি না দেখলে হবে না।

কর্তা ঃ (কুট্টনকে) আমি বলেছিলাম সম্পত্তির দশটা ভাগ হোক। দেবকীকে ছটা ভাগ দেওয়া হোক্। বাড়ীটা লক্ষ্মী কুট্টিকে। তা জামাই-এর সেটা পছন্দ হয়নি।

[পাণিক্কর কাগজের ওপর পড়ে থাকা দেবকীর নকল চুলটা দেবকীর হাতে দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে তা চুলের মধ্যে গুঁজলো।]

জামাই ঃ হ্যাঁ, এতখানি যখন গড়ালো তখন সব কিছু নিষ্পত্তি হবার পর দলিল লিখলেই হবে। দাদাও এসে গেছে। (স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে)—তোমার যদি কিছু বলার থাকে তো বলে ফেল।

কুট্টন ঃ তোমরা সকলে মিলে আমাকে এর মধ্যে ঠেলে না দিলেই ভালো হয়। কাজ থেকে ফিরে এসে তোমরা যে রকম বলবে সেই রকম সই করে দেব। আমার এক সেন্ট জমি না পেলেও দুঃখ নেই। তবে হ্যাঁ……বাবা আছেন।

[মা একটা বাটিতে খানিকটা তেল নিয়ে ঢুকে কর্তার কাছে গিয়ে 'কোথায় লেগেছে' বলে জিজ্ঞেস করে সেখানে তেল মাখিয়ে ঘসতে লাগলো। কুট্টন আর একদিকে সরে দাঁড়ালো।]

কর্তা ঃ (কুট্টনের কথার উত্তরে) আমি পারব না। তুই এই পরিবারের বড় ছেলে—তুইই ভাগ কর।

জামাই ঃ (স্ত্রীকে সম্বোধন করে) তোমার কি কিছু বলার আছে?

দেবকী ঃ মা আর বাবার সম্পত্তির আগে ভাগ হোক।

কর্তা ঃ তাহ'লে আমাদের কী করে চলবে?

জামাই ঃ মৃত্যুর পর বলে লেখা থাকবে।

কর্তা ঃ তা সম্ভব নয়।

মা ঃ আমাদের চোখ না বোজা অবধি তোমরা একটু ধৈর্য ধরে থাকো। তার আর বেশী দেরী নেই।

কর্তা ঃ অন্য কাউকে দেবার মতো আমাদের আর কেউ নেই। আমাদের যা কিছু তোমরাই পাবে।

দেবকী ঃ তাহ'লেও সেটা ভাগ করে রাখাই ভালো।

কুট্টন ঃ (দেবকীকে) কেন তুই তার জন্যে জেদ করছিস?

দেবকী ঃ দাদা, তুমি এই মায়ের আর বাবার মনে কী আছে জানো না।

কর্তা ঃ (কষ্ট পেয়ে) হ্যাঁ, ভীষণ পাজি তোর এই মা আর বাবা!

মা ঃ (তেল মালিশ করা বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খুব স্পষ্টভাবে) তোর মা বাবার মনে কী আছে তা আমিই বলছি। হ্যাঁ বলছি। আমাদের বুড়ো বয়সে যারা আমাদের খোঁজ খবর নেবে তাদের দেব।

দেবকী ঃ (একটা সত্যি কথা প্রকাশ পেয়েছে এমনিভাবে)—দেখো, দেখো!

কর্তা ঃ (রেগে) দেখার কিছু নেই। তোর গুণ তো সব এখনি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের হাতে যদি কিছু না থাকে তাহ'লে মা-বাবাকে একমুঠো ভাত খেতে দেবে না এমন সব ছেলেমেয়ে তোমরা।

কোচ্চুভেলু ঃ কেন মৃত্যুর পর ভাগ করলে ক্ষতিটা কী?

কর্তা ঃ (রেগে কোচ্চুভেলুকে) আমার ইচ্ছে নেই তাই।

কোচ্চুভেলু ঃ তাহ'লে দিদি যা বলছে তা ঠিকই। তোমাদের দুজনের পছন্দমত কাউকে দেবে।

দেবকী ঃ হ্যাঁ তাইরে খোকা।

কুট্টন ঃ সম্পত্তি ভাগ হ'লেও কোচ্চুভেলু, আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হবে না।

কোচ্চুভেলু ঃ তোমাব মত দর্শন আমিও আওড়াতে পারি।

দেবকী ঃ আমি বলছি কোচ্চুভেলু—এসব লক্ষ্মীকুট্টিকে দেবার মতলব।

মা ঃ ওকি এখানে বানের জলে ভেসে এসেছে নাকি?

দেবকী ঃ আমরাই বোধহয় এসেছি।

কর্তা ঃ (কষ্ট পেয়ে) নারায়ণ—নারায়ণ—উঃ কী সাংঘাতিক বাড়ী এটা !

পানিক্কর ঃ সব বাড়ীতেই এই রকম হয়। (বাইরে তাকিয়ে চীৎকার করে) কালিটা উঠলো ?

ছেলেটা ঃ উঠছে না।

পানিক্কর ঃ (হতাশ হয়ে) উঠছে না ? (জোরে চেঁচিয়ে) এই হতভাগা একটু খোল দিয়ে রগড়ে দেখ্ না।

কুট্টন ঃ বাবা, তুমি একটা কাজ কর। ওরা যেমন বলছে তেমনি ভাবেই ভাগ কর। আমার হাতে-পায়ে জোর থাকলে আমি তোমাদের উপোস করিয়ে রাখবো না।

কর্তা ঃ (জেদ ধরে) অমন কথা বলিস না বাবা। মৃত্যু অবধি আমার সম্পত্তি আমি ভাগ করবো না।

কোচ্চুভেলু ঃ বুড়ো হয়েও সম্পত্তির ওপর বাবার লোভ এতটুকু কমেনি।

কুট্টন ঃ (শাসনের সুরে)—এই কোচ্চুভেলু !

দেবকী ঃ (কচ্চুভেলুর কথায় সায় দিয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। এক পা শ্মশানে এগিয়ে দিয়েও সম্পত্তির ওপর লোভ ! আবার অন্যদের দোষ দেওয়া হচ্ছে।

[মেয়ের কথা শুনে কর্তার রাগ দুঃখ বাড়তে লাগলো।]

জামাই ঃ মামা, এখন আর কতদিনের জন্যে ?

[হঠাৎ দুঃখ আর রাগ বেড়ে যাওয়ায় কর্তা স্ত্রীর হাত সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আর আমার বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই ! আমার সন্তানেরা আমাকে চায় না, তারা চায় আমার সম্পত্তি। এখুনি তারা তাহ'লে তা ভাগ করে নিক।'—এই বলে চীৎকার করে কাছে পড়ে থাকা ছুরিটা নিয়ে হাতে কোপ মারতে লাগলো। 'বাবা, বাবা' বলে কুট্টন চীৎকার করতে লাগলো। 'ওগো ওগো' বলে স্ত্রী এসে স্বামীর হাত চেপে ধরলো। 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে। তোমাদের আমাকে দরকার নেই। তোমাদের সম্পত্তি পেলেই হলো। এখন আমার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই।' বলে কর্তা চীৎকার করে ছুরিটা চেপে ধরে রাখলো।

এরমধ্যে মায়ের হাত কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। পানিক্কর সকলকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। লক্ষ্মীকুট্টি দেবকীর বাচ্চাটাকে কাঁধে ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। কোচ্চুভেলু এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে গেল। জামাই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। দেবকী ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। মা ক্ষতস্থান চেপে কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে 'নারায়ণ নারায়ণ' বলতে লাগলো।]

রাতের গাড়ী

কে. টি. মুহম্মদ

চরিত্র

প্রভাকরণ—একটি যুবক। ভালো চাকরী করে।

দাক্ষায়ণী—প্রভাকরণের মা। পরিবারের সুনাম রক্ষা করতে সব কিছু করতে রাজী এমনি একটি মহিলা।

কুঞ্জি রামন—প্রভাকরণের মামা। 55 বছর বয়স। অন্য শহরে বড় একটা চাকরী করেন। কাঁধে একটা দামী চাদর ঝোলানো।

চামু নায়ার—প্রভাকরণের বাবা। পা দুটো বেশী শক্ত নয়। হাঁটতে লাঠির সাহায্য লাগে। জীবনকে খুব হাল্কা চোখে দেখেন, তবে তিনি মানুষের মূল্যের মর্যাদা দেন।

শান্তা—পরিচারিকা। ওর অন্য কোনো ঠিকানা নেই। বাড়ীর ঝি হলেও সে সুন্দরী। তার সাহস আর সদ্‌স্বভাবের জন্যে সে চামু নায়ারের কাছে উৎসাহ পায়।

কে. টি. মুহম্মদ বিশেষ শিক্ষিত নন। বড় ঘরে তিনি জন্মাননি, কিন্তু তিনি একজন জন্ম-প্রতিভাশালী নাট্যকার। তাঁর 'চোখগুলি' নামে ছোট গল্পটি 1954 সালে সর্বভারতীয় পুরস্কার পায়। তাঁর জন্ম 1927 সালে। 'জন্ম', 'দুধ দেওয়া গরু', 'আলো', 'কোথায় আলো' ইত্যাদি 12টি নাটক এবং একাঙ্ক নাটক তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প ও উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। তাদের সংখ্যা পাঁচ। 'রাতের গাড়ী' এই নামের একাঙ্কসংগ্রহ থেকে এই একাঙ্কটি নেওয়া হয়েছে।

রাতের গাড়ী

অবিবাহিতা মেয়েদের, এবং এই গর্ভের জন্য দায়ী হ'লেও সেই দায়িত্বকে অস্বীকার করা যুবকদের, ঐ গর্ভ নষ্ট করে নিজেদের কলঙ্ক থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যেসব পরিবার তাদের দিকে—

দৌড়ে আসছে—
রাতের গাড়ী।

[দৃশ্য : বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো একটা ঘর। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর সুন্দর ছবি আর সচিত্র ক্যালেণ্ডার। ঘরের মাঝে পর্দা লাগানো একটা দরজা। একটা সোফা সেট। একটা সাটওয়ালা দুটো সোফা। সোফা দর্শকদের দিকে মুখ করা। মাঝে একটা টিপয়। তার ওপরে একটা ফুলদানী। দেয়ালে একটা ঘড়ি। সময় রাত 9-টা বেজে 15 মিনিট। স্টেজের ডানদিকের কোণে দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল। কাছেই একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা শেড্‌ওয়ালা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সিন উঠলে পর দেখা গেল টেবিলের ওপর মাথা রেখে প্রভাকরণ বসে আছে। সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তার ডান হাতটা টেবিল ল্যাম্পের সুইচের ওপর। সে এমনিই আলোটা নিভিয়ে দিল। এখন ভেতরের আলো দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে। প্রভাকরণ আবার সুইচ টিপে আলো জ্বালালো, আবার নিভোলো। এখন ঘর অন্ধকার। এই সময় দাক্ষায়ণী আম্মা দরজার কাছে এসে ঘর অন্ধকার দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।]

দাক্ষায়ণী : (ডাকলো)—প্রভাকরণ, প্রভাকরণ (প্রভাকরণ ডাক শুনতে পেলো না দেখে আর একটু জোরে) প্রভাকরণ।

[টেবিল ল্যাম্পটা আবার জ্বলে উঠলো। প্রভাকরণ ডাকে সাড়া দিল না। দরজার কাছে দেয়ালে আর একটা সুইচ রয়েছে। দাক্ষায়ণী সেটা টিপলো। ঘরের চারিদিক এখন আলোয় ভরে গেল। মা ছেলের কাছে এগিয়ে গেল—প্রভাকরণ, তুই এরকম ভাবে বসে আছিস যে? ওঠ্—যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কষ্ট পেয়ে লাভ কী? আমি আর তোর মামা অনেক ভেবে

চিন্তে একটা উপায় ঠিক করেছি। তুই আমাদের কথা শুনলেই হবে। (প্রভাকরণ মাথা তুললো) মামা এক্ষুনি চলে যাচ্ছে। সব ঠিকঠাক করেই যাচ্ছে। এই মাসের মধ্যেই বিয়েটা সারা হবে।]

প্রভাকরণ ঃ মা (উঠে সামনে এসে দাঁড়ালো।)

দাক্ষায়ণী ঃ (ছেলের কাছে এসে) কেন খোকা তুই এত ভাবছিস? তোর ওপর আমাদের কোনো রাগ নেই। তোকে ঘেন্না করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

[কুঞ্জি রামন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঢুকলো, কাঁধে একটা চাদর ঝোলানো।]

কুঞ্জি রামন ঃ প্রভাকরণ, আমি এই গাড়ীতে যাচ্ছি। আমাকে কাল সকালে অফিসে হাজিরা দিতে হবে। তোর মায়ের চিঠি পেয়েই একদিনের ছুটি নিয়ে দৌড়ে এসেছি।

দাক্ষায়ণী ঃ দক্ষিণের ট্রেন এখনো যায়নি। তার পনের মিনিট পরেই উত্তরের ট্রেন আসবে। গাড়ীগুলো এখান থেকেই বদল হয়।

কুঞ্জি রামন ঃ তাহলেও একটু আগে আগে ষ্টেশনে গেলেই ভাল।

দাক্ষায়ণী ঃ দাদা তুমি একটু প্রভাকরণকে বলো।

কুঞ্জি রামন ঃ ব্যাপারটা যে এতখানি গড়িয়েছে তা আমি বুঝতে পারিনি। তাহ'লেও এরকম ব্যাপার আমাদের গাঁয়ে গাঁয়েই হচ্ছে। দাক্ষায়ণী তুই তোর চাকরটাকে আমার ব্যাগটা নিয়ে ষ্টেশনে রওনা হতে বল্।

দাক্ষায়ণী ঃ (দরজার দিকে ফিরে ডাকতে লাগলো) রামু......রামু......

কুঞ্জি রামন ঃ (পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে)—সেকেণ্ড ক্লাশের একটা টিকিট কাটুক (দশ টাকার একটা নোট দিল। দাক্ষায়ণী আম্মা নোটটা হাতে নিয়ে যেতে যেতে—)

দাক্ষায়ণী ঃ রামুটা নিশ্চয়ই এখন কোথাও বসে ঢুলছে।

কুঞ্জি রামন ঃ (প্রভাকরণকে) আরে এতে কিছু এসে যায় না। এসব আগেই ভাবা উচিত ছিল। তবে তোর বয়স আর যৌবন তোকে ভুল পথে নিয়ে গেছে।

প্রভাকরণ ঃ মামা......

কুঞ্জি রামন ঃ বল্, কী বলতে চাচ্ছিস বল্।

[দুর্বল পায়ে লাঠিতে ভর দিয়ে প্রভাকরণের বাবা চামু নায়ার ঘরে ঢুকলো। কুঞ্জি রামন তাকিয়ে দেখলো।]

কুঞ্জি রামন : আমরা একটু এখন কথা বলছি। তুমি এখন এখানে না থাকলেই ভালো হয়।

চামু নায়ার : একটু কথা বললেই কি সবকিছু ঠিক হ'য়ে যাবে? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। (চলে গেল)

কুঞ্জি রামন : প্রভাকরণ, এই ব্যাপারে তুই হয়তো আমার কাছে অনেক কিছু খোলাখুলি বলতে পারবি না।

প্রভাকরণ : তা'হলে থাক।

কুঞ্জি রামন : (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে)—আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। যা বলার তা তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমি মেয়েটির কুষ্ঠি পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। ভালো করে দেখেছি—কুষ্ঠি খুবই ভালো। তারপর এখানে এইসব হওয়াতে আর দেরী না করে তোর বিয়ের ব্যাপারে আমরা সবকিছু ঠিক করে ফেলেছি। (একটু হেসে) উত্তরে যাবার এই গাড়ী করেই আমি আমাদের সম্মতির কথাই জানাতে যাচ্ছি।

প্রভাকরণ : মামা?

কুঞ্জি রামন : কী?

প্রভাকরণ : শান্তা অনাথা, অসহায়া একটা মেয়ে।

কুঞ্জি রামন : হ্যাঁ, তাকে আমাদের নিশ্চয় রক্ষা করতে হবে।

প্রভাকরণ : ওর জীবনের জন্যে কি আমি দায়ী নই?

কুঞ্জি রামন : যা বলতে চাইছিস সব খুলে বল।

প্রভাকরণ : কেমন করে যে বলি!

কুঞ্জি রামন : আমি আবার আসছে রবিবার এখানে আসছি। সেদিন সব কিছু ঠিক করবো।

দাক্ষায়ণী : (ঘরে ঢুকে) দাদা, রামু ষ্টেশনে চলে গেছে। তুমি আর দেরী কোরো না। রবিবার তো আসছ। প্রভাকরণের সঙ্গে আমি কথা বলছি।

কুঞ্জি রামন : প্রভাকরণকে আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে। কোনোরকম বোকামি করিসনি। এই পরিবার কার সৌভাগ্যের জন্যে কে জানে একটা সুনাম অর্জন করেছে। তুই যেন সেই পরিবারের মুখে কালি লেপিস না। (দাক্ষায়ণীকে) প্রভাকরণের বাবা কোথায়?

দাক্ষায়ণী : বারান্দায়।

কুঞ্জি রামন : (প্রভাকরণকে) আমি তাহ'লে আসি।

[কুঞ্জি রামন আর দাক্ষায়ণী চলে গেল। প্রভাকরণ ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিল। এখন শুধু টেবিলের আলোটা জ্বলছে। প্রভাকরণ

ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরছে। ভেতর থেকে খুব অস্পষ্টভাবে একটা ফোঁপানো কান্নার শব্দ কি শোনা যাচ্ছে? প্রভাকরণ হঠাৎ থেমে পড়ে সেই দিকে কাণ দিল। ওই কান্নার শব্দ তার চিন্তাকে তোলপাড় করতে লাগলো। আর সইতে না পেরে সে ডেকে উঠলো—'শান্তা'—সেই ফুঁপিয়ে কান্না থামছে না। প্রভাকরণের অসহ্য লাগছে। এই কান্নার কী সান্ত্বনা সে দেবে? শান্তার কাছে যাবার জন্যে তার পা দুটি কি এগোতে চাইছে? ও দরজার দিকে এগোলো কিন্তু আর বেশী এগোতে পারলো না। কিন্তু সেই ফোঁপানো কান্না যেন তাকে টানছে। সে দরজার কাছে আবার এগিয়ে গেল, দরজার কাছে এল, থেমে গেল আবার পেছন ফিরলো। ফিরে টেবিল থেকে সিগ্রেট নিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বাললো। ঘড়ির দিকে তাকালো। ঘড়ির পেণ্ডুলাম কি তার মনোযোগ আকর্ষণ করছে? ও সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিগ্রেটের ধোঁয়া ওপর দিকে উঠছে। তার মাকে দরজার কাছে দেখা গেল।]

দাক্ষায়ণী ঃ কীরে প্রভাকরণ, আলোর ওপর তোর যে এমন বিরক্তি? (আলো জ্বালালো, সারা ঘর আলোতে ভরে গেল।)

প্রভাকরণ ঃ (মাকে ভালো করে দেখে মুখ ফিরিয়ে) আমার নয় মা, তোমাদেরই আলোর ওপরে রাগ।

দাক্ষায়ণী ঃ আমরা তো আর আলো নিভিয়ে অন্ধকারে বসে নেই।

প্রভাকরণ ঃ তোমরা বুঝতে পারবে না মা। তোমরা তোমাদের মনের আলো নিভিয়ে বসে আছ।

দাক্ষায়ণী ঃ তোর সাহিত্য শোনার সময় আমার নেই।

প্রভাকরণ ঃ আমি জানি আমি ভুল করেছি। কিন্তু শান্তার জীবনটাকে নিয়ে তোমরা কী করতে চাইছ?

দাক্ষায়ণী ঃ তুই যে সাবধান হ'সনি তাতো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু শান্তা এ বাড়ীর ঝি, তার কি সাবধান হওয়া উচিত ছিল না?

প্রভাকরণ ঃ আমি কতবার তোমাদের বলেছি যে অপরাধ আমার। এটা যদি ভুলপথে নিয়ে যাওয়া হয়তো আমিই ওকে ভুলপথে নিয়ে গেছি। আর এটা যদি খুশীমত করা হয় তো আমিই আমার খুশীমত কাজ করেছি।

দাক্ষায়ণী ঃ তোর বাবা সব সময়েই বলে যে কম বয়সের মেয়েদের বাড়ীতে কাজ করার জন্যে না রাখতে। আমি তার কথায় কাণ দেইনি। আমি তোকে বিশ্বাস করেছিলাম।

প্রভাকরণ ঃ মা, তুমি যাই বলো না কেন আমি ওকে ভুলতে পারব না।

দাক্ষায়ণী ঃ ওকে ভুলতে তো কেউ বলেনি।

প্রভাকরণ ঃ ওকে পরিত্যাগ করাও সম্ভব নয়, মা।

দাক্ষায়ণী ঃ ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথাও কেউ বলছে না। ও এখানেই থাকুক।

প্রভাকরণ ঃ কীভাবে?

দাক্ষায়ণী ঃ আমি আর তোর মামা দুজনে মিলে একটা উপায় বার করেছি। ওকে এখান থেকে বের করে দিলে মুশকিল আছে। ও যদি আত্মহত্যা করে তাহ'লে তো আর দেখতে হবে না! তাই আর পাঁচজন লোক জানার আগে আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে।

[চামু নায়ার ঢুকলো]

চামু নায়ার ঃ কেমন করে ঠিক করবে দাক্ষায়ণা? ঐ মেয়েটাকে কষ্ট দিতে আমি দেব না।

দাক্ষায়ণী ঃ তোমাকে কি কেউ বলেছে যে ওকে কষ্ট দেব। ওকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে কারোরই নেই।

চামু নায়ার ঃ তাহ'লে ওকে খুশী করতে যাচ্ছ বুঝি?

দাক্ষায়ণী ঃ হ্যাঁ তাই-ই। এতে সন্দেহ করার কী আছে?

চামু নায়ার ঃ তাহ'লে তুমি প্রভাকরণের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করতে চাইছ?

[সোফায় বসলো]

দাক্ষায়ণী ঃ (এই ঠাট্টা পছন্দ না হওয়াতে ঝগড়ার সুরে)—তুমি যা' তা' না বলে একটু চুপ করে থাকতে পারো না—না? আমাদের এখন বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। এই লজ্জা থেকে কী করে পার পাব তার চেষ্টা করছি আর তুমি দাঁত বের করে হাসছ। তোমার লজ্জা করে না?

চামু নায়ার ঃ আমার লজ্জাটা কীসের? আমি ঐ মেয়েটার দোষ ধরি না। মেয়েটা ভালো। তোমার ছেলেই তাকে নষ্ট করেছে।

প্রভাকরণ ঃ আমি তা স্বীকার করছি বাবা।

চামু নায়ার ঃ হ্যাঁ, স্বীকার তো করতেই হবে।

দাক্ষায়ণী ঃ অনেক বাড়ীতেই এইরকম ঘটেছে, ঘটছেও।

চামু নায়ার ঃ হ্যাঁ তা'লে সেইভাবে এখানেও ঘটেছে তাই না? তাহ'লে তো সব ঠিকই আছে।

দাক্ষায়ণী ঃ তারা সব তোমার মত নিজের ছেলের সঙ্গে ঝি-এর বিয়ে দেওয়ার কথা বলে না।

চামু নায়ার ঃ তাহ'লে তুমি কী করতে বলছ ?
দাক্ষায়ণী ঃ কী করতে ? তারা বলবে মেয়েটা নষ্ট চরিত্রের। তারপর তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে। নইলে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করবে।
চামু নায়ার ঃ যদি তা সম্ভব না হয় ?
দাক্ষায়ণী ঃ তাহ'লে সে বাড়ীর কোনো চাকরের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে।
প্রভাকরণ ঃ (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) মা, তুমি কি এখানকার রামুর সঙ্গে শান্তার বিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছ নাকি ? এটাই বুঝি তোমার আর মামার মতলব ?
চামু নায়ার ঃ হ্যাঁ প্রভাকরণ, ওরা তাইই ঠিক করেছে।
দাক্ষায়ণী ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহ'লে তাই-ই। কেন তাতে অপরাধটা কী ?
প্রভাকরণ ঃ রামু এসব কিছু জানে না।
দাক্ষায়ণী ঃ কে জানে ? জানুক বা না জানুক আমরা বললে ও শুনবে।
প্রভাকরণ ঃ ও চাকর হ'লেও একটা পুরুষ মানুষ।
দাক্ষায়ণী ঃ এতদিন আমাদের নুন খাওয়ার কৃতজ্ঞতা ও দেখাবে না ?
চামু নায়ার ঃ দাক্ষায়ণী তুমি তাকে খেতে দাও বলে এরকম কাজ তাকে দিয়ে তুমি করাতে পারো না।
দাক্ষায়ণী ঃ তুমি এইরকমভাবে কথা বলছ যে ?
চামু নায়ার ঃ (হেসে) কী করে কথা বলতে হয় আমি জানি না বলে।

[উঠে পড়লো]

দাক্ষায়ণী ঃ তাহ'লে কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকো।
চামু নায়ার ঃ তার মধ্যে আমি নেই। আমি বাজে কথাটা বলেছি কী ? যাক্ মেয়েটাকে কষ্ট না দিয়ে একটা কিছু তোমরা ঠিক কর, তারপর আমার কাছে এস। আমি যা করার করবো। (চলে গেল)
দাক্ষায়ণী ঃ (কাউকেই উদ্দেশ্য না করে) আমি যেন আমার জন্যে এইসব করেছি এমন ভাবখানা। (প্রভাকরণকে)—কী, অমন করলে কেমন হয় ?
প্রভাকরণ ঃ শান্তা কি এতে রাজী হবে ?
দাক্ষায়ণী ঃ কেন রাজী হবে না ?
প্রভাকরণ ঃ আমার সেই রকম মনে হচ্ছে। ও আমাকে এতই ভালোবাসে।
দাক্ষায়ণী ঃ ভালোবাসে ? ভালোবাসে বলে তোকে স্বামী হিসেবে পেতে হবে নাকি ? সে বলেছে এই কথা ?
প্রভাকরণ ঃ না, বলেনি।
দাক্ষায়ণী ঃ তাহ'লে ?
প্রভাকরণ ঃ কী তাহ'লে ?

দাক্ষায়ণী ঃ তুই ওকে বিয়ে করতে চাস?

প্রভাকরণ ঃ মা......

দাক্ষায়ণী ঃ তাহ'লে কী ব্যাপার তাই বল্।

প্রভাকরণ ঃ ওকি আমাকে ভালোবাসতে পারে না?

দাক্ষায়ণী ঃ না।

প্রভাকরণ ঃ কেন?

দাক্ষায়ণী ঃ ও আমাদের বাড়ীর ঝি। ওর বংশমর্যাদা নেই।

প্রভাকরণ ঃ কিন্তু ও একটা মেয়ে। ও একটা ছেলেকে ভালোবেসেছে।

দাক্ষায়ণী ঃ তোকে ভালোবাসার অধিকার ওর নেই। ভালোবাসতে পারে না। ওরকম যদি ভালোবাসতেই হয় তাহ'লে রামুকেই তো ভালোবাসতে পারতো। যে জিনিস হাতের নাগালের বাইরে তাতে হাত বাড়িয়ে লাভ কী?

প্রভাকরণ ঃ মা তুমি বোকার মত কথা বলছ।

দাক্ষায়ণী ঃ এ বাড়ীর সুনাম রক্ষে করতে হলে এরকম বোকার মতই কথা বলতে হয়। আমার মাথা খারাপ করে দিও না প্রভাকরণ।

প্রভাকরণ ঃ আমাদের জীবন শুধু একবারই। আমাদের অসাবধানে সে জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে আমার জীবনে আমি কোনো দিনই শান্তি পাব না মা।

দাক্ষায়ণী ঃ আমি তোকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করছি। তুই উত্তর দে। ও তোকে ভালোবাসে—ভালোবাসবে। ব্যবসা করতে গেলে তার লাভ ও উঠোবে। কিন্তু আমার যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে তুই ওকে ভালোবাসিস কিনা।

[প্রভাকরণ কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল]

—কী ভালোবাসিস?

প্রভাকরণ ঃ মা, আমায় এই প্রশ্ন কোরো না।

দাক্ষায়ণী ঃ এর মানে আমি কি করবো?

প্রভাকরণ ঃ যা খুশী ভেবে নাও আমার আপত্তি নেই।

দাক্ষায়ণী ঃ তার মানে তুই ওকে ভালোবাসিস।

প্রভাকরণ ঃ আমি ওকে বিয়ে করবো বলে কি তোমায় বলেছি?

দাক্ষায়ণী ঃ না তা বলিসনি। কিন্তু তোর রকম-সকম দেখে সেইরকমই মনে হচ্ছে।

প্রভাকরণ ঃ ওরকম মনে হওয়ার দরকার নেই। আমি ওকে বিয়ে করবো না।

দাক্ষায়ণী ঃ (ছেলের এই উত্তরে খুশী হয়ে স্নেহের সুরে) হ্যাঁ, তোর তাইই করা উচিত। তুই যে এ ব্যাপারে জেদাজেদি করবি না তা আমি জানি।

প্রভাকরণ ঃ মা, তুমি যা জানতে চেয়েছিলে আমি তা বলেছি। আমি এখন একটু একা শান্তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে একটু এখানে পাঠিয়ে দাও।

দাক্ষায়ণী ঃ সাবধানে কথাবার্তা বলবি। ও তোকে এখন বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করবে।

প্রভাকরণ ঃ আর বাজে কথা না বলে ওকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[দাক্ষায়ণী চলে গেল। প্রভাকরণ খুব গম্ভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে। একটা ভয়াবহ সঙ্গীতের তরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ভেসে আসছে। একটু পরে কান্নায় ফোলা মুখ নিয়ে শান্তা ঘরে ঢুকলো। শান্তার বয়স 20। চুলগুলো এলোমেলো করে বাঁধা। নম্রভাবে আর সভয়ে ঘরে ঢুকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দাক্ষায়ণী দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। শান্তা আর প্রভাকরণ দু'জনেই কোনো কথা বলছে না। প্রভাকরণ শান্তার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। শান্তা তার উদ্গত কান্না রোধ করতে ঠোঁট কামড়ে ধরছে।]

প্রভাকরণ ঃ শান্তা !

[উত্তর নেই। প্রভাকরণ অস্বস্তির সঙ্গে ফিরে তাকালো]

আমি যা বলছি তা শোনো……আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছি, তারজন্যে আমার খুবই খারাপ লাগছে। তোমাকে বিয়ে করার দায়িত্ব আমি নিতে পারছি না কারণ আমাকে এখানে মাথা উঁচু করে চলতে হবে। আমার মা, বাবা, মামা এরা কেউই এতে রাজী হবে না। তুমি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যেও না……আমি তোমাকে রোজ দেখতে চাই। আমি তোমায় একটা কথা বলি, তোমাকে তা শুনতে হবে। শুনতে হবে শান্তা…… অন্য আর কোনও রাস্তা……তুমি আমার ওপর রাগ করো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। (শান্তার খুব কষ্ট হচ্ছে) কী, তুমি যে কিছু বলছ না ? ভেবে চিন্তে কাজ না করার ফলে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। (বলার জন্যে একটু সাহস সংগ্রহ করে) শান্তা, (একটু তাড়াতাড়ি) রামুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে।

[শান্তা আর শুনতে না পেরে ছুটে ভেতরে চলে গেল।]

—শান্তা !

[প্রভাকরণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। দাক্ষায়ণী আম্মা ছেলেকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।]

দাক্ষায়ণী ঃ মেয়েটা ভালো নয়। তুই ঐরকম ভালোভাবে বললি—ওর হাব-ভাবখানা দেখলি? (প্রভাকরণ চিন্তা থেকে জেগে উঠে আর একটা চিন্তায় মগ্ন হলো।)—প্রভাকরণ শোন্, আমার জীবন থাকতে ঐ মেয়েটার ইচ্ছে পূর্ণ হবে না। আর তুই যদি ওর মিথ্যে চোখের জল দেখে ওকে বিয়ে করতে এগিয়ে যাস তাহলে......তাহলে শুনে রাখ, প্রথমে আমার মৃতদেহ এখান থেকে সরাতে হবে।

প্রভাকরণ ঃ মা!

দাক্ষায়ণী ঃ আমরা ভালোভাবে ওকে বলে দেখলাম। তুই বলেই এই রকম ভালোভাবে ওর সঙ্গে কথা বললি। অন্য কেউ হ'লে ঐ রকম ভাবে ছুটে গেলে মারতো এক লাথি, পড়লে আর উঠতে হ'তো না।

[দূর থেকে একটা ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ট্রেনটা ছুটছে। চামু নায়ার ঢুকলো।]

চামু নায়ার ঃ কী, তোমাদের আর্জি পেশ করেছ?

দাক্ষায়ণী ঃ আহা হা, ঠিক সময়েই এসেছ দেখছি। হ্যাঁ আর্জি পেশ করেছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি।

চামু নায়ার ঃ কীরে প্রভাকরণ, তুই যে ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছিস। (পরিহাসের সুরে) এটা একটা বড় বংশ। তুই এর গায়ে কালি লাগাসনি যেন।

[গাড়ীর শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে]

দাক্ষায়ণী ঃ তুমি এমনি ভাবে আমাদের ঠাট্টা করছ। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এইসব ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই যেন।

চামু নায়ার ঃ হ্যাঁ—আমার এই ব্যাপারে কোনো সম্পর্ক নেই। (গাড়ীর শব্দ আরো বেশী করে শোনা যাচ্ছে। দাক্ষায়ণী আম্মা বাইরে তাকালো।)

দাক্ষায়ণী ঃ আজ গাড়ীটা যেন একটু দেরী করে এসেছে বলে মনে হচ্ছে প্রভাকরণ।

চামু নায়ার ঃ সব গাড়ীই এখন দেরী করে আসছে। ঠিকমত কোনো কিছুই এদেশে হচ্ছে না।

[দাক্ষায়ণী আম্মা হঠাৎ বাইরের দিকে ভালো করে দেখলো। তারপর ভয় আর সন্দেহের সঙ্গে চীৎকার করে ডাকলো]—প্রভাকরণ!

[প্রভাকরণ বাইরের দিকে তাকিয়ে চমকিয়ে উঠলো]

প্রভাকরণ ঃ ওঃ মেয়েটা আমাদের সর্বনাশ করবে। (লাফিয়ে দরজা পেরিয়ে বাহিরে দৌড়ে গেল, তার পেছনে দাক্ষায়ণী আম্মা।)

[চামু নায়ার চমকে গেলেও জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে রইল। গাড়ীর শব্দ খুবই বাড়ছে। জানালা দিয়ে গাড়ীর আলো ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রতিফলিত হ'তে লাগলো। চামু নায়ারের মুখেও এই আলো প্রতিফলিত হ'য়ে বাইরে যেসব ঘটনা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে লাগলো। ট্রেনের শব্দ ক্রমে কমতে লাগলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খুব চিন্তিত হ'য়ে চামু নায়ার ফিরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগলো। নিমেষের মধ্যে শান্তার হাত ধরে টেনে প্রভাকরণ ঘরে ঢুকলো, পেছনে দাক্ষায়ণী আম্মা। তার মুখ রাগে জ্বলছে। প্রভাকরণের মুখ অপরাধীর মত হ'লেও তা রাগে ভরা। শান্তাকে ঘরের ভেতর এনে ফেলে দিয়ে প্রভাকরণ তাকে ভালো ভাবে দেখতে লাগলো। শান্তা কাঁদছে না। ও যা করতে চেয়েছিল তা করতে পারলো না এমনই তার মুখের ভাব।]

দাক্ষায়ণী ঃ (ভীষণ রেগে) এই, তুই গাড়ীর তলায় মাথা রাখতে গিয়েছিলি না?

চামু নায়ার ঃ না, না, ও গাড়ী চড়তে গিয়েছিল। কেন তোমরা ওকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছ? ও যেখানে খুশী যাক্, তোমাদের কি?

দাক্ষায়ণী ঃ এই পরিবারের মুখে কালি লেপতে ওকে আমি দেব না। (একটু শান্ত ভাবে) এই, আমার ছেলে তোকে ভালোবাসে নাকি? তোকে ও কত ভালোভাবে বললো—তা সত্তেও তুই ওর সম্মান নষ্ট করতে এতটুকু দ্বিধে করলি না? এমনি ভাবে ছুটে বেরিয়ে গেলি! বেইমান কুত্তী!

চামু নায়ার ঃ আগে তোমার ছেলেকে বেইমান কুত্তা বলে তবে ওকে কুত্তী বলো।

দাক্ষায়ণী ঃ তোমার মাথা খারাপ। তোমার চুপচাপ থাকাই ভালো—ওঃ ভগবান! ঠিক সময়ে আমি দেখতে পেলাম—নইলে কি ভবিষ্যতে আমাদের এখানে বাস করতে হতো! আমাদের সবকিছু নষ্ট হয়ে যেত।

প্রভাকরণ ঃ (খুব রেগে শান্তার কাছে গিয়ে তার মুখে প্রচণ্ড একটা চড় মারলো) এই, তুই মরতে গিয়েছিলি? ভালোভাবে বললে তুমি কথা শুনতে চাও না, না?

চামু নায়ার ঃ প্রভাকরণ, তুই ওকে এবার নাহয় বাঁচিয়ে এনেছিস কিন্তু আর কোনো গাড়ী কি এই লাইনে চলবে না?

[প্রভাকরণ বাবার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।]

দাক্ষায়ণী ঃ আমি ওকে এখানে বেঁধে রাখবো। যত খুশী গাড়ী যাক্। আমার ছেলের সুনাম আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমি ওকে মরতে দেব না।

চামু নায়ার ঃ তাহ'লে ওকে বাঁচতে দাও দাক্ষায়ণী।

দাক্ষায়ণী ঃ এর উত্তর তোমাকে আমি কী দেব? আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। এ সমস্ত গোলমালের সৃষ্টি তুমিই করেছ।

চামু নায়ার ঃ (চামু নায়ার মৃদু হাসলো) সব গোলমালের সৃষ্টি আমিই করেছি। তাহ'লে দাক্ষায়ণী সব দোষ আমার। তাহ'লে মিছিমিছি আর প্রভাকরণের নামে দোষ দিয়ে লাভ কী?

দাক্ষায়ণী ঃ হ্যাঁ, শুধু তোমাকে দূষলেই হবে। তুমিই ঐ মেয়েটাকে এই সবে উৎসাহ জুগিয়েছ। বাড়ীর কাজ করার লোকদের সব সময় একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রাখতে হয়, তাদের মাথায় তুলে নাচাতে নেই।

চামু নায়ার ঃ আমি এসব করেছি না তোমার ছেলে করেছে?

দাক্ষায়ণী ঃ (শান্ত স্বরে শান্তাকে) এখন কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটে গেছে যে তাই নিয়ে ভেবেও লাভ নেই। প্রভাকরণের খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু ও তোকে কী করে বিয়ে করবে? ওর মত অবস্থার ছেলেকে কি এটা মানাবে? ও ভালোভাবে ভালো নাম নিয়ে বেঁচে থাকুক এটা কি তুই চাস না? তুই যদি চাস তাহ'লে প্রভাকরণের পক্ষে এটা সম্ভব হবে। রামু ভালো লোক। তোরা দুজনেই এখানে থাক। আমাদেরও তোর কাছে ঋণ আছে। তোর পেটে প্রভাকরের রক্ত।

চামু নায়ার ঃ আচ্ছা দাক্ষায়ণী, ঐ বাচ্চাটা কাকে 'বাবা' বলে ডাকবে?

দাক্ষায়ণী ঃ আমি যখন কাজের কথা বলছি তখন তুমি আজে-বাজে কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ। এটা কি একটা সমস্যার কথা নাকি? বাচ্চা রামুকে বাবা বলে ডাকবে।

চামু নায়ার ঃ ঐ বাচ্চাটাকে দিয়ে মিছিমিছি মিথ্যে কথা বলাবে কেন? চিরদিনের জন্যে আমাদেরও ঐ মিথ্যে কথা বলতে হবে।

দাক্ষায়ণী ঃ এমনি মিথ্যে কথা অনেকেই বলে। সংসারে বাস করতে হলে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলতে হয় বৈকি!

চামু নায়ার ঃ আমি কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।

দাক্ষায়ণী ঃ দেখ, তুমি আমাকে আর রাগিও না।

চামু নায়ার ঃ সত্যি কথা বললে যদি কারোর রাগ ধরে তাতে আমার কিছু করার নেই। (শান্তাকে) খুকী, তুই এ কী পাগলামি করতে গিয়েছিলি বল্‌তো। তুই যে এমন করবি আমি তা ভাবতেই পারিনি।

দাক্ষায়ণী ঃ ওঃ! ও যেন তোমার ভাবনা মত এতদিন কাজ করে এসেছি।

চামু নায়ার : ও নিজেও ভাবতে পারেনি। দাক্ষায়ণী, তুমি একবার ভেতরে গিয়ে দেখতো প্রভাকরণ কী করছে।

দাক্ষায়ণী : শান্তা, তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে লাভ নেই দেখছি। তোর ব্যবহারে আশে-পাশের বাড়ীর সকলের মনেই সন্দেহ জাগবে। ঐ রামন নায়ার জিজ্ঞেস করেছিল কী ব্যাপার। কিছু না বললাম বটে, ত'বে রাতে দুতিন জন লোক ছোটাছুটি, টানাটানি করছে দেখলে তাদের কিছু না বললেও তারা বিশ্বাস করবে নাকি?

চামু নায়ার : 'কিছু না' মানেই 'বলা যায় না' এমন কিছু দাক্ষায়ণী।

দাক্ষায়ণী : তোমার কাছে মানে টানে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

চামু নায়ার : না জেনে বলে ফেলেছি। তাতে কিছু হবে না। হ্যাঁ যাও, প্রভাকরণ কী করছে দেখ গিয়ে, যাও।

[দাক্ষায়ণী চলে গেল]

খুকী একটা কিছু ঠিক করে আনছিলাম, তুই তো একেবারে ভেস্তে দিলি বলে আমার মনে হচ্ছে। আর কক্ষনো যেন এমন করিসনি। জীবনের দাম খুবই বেশী খুকী।

শান্তা : বাবা, আমি কী করবো বলে দিন। এ অবস্থায় আমার বেঁচে থাকা যায় না।

চামু নায়ার : কেন এই অবস্থাটায় খারাপ কী হয়েছে?

শান্তা : আমি আমার কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। আমারই ভুল হয়েছে। অন্যদের মত আমার আশা করার, ভালোবাসার অধিকার নেই।

চামু নায়ার : (হেসে) তোর বাবা মরে না গিয়ে এখনো বেঁচে আছে ধরে নে। এই পরিবারের মত তোর পরিবারেরও যদি টাকাকড়ি থাকতো তাহলে প্রভাকরণের মা আর মামা এই বিয়েতে কি রাজী হ'ত না? হতো। দাক্ষায়ণী চিঠি পাঠিয়ে প্রভাকরণের মামাকে আনালো। আমার মত জিজ্ঞেস করেছিল। আমি বললাম—যা করার করো। যা হবার হবে। এর মানে ওরা কেউ বুঝতে পারেনি।

শান্তা : আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। আমার অসহ্য হ'লে আমি যা খুশী তাই করে ফেলতে পারি। আপনি যেমন বলেছেন এই লাইনে আরো গাড়ী আসবে...

চামু নায়ার : আমি যা বলছি তা শোন্।

[কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে খানিকক্ষণ কী যেন গোপন কথা বলল।]

শান্তা : এতে লাভ কী বাবা? সব গোলমাল মিটে যাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমার মরা।

চামু নায়ার ঃ গোলমাল যদি মিটে যায় তাহ'লে তুই মরবিখন। এখন আমি যা বলছি তাই কর।

দাক্ষায়ণী ঃ (ঘরে ঢুকে) আমরা কেউ বললে ও শুনবে না। আমার ছেলেকে ধরার জন্যে ও ফাঁদ পেতেছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন সে ফাঁদে আমার ছেলে পা ফেলবে না। (চামু নায়ারকে) তুমি কী করতে চাও? প্রভাকরণের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চাও?

চামু নায়ার ঃ আমি কি সেসব ভাবতে পারি? এটা একটা নামকরা পরিবার। আমার ছেলে এ গাঁয়ের নামকরা ছেলে। আমি তাতে কিছুতেই রাজী হব না।

দাক্ষায়ণী ঃ তোমার কথাবার্তা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

চামু নায়ার ঃ তোমার পছন্দ হতে হ'লে তোমার মত কথা আমাকেও বলতে হবে, তাই না? সে যাক্—প্রভাকরণ কী করছে?

দাক্ষায়ণী ঃ কী করবে? এই মেয়েটা ওর মাথা খারাপ করে দেবে বলে আমার মনে হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া নেই, ঘুম নেই, কতদিন এমনভাবে ও কাটাবে? এই পাজী বজ্জাৎ! তুই আমাদের পরিবারটাকে শেষ করার জন্যে এ বাড়ীতে পা দিয়েছিস—না?

চামু নায়ার ঃ তোমায় দেখতে ভালো না হলে তুমি কি আয়না ভেঙ্গে ফেলবে নাকি?

দাক্ষায়ণী ঃ তুমি আমার দোষ দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থাক। প্রভাকরণ কী বলছে জানো? ও যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

চামু নায়ার ঃ শান্তাকেও নিয়ে যাবে তো? তা মন্দ নয়।

দাক্ষায়ণী ঃ (রেগে) মন্দ নয়? দেখো, আমাকে দিয়ে যা নয় তাই বলিও না। এইসব ব্যাপার ঠিকঠাক করা উচিত তোমার—তা না তুমি মাটিতে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

চামু নায়ার ঃ আমার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই। তোমরাও যদি সকলে মিলে আমার সঙ্গে মাথা উলটে দাঁড়াও তাহ'লে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

[প্রভাকরণ যেন একটা কিছু ঠিক করেছে এমনিভাবে ঘরে ঢুকলো। ওর চোখ দুটো রাগে আর ঘৃণায় জলছে।]

দাক্ষায়ণী ঃ (শান্তাকে) এই তুই বেশী কথা বলবি না। আমি বললে এখানকার লোকে বিশ্বাস করবে। তোর যে রামুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই তার প্রমাণ কী? তেমনি আরো কারোর সঙ্গে যে তোর সম্পর্ক নেই তা কে বলবে?

[শান্তা ভয়ে দাক্ষায়ণীর দিকে তাকালো]

চামু নায়ার ঃ (চীৎকার করে) দাক্ষায়ণী !

দাক্ষায়ণী ঃ যা বলার তা আমি বলবো। কিছু না বললে ও শুনবে কেন।

চামু নায়ার ঃ তার জন্যে যা হয়নি তাই বলবে ?

দাক্ষায়ণী ঃ হয়নি যে তার প্রমাণ কী ?

প্রভাকরণ ঃ (দৃঢ় স্বরে) মা, বাবা—তোমরা একটু ভেতরে যাও তো।

চামু নায়ার ঃ তোর আবার ওর সঙ্গে এখন কী কথা আছে ?

প্রভাকরণ ঃ কিছু যদি বলার থাকে তো আমারই আছে।

চামু নায়ার ঃ বেশ, কিন্তু খুব সাবধানে কতাবার্তা বলবি।

দাক্ষায়ণী ঃ তোর এখন ওর সঙ্গে কী কথা আছে ?

প্রভাকরণ ঃ কথা আছে, তোমাকে বললাম না ভেতরে যাও।

[চামু নায়ার একটু হেসে ভেতরে চলে গেল]

দাক্ষায়ণী ঃ এই শান্তা, প্রভাকরণ যা বলে মন দিয়ে শুনবি। তোরই ভাল হবে।

[দাক্ষায়ণী আম্মা একটুখানি সন্দেহ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর দরজার পেছনে অপেক্ষা করতে লাগলো।]

প্রভাকরণ ঃ শান্তা তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না। তুমি আমায় পাগল করে দিচ্ছ। আমি তোমাকে বিয়ে করবো না। সে স্বপ্নও তুমি দেখো না।

শান্তা ঃ আপনি আমার স্বামী।

প্রভাকরণ ঃ আমি তোমায় বিয়ে করিনি।

শান্তা ঃ আমার পেটের ছেলের বাপ আপনি।

প্রভাকরণ ঃ তার মানে নয় যে আমি তোমার স্বামী।

শান্তা ঃ আমার বাচ্চার বাপ আমার স্বামী।

প্রভাকরণ ঃ তোমার যুক্তি আমার শোনার দরকার নেই।

শান্তা ঃ এটা আমার মরা-বাঁচার সমস্যা।

প্রভাকরণ ঃ হ্যাঁ তোমার মরা-বাঁচা প্রশ্নের কথাই আমি বলতে চাই। তোমাকে বাঁচতে হবে। তোমার রামুকে বিয়ে করতে হবে।

শান্তা ঃ আপনার ছেলে রামুকে বাবা বলে ডাকবে—তাই না ?

প্রভাকরণ ঃ শান্তা !

শান্তা ঃ আমার বাচ্চাকে আমি অমনিভাবে বড় হতে দেব না।

প্রভাকরণ ঃ তাহ'লে কেমনভাবে তাকে বড় করতে চাও তুমি ?

শান্তা : (দৃঢ় স্বরে) আপনার বাচ্চা বলে তাকে আমি বড় করবো।
(প্রভাকরণের ভীষণ রাগ হচ্ছে)
—আমার তাতে এতটুকু লজ্জা নেই। আমার বাচ্চার বাপ কে আমি তা জানি। আমি গাঁয়ের লোককে তা খুলে বলবো।

প্রভাকরণ : (দাঁত কিড়মিড় করে) আমার মান-সম্মান নষ্ট করবে বলে ?

শান্তা : না। বাচ্চা আপনার বলে।

প্রভাকরণ : শান্তা !

শান্তা : কী ? যাই হোক, আমার অবস্থা এখন এই হয়েছে। আমার আর এখন কাউকেই ভয় নেই।

প্রভাকরণ : তাহ'লে তুমি রামুকে বিয়ে করবে না ?

শান্তা : না।

প্রভাকরণ : কেন ?

শান্তা : আমার স্বামী একটিই।

প্রভাকরণ : শান্তা, আমার কিন্তু ভীষণ রাগ হচ্ছে।

শান্তা : তার জন্য আমি কী করতে পারি ?

প্রভাকরণ : তুমি যেমন চাইছ আমি তেমন ভাবে তোমাকে বাঁচতে দেব না।

শান্তা : আমাকে প্রসব করতে দেবেন না ?

প্রভাকরণ : না।

শান্তা : বাচ্চাকে বড় করতে দেবেন না ?

প্রভাকরণ : না। আমি তোমায় বলছি যে তোমার গর্ভের ঐ বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে হবে। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার মান-সম্মান আমি নষ্ট করতে দিতে পারি না। এই আমার শেষ কথা।

[শান্তা ভীষণ ঘৃণা নিয়ে প্রভাকরণের দিকে তাকালো।]

শান্তা : (দাঁতে দাঁত চেপে) আপনি আমাকে মরতে দেবেন ?

প্রভাকরণ : না। তুমি মরলেও আমার সম্মান হানি। তাই আমি তোমাকে মরতেও দেব না।

শান্তা : আমাকে যদি আমার বাচ্চাকে নিয়ে বাঁচতে না দেন তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই মরবো।

প্রভাকরণ : (গলার স্বর নীচু করে) তুমি যদি বাঁচতে চাও তাহ'লে ঐ বাচ্চাটার বাবা আমি তা কাউকে বলতে পারবে না।

শান্তা : নিশ্চয়ই বলবো। আমার বাচ্চার বাবা আছে, থাকবেও। একটা বেশ্যার ছেলের মত ওকে আমি বড় করে তুলবো না।

[প্রভাকরণের হাত দুটো যেন অবশ হয়ে এসেছে। ও হাত দুটো মুচড়োতে লাগলো। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো। কী যে বলবে ভেবে পেল না।]

উত্তরের গাড়ীর আসার সময় হয়ে এসেছে। ঐ ট্রেণের তলায় শুয়ে আমার সব কষ্টের শেষ আমি করবো।

প্রভাকরণ ঃ (রাগে অন্ধ হয়ে) আমি তোমাকে মরতেও দেব না। (শান্তার দিকে পিশাচের মত এগিয়ে গেল) তোমাকে আমি বাঁচতেও দেব না। (শান্তার চোখ দুটির দিকে ভীষণ ভাবে তাকিয়ে) তুমি……

শান্তা ঃ মরার জন্যে আমার কারোর সাহায্যের দরকার নেই।

[প্রভাকরণ পাগলের মত শান্তার গলা চেপে ধরলো, দাক্ষায়ণী আম্মা ছুটে এল।]

দাক্ষায়ণী ঃ প্রভাকরণ, তুই করছিস কী? করছিস কী?

প্রভাকরণ ঃ (মায়ের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে) মরার জন্যে কারোর সাহায্যের তোমার দরকার নেই না? (গলা টিপতে লাগলো) কারোর সাহায্যের দরকার নেই! (আরো জোরে টিপতে লাগলো) দরকার নেই!

[দাক্ষায়ণী ছেলের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে আর প্রভাকরণ, প্রভাকরণ বলে চেঁচাচ্ছে। প্রভাকরণের চাপ শিথিল হয়ে আসছে। শান্তা ধপ করে মড়ার মত নীচে পড়ে গেল। প্রভাকরণ কীযে ঘটলো তা কিছুই বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল। দাক্ষায়ণী বসে পড়ে শান্তাকে দেখছে, শান্তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে না।]

দাক্ষায়ণী ঃ (উৎকণ্ঠার সঙ্গে, ভয়ে চেঁচিয়ে)—প্রভাকরণ!

[প্রভাকরণের আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসছে। চীৎকার শুনে চামু নায়ার ঘরে ঢুকলো। এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলো।]

দাক্ষায়ণী ঃ (উঠে পড়ে প্রভাকরণের কাছে গিয়ে ভয়ে)—প্রভাকরণ তুই এ কী করলি?

[প্রভাকরণ চমকে উঠল]

—তুই কি পাগল নাকি? ওঃ ভগবান! এই পরিবারে শেষ পর্যন্ত এও হ'লো।

চামু নায়ার ঃ (একটু ভেবে) ওকে তোমরা মরতে দাওনি।

[দাক্ষায়ণী আবার শান্তার নাকে মুখে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো। ভয় পেয়ে আবার প্রভাকরণের কাছে এল। ওর মুখের দিকে ভয় মিশ্রিত চোখে তাকালো।
চামু নায়ারের পা দুটোয় শক্তি না থাকায় একটা সোফায় গিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে বসে পড়লো। বসে বসে শান্তার মৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল। দাক্ষায়ণী আম্মা চারিদিকে তাকাচ্ছে, কী সে করবে ভেবে পাচ্ছে না। প্রভাকরণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে উত্তর দিক থেকে গাড়ী আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। স্টেশন ছাড়ার হুইশিলও শোনা গেল। দাক্ষায়ণী আম্মার ভাবনা চিন্তা গাড়ীর শব্দে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।]

দাক্ষায়ণী ঃ (এতক্ষণে বুদ্ধি ফিরে পেয়ে) প্রভাকরণ, এই মড়াটা নিয়ে গিয়ে ঐ ট্রেণের লাইনে ফেলে দে। ও একবার ট্রেণের দিকে ছুটে গিয়েছিল। কেউ কেউ তা দেখেছে। লোকেরা ভাববে ও ট্রেণের তলায় মাথা রেখে আত্মহত্যা করেছে। রামু ফিরে আসার আগে এ কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। রক্ষা পাবার আর কোনো উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না। (প্রভাকরণ শুনতে পায়নি দেখে তার হাত ধরে তার মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করে আবার সেই এককথা বলতে লাগলো। গাড়ীর শব্দ ক্রমে এগিয়ে আসছে)—খোকা, আর এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এই মড়াটা নিয়ে শীঘ্রি রেল লাইনে শুইয়ে দিয়ে আয়। নইলে কালই এখানে পুলিশ আসবে। রেল লাইনে ফেলে দিয়ে এলে ও আত্মহত্যা করেছে ভাববে।

[প্রভাকরণের হাত ধরে টানতে লাগলো। গাড়ীর আওয়াজ ক্রমে কাছে আসছে। চামু নায়ার উঠে পড়ল। কেন তা নিজেই জানে না।]

দাক্ষায়ণী ঃ প্রভাকরণ, তাড়াতাড়ি তোল দেহটা।

[(প্রভাকরণ একটা যন্ত্রের মত মার কথা শুনতে লাগলো। শান্তার দেহটা তুলে ধরলো, আগে এগোনোর শক্তি নেই। গাড়ী খুব কাছে এগিয়ে আসছে। দাক্ষায়ণী আম্মা প্রভাকরণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো) ......গাড়ী এসে গেছে। আর দেরী কর না......

[প্রভাকরণ একই ভাবে শান্তার দেহ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু দেখে শুনে চামু নায়ারও দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ী এসে গেছে। প্রভাকরণের হাতে শান্তার মাথাটা কি একটু নড়ে উঠলো?

হাতগুলো ?……প্রভাকরণ খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলো। ওর কি জীবন আছে ? দাক্ষায়ণী আম্মা, চামু নায়ারও লক্ষ্য করছে। প্রভাকরণ শান্তাকে সোফায় শুইয়ে দিল। ওর মুখের দিকে তাকালো। প্রভাকরণের মুখ উৎকণ্ঠায় ভরা। সোফার পেছনে চামু নায়ার দাঁড়িয়ে। শান্তার মাথার কাছে দাক্ষায়ণী আম্মা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যখন এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তখন রাতের গাড়ী তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেল। ট্রেণের আওয়াজ আস্তে আস্তে মিশিয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না। শান্তা খুব কষ্টের সঙ্গে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করছে। ট্রেণের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। প্রভাকরণ শান্তার মাথাটা সোফায় রেখে একটুখানি দেখার পর মা আর বাবার দিকে তাকালো। তারপর শান্তার মুখের ওপর প্রভাকরণের হাত আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো, সে শান্তার হাত ধরলো। চামু নায়ার সন্তুষ্ট হয়ে ছেলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলো।]

[কয়েক বছর আগে ঘটা এক আত্মহত্যার সেই একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পুনরাবৃত্তি হলেপর যেসব তরুণ স্বামী-স্ত্রী প্রেম আর আবেগের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পারে না তাদের সামনে এখানে উঠোচ্ছি মৃত্যুর একটা যবনিকা।]

বালুকণা

জি. শঙ্কর পিল্লা

চরিত্র

পাহারাদার

বৃদ্ধ

বৃদ্ধা

গায়ক সঙ্ঘ

শঙ্কর পিল্লা নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন। নাটকের প্রতীক সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রচুর। মলয়ালম ভাষার অধ্যাপক হিসেবে প্রচুর পড়াশুনোও করেছেন। 'স্নেহের দূত', 'বিবাহ-স্বর্গে' থেকে আরম্ভ করে প্রায় কুড়িখানি নাটক তিনি লিখেছেন। মলয়ালম নাট্যসাহিত্যেও তিনি গবেষণা করেছেন। 1930 সালের জুন মাসে তাঁর জন্ম। 'বালুকণা' একাঙ্ক নাটক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বালুকণা

[সমুদ্রের তীর।
বিশাল বিস্তৃত বালুকা রাশি।
নীচে সমুদ্র তীরভূমি।
বোঝা রাখবার একটা পুরোণো জায়গা।
তার কাছাকাছি মিউনিসিপ্যালিটির একটা পুরোণো লাইটপোস্ট।
সমুদ্রের দিক থেকে বুড়ো পাহারাদার প্রবেশ করলো। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। বয়স আন্দাজ করা যায় না। হেঁটে হেঁটে লাইটপোস্টের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতের পুরোণো মর্চে ধরা একটা লম্ফ থেকে আলো নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্প পোস্টে আলো জ্বালালো। তারপর বোঝা রাখার জায়গাটায় হেলান দিয়ে আত্মমগ্ন ভাবে দর্শকদের দিকে।]......

পাহারাদার ঃ (সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে) অগাধ, নীল, নিত্য চঞ্চল সমুদ্র। (সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে) নির্জন, বালুকণার রাশি, ম্লান হয়ে যাওয়া সূর্য যেন সমুদ্র তীরকে পাহারা দিচ্ছে, (গুণতে লাগলো) এক, দুই......তিন......চার। এই গ্রানাইট পাথরের প্রতিমাগুলো......(সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে) বাস্—শেষ হ'য়ে গেল! আমার খেলাও। কার জন্যে আমি এই আলো জ্বালাছি? ঐ যে ক্ষুব্ধ গর্জন করে চলছে ঐ ঢেউগুলোর জন্যে? (সমুদ্রের গর্জন শুনতে লাগলো) কার জন্যে? তবু প্রতি সন্ধ্যায় এই আলো জ্বালাতে হবে......গতকাল......আজ......আগামী কাল...... রোজ......

[বোঝা রাখার জায়গাটার ওপর উঠে বেশ শক্ত হ'য়ে বসলো। ছেঁড়া-খোঁড়া সার্টটার পকেট থেকে একটা চুরুট বার করলো। কাছেই জ্বালা লম্ফটা থেকে চুরুটটা জ্বালালো। তারপর সেই চুরুটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে রইল।

এই সময় নানাদিক থেকে অনেক কাগজের সাংবাদিকরা আসতে লাগলো। এই কাজের জন্যে যা যা দরকার অর্থাৎ ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডারের মাউথ-পীস, প্যাড ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। খবরের কাগজের তৈরী মুখোস তারা পরে আছে। দু-একজনের হাতে ফুলোনো নানা রঙের বেলুন সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে।—ঠিক যেমন সমুদ্রের তীরে বেড়াতে

আসা বাচ্চাদের হাতে থাকে। এরা নানাদিক থেকে আসছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শকদের মধ্যে থেকেও। তারা সব একই সময়ে মঞ্চে প্রবেশ করলো।]

প্রথম জন ঃ (নিমন্ত্রণ পত্র দেখে) হ্যাঁ এখানেই। এই তো বালুকা রাশি ভরা সমুদ্র তীর।

দ্বিতীয় জন ঃ (নিমন্ত্রণ পত্র দেখে) অগাধ বিস্তীর্ণ তীরভূমি।

তৃতীয় জন ঃ (চিঠি দেখে) আর সেই তীরভূমিকে জীবন দিচ্ছে এই ঢেউগুলির শত শত কণা।

চতুর্থ জন ঃ (প্রতিমাগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকটা দেখিয়ে) ঐ যে ওগুলো কী ?

সকলে মিলে ঃ প্রতিমা, প্রতিমা, শিলা বিগ্রহ।

পঞ্চম জন ঃ ওরা কারা ?

সকলে ঃ কারা ? জানি না কারা।

ষষ্ঠ জন ঃ (দৈববাণীর মত) মরুভূমি থেকে ডেকে বলা মানুষটির কথা এগুলো।

আর সকলে ঃ যেন অবতারের সামনে এমনি ভাবে ষষ্ঠ লোকটিকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে) গুরুদেব ! বলুন ! জ্ঞানোপদেশ দিন।

ষষ্ঠ জন ঃ জল দিয়ে স্নান করে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম জন : ওরা কারা ?

[অন্যেরা সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। ষষ্ঠজন (সেই একই ভাবে) ওরা ? কারা ? ওরা শিলাস্তূপ। সাগরের হুঙ্কারকে এই পাথরগুলোর জন্যে ক্ষীণ রোদনের মত শোনাচ্ছে]

পাহারাদার ঃ (জোরে হেসে উঠে দর্শকদের দিকে চেয়ে) এক অজ্ঞ আর এক অজ্ঞকে পরিহাস করছে। এক পা গোদওয়ালা দু পায়ে গোদওয়ালাকে ঠাট্টা করছে। মুখরিত সমুদ্র......এই অগাধ সমুদ্রে এই তীর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত এই পাথরগুলো না থাকলে। ইতিহাস সৃষ্টি করা স্বত্বগুণের অধিকারী এই অনশ্বর প্রতিমাগুলো না থাকলে......এরা শুধু শিলা মাত্র, শিলা......মুর্খ সব (নিভে যাওয়া চুরুট আবার জ্বাললো।)

প্রথম জন ঃ (প্রতিমাগুলোর একটু কাছে গিয়ে দেখে ফিরে)

পাথর নয় এরা মানুষের অবয়ব।
শক্ত বুকে সাগরকে পেছনে হটিয়ে দেওয়া
এই শক্তিমানেরা কি শুধুই শিলা ?

চতুর্থ জন ঃ আমি শুনেছি যে এটা ঠিক।

দ্বিতীয় জন ঃ তাহ'লে (কার্ড দেখিয়ে) এর নায়ক? এখানে? আজ······ (প্রতিমাগুলোকে দেখিয়ে) তাকে এদের ভাই করার জন্যে?

তৃতীয় জন : ঠিক, ঠিক গল্পটা তাইই।

প্রথম জন ঃ (প্রতিমাগুলোকে) আপনারা উঠুন। আর একজন আপনাদের সারিতে দাঁড়াতে আসছেন।

পঞ্চম জন : আজ······এখানে—এখন······

দ্বিতীয় জন ঃ না, না এরকম ভাবে নয়। গান—গান—গান চাই।

তৃতীয় জন ঃ আমরা বন্দনা গান গাইব।

প্রথম জন ঃ ডুগডুগি বাজাবার জন্যে খবরের কাগজ আছে। সকলে থান—গান—গান—

[মুকাভিনয়—তারা তিনজন করে এক লাইনে স্টেজের দুভাগে দাঁড়িয়ে কোরাসের মত বন্দনা গান গাইতে লাগলো।]

গান—হে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু
জাগ্রত হ'ন।
এই প্রভাত বন্দনা আপনার জন্যেই প্রভু।
তরঙ্গাগ্নিবাহন হে শক্তিমান মূর্তিগুলি
এই প্রাতঃসঙ্গীত আপনার দাসেদের সশ্রদ্ধ বন্দনা।
হে আগত নবযুগ রক্ষাকর্তা
আমরা বন্দীরা আপনার প্রত্যুদগমনে স্তুতিরত।
হে সুন্দর, হে প্রভু
জাগ্রহ হ'ন এই উষার প্রথম দর্শনে।

[গান গাইতে গাইতে ষ্টেজের দুদিকে তিন তিনজন একসঙ্গে গিয়ে বসলো। কোরাসের পর তারা নিশ্চল হ'য়ে বসে রইল। বোঝা রাখার জায়গাটার ওপর পাহারাদারও সেইরকম নিশ্চল হয়ে বসে আছে।

এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আর একপাশ দিয়ে ষ্টেজের মধ্যে ঢুকলো। বৃদ্ধের চেহারা বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। গায়ে একটা বড় লম্বা কোট, তাতে কতকগুলো মেডেল আটকানো। হাতে একটা ছড়ি। বৃদ্ধা তার সহচরী। বৃদ্ধার মাথার চুল সাদা, মুখ আভিজাত্যে ভরা। দুজনেই ছোট্ট বাচ্চাদের মত হাসতে হাসতে খুশীভরে বালির ওপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে ছুটে আসছে। বালির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে অর্থহীন খুশীর উচ্চহাসি হাসতে লাগলো।]

বৃদ্ধা ঃ (খুশীতে) এসো আমরা কাল্লেক্কুত্তু[1] খেলি।

বৃদ্ধ ঃ কে বললো আসিনি।

বৃদ্ধা ঃ আহা, আমি যেন জানি না। আচ্ছা এটা ছাড়া অন্য আর কী খেলা জানো তুমি ?

বৃদ্ধ ঃ আহা বেচারী কিছু জানে না। (নিজের কোটের মেডেলগুলো দেখিয়ে) তুমি এগুলো দেখতে পাচ্ছ না ?

বৃদ্ধা ঃ ওগুলো তো তুমি ভালো খেলা খেলে পুরস্কার পেয়েছ। এসো না খেলি। (লোভ দেখানোর ভাবে) আমার জন্যেও অন্ততঃ একটু খেল। (উত্তরের) প্রতীক্ষা না করে বালির ঢিপি তৈরী করে তার মধ্যে ঝাঁটার কাঠি লুকিয়ে রাখার ভাবে ছড়া গান করতে লাগলো—

আকুত্তিকুত্তাশ্বরম্বত্ত
কাল্লেক্কুত্ত ফারিক্কুত্ত[2]

হুঁ—চোখ বন্ধ কর।

[বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলো। বৃদ্ধা আবার সেই পুরোনো ছড়ার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো।]

বৃদ্ধা ঃ তুমি চোখ বন্ধ করনি।

বৃদ্ধ ঃ নিশ্চয় বন্ধ করেছি। এই দেখ। (সে যে কত ভাল করে চোখ বন্ধ করেছে তা দেখালো।)

বৃদ্ধা ঃ কে নিল কামদেব নিল
কামদেব লাফালো, প্রদীপ ছুঁড়ে ফেল।[3]

বৃদ্ধ ঃ ভুল, ভুল।

বৃদ্ধা ঃ তুমি তাহ'লে চোখ বন্ধ করনি।

বৃদ্ধ ঃ আমি এখন অবধি চোখ খুলিনি। একবারও না। কত বছর হয়ে গেল। কিন্তু......আজ......

বৃদ্ধা ঃ ওহো ! পুরোণো স্মৃতি। খেলবে না ?

বৃদ্ধ ঃ এত খেলেও হ'ল না ?

---

1 বালির মধ্যে ঝাঁটার কাঠি লুকিয়ে রেখে শিশুদের এক খেলা। একজন ঝাঁটার কাঠি অমনি ভাবে বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখবে। অন্য আর একজন সেটা কোন্ জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলবে।

2 অর্থহীন ছড়া—ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ির মত।

3 অর্থহীন ছড়া।

বৃদ্ধা ঃ কে বলল এত খেলেছি ?
বৃদ্ধ ঃ ঠিক আছে, আরম্ভ কর।
বৃদ্ধা ঃ খেলার সময় কিন্তু জোচ্চুরি করলে চলবে না।
বৃদ্ধ ঃ না, চলবে না।
বৃদ্ধা ঃ তাহ'লে তুমি যে দেখলে ?
বৃদ্ধ ঃ চোখ বন্ধ করেও দেখলাম নাকি ?
বৃদ্ধা ঃ চোখ খুলে যা দেখতে পাবে না চোখ বন্ধ করলে তা দেখতে পাবে।
বৃদ্ধ ঃ ননসেন্স !
বৃদ্ধা ঃ চল্লিশ বছর।
বৃদ্ধ ঃ তাহ'লে তোমার কী খেলা বন্ধ করার সময় এখনো হয়নি ?
বৃদ্ধা ঃ চোখ বন্ধ করলে ভুল বা নির্ভুল জানবে কী করে ?
বৃদ্ধ ঃ কীসের বিষয় ?
বৃদ্ধা ঃ খেলার বিষয় হলেও।
বৃদ্ধ ঃ তোমার গানে ভুল হয়েছিল, সেই কথাই বলেছি।
বৃদ্ধা ঃ আহা, আজ চল্লিশ বছর ধরে যে গান করেছি তাতে ভুল ?
বৃদ্ধ ঃ ইয়েস্ ! তুমি চোখ বন্ধ কর। এবার আমার পালা।
বৃদ্ধা ঃ তুমি যদি বলো যে তুমি হেরে গেছ তাহ'লে চোখ বন্ধ করবো।
বৃদ্ধ ঃ আমি হেরে গেছি ? আমি জয়লাভ করেছি......দেখছ না এই মেডেলগুলো ......আমি এক জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছি, তাদের স্বাধীন করেছি। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। ধ্বংস করেছি। রাজত্ব করেছি। আমি জয়লাভ করেছি।
বৃদ্ধা ঃ আহা ! সে আমি পরাজয় মেনেছি বলে।
বৃদ্ধ ঃ শীঘ্রি চোখ বন্ধ কর। ওয়ান, টু...—থ্রি বলার আগে চোখ বন্ধ করবে।
বৃদ্ধা ঃ আরম্ভ করো।

[চোখ বন্ধ করলো।]

বৃদ্ধ ঃ আকুত্তিকুত্তাশ্বরম্বত্ত কাল্লেঙ্কুত্ত কারিঙ্কুত্ত......(তার মনোযোগ সমুদ্রের কাছাকাছি প্রতিমাগুলোর দিকে।)
বৃদ্ধা ঃ ভুলে গেলে বুঝি ?

[চোখ খুললো।]

বৃদ্ধ ঃ মনে করার চেষ্টা করছি। এখন মনে পড়েছে।
বৃদ্ধা ঃ মিথ্যুক কোথাকার ! তাহ'লে গান কর। এটা আমার চোখ বন্ধ করার কৌশল।
বৃদ্ধ ঃ আমার চোখ খুলেছে। ঐ দেখ।

বৃদ্ধা : হ্যাঁ, আরম্ভ করো। (হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করলো)

বৃদ্ধ : আকুত্তি কুত্তাশ্বম্বত্ত......

বৃদ্ধা : (চোখ খুলে) শুনতে পাচ্ছ?

বৃদ্ধ : কী? ঐ ঢেউয়ের শব্দ?

বৃদ্ধা : না, না, একটা মোটর গাড়ীর শব্দ।

বৃদ্ধ : গাড়ীর শব্দ? কেন?

বৃদ্ধা : আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে যে গাড়ীটা।

বৃদ্ধ : ও গাড়ী আর এখন আসবে না।

বৃদ্ধা : (বাচ্চাদের মত জেদ ধরে) আসবে, আসবে।

বৃদ্ধ : বলছি আসবে না।

বৃদ্ধা : তাহ'লে আমরা যাবো কী করে?

বৃদ্ধ : গাড়ীতে করে আমরা কোথায় যাবো? আমি বললাম না যে আমাকে ঐ—ওখানে যেতে হবে। তার সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা : আহা, সেটা বুঝি সত্যি করে বলেছিলে? আমি ভেবেছিলাম......(হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে) গাড়ীটার আসা দরকার। না আসলে হবে না।

বৃদ্ধ : কেন?

বৃদ্ধা : আমাদের যেতে হবে না? হ্যাঁ, গাড়ীটার দরকার।

বৃদ্ধ : কেন?

বৃদ্ধা : ছেলেমেয়েরা আমাদের জন্যে বুঝি অপেক্ষা করে থাকবে না?

বৃদ্ধ : ওরা ঐ গাড়ী এখন আর পাঠাবে না।

বৃদ্ধা : তাহ'লে দরকার নেই। আমরা তো দুজনে আছি......

বৃদ্ধ : আমি......

বৃদ্ধা : খেলো না! এস খেলি।

বৃদ্ধ : তুমি খেল।

বৃদ্ধা : একলা?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ।

বৃদ্ধা : আহা, আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলছ, তাই না? খেলো না 'কাল্লেঙ্কুত্ত কারিঙ্কুত্ত......আবার। আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের না নিয়ে গেলে আমরা আবার বাচ্চা হয়ে যাবো—কী বল?

বৃদ্ধ : আবার? তাহ'লে এই এত বছর? একাধিপত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম, হাজার হাজার লোকের মনের পরিবর্তন আনলাম। নতুন বীর আরাধনার কাজ আর স্তোত্র তৈরী করে......

বৃদ্ধা ঃ চিরুণী পেলাম না, কাপড় পেলাম না, কে নিয়েছে, কাম নিয়েছে খোলা —কাল্লেঙ্কুত্ত কারিঙ্কুত্ত……

বৃদ্ধ ঃ (ধড়মড় করে উঠে পড়ে) না, এরকম করতে পারবে না, তুমি আমাকে এমনভাবে শক্তিহীন কোরো না। এ পাগলামি নিরর্থক।

বৃদ্ধা ঃ এটা নয় ওটা। এটাই সত্যি। এটাই সুখ।

বৃদ্ধ ঃ আমি খেলবো না।

বৃদ্ধা ঃ আহা বেচারা!

বৃদ্ধ ঃ আমাকে যেতে হবে। আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। আমাকে ওদের মধ্যে প্রথম হ'তে হবে।

বৃদ্ধা ঃ যেতে হবে? আমাকে ছেড়ে দূরে? এই খেলা ছেড়ে কোথায় যাবে?

বৃদ্ধ ঃ আমার পাওয়া, আমার যুদ্ধ করে পাওয়া……

বৃদ্ধা ঃ সে সব এই দেখ এখানে পড়ে রয়েছে। যা দেখেছ সব এখানে (বালির রাশি হাতে তুলে দেখাতে লাগলো।)

বৃদ্ধ ঃ (রেগে) আমি তা বিশ্বাস করি না। আমার পক্ষে তা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

[বালিগুলোকে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। কতকগুলো পুরোণো মুদ্রা—অতি পুরাতন মুদ্রা বালির মধ্যে থেকে বের হ'তে লাগলো।]

বৃদ্ধ ঃ ঃ (ভালোভাবে দেখে) এগুলো কী? পুরোণো মুদ্রা। শতশত বছরের পুরোণো—অতি পুরাতন সময়ে……এর মানেটা কী?

বৃদ্ধা ঃ ওরাও খেলতো।

বৃদ্ধ ঃ কী খেলা?

বৃদ্ধা ঃ কালেঙ্কুত্ত। আমরাই এই প্রথম না। কত কত লোকে খেলেছে এ খেলা। এটা কী সমুদ্রের তীর নয়……এসো আমরা খেলি।

বৃদ্ধ ঃ পারবো না, আমাকে যেতে হবে।

বৃদ্ধা ঃ কোথায় যাবে? সব জায়গায় তো গেলে। পথের সব মন্দিরে কী যাওনি? এখন……

বৃদ্ধ ঃ কোথাও কি নেই?

বৃদ্ধা ঃ থাকলে বল।

বৃদ্ধ ঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে……তার আগে……

বৃদ্ধা ঃ কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়……সময় শুধু ঘন কালো হয়ে আসবে।

বৃদ্ধ ঃ তুমি আমার সময় নষ্ট করছ। আমাকে……আমাকে (ক্লান্ত ভাবে বেড়ানোর ছড়িটায় ভর দিল।)

বৃদ্ধা ঃ (মাতৃ ভাবে) আহা বেচারা ! আমার ছোট্ট খোকা ! বেচারা ! বেচারা । (কাছে গিয়ে তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে বৃদ্ধকে ঢেকে ঘুম পাড়ানির দুটো লাইন গাইতে লাগলো)—খোকা ঘুমোও, ঘুমোও, ঘুমোও। আমার সোনার খোকা ঘুমোও।

বৃদ্ধ ঃ (হঠাৎ ঠেলে বৃদ্ধাকে সরিয়ে দিয়ে) না—আমাকে যেতেই হবে।

বৃদ্ধা ঃ ঘুমোতে—তাই না ?

বৃদ্ধ ঃ না। ঐ প্রতিমাগুলোর কাছে……সমুদ্রের একেবারে শেষ প্রান্তে, ভিজে মাটিতে সাপের ফণার মতো ঢেউগুলো যখন দংশন করতে আসে তখন তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা ঐ প্রতিমাগুলোর কাছে আমাকে যেতে হবে।

[এই সময় সেই গায়কসঙ্ঘের সাংবাদিকদের সজীবতা আবার ফিরে আসছে। এক একজন করে এক এক দিকে, মাঝে একটা লোক—এইভাবে সকলে মিলে বাইবেল থেকে বলতে লাগলো। অন্যেরা হাঁটু গেড়ে তার সঙ্গে 'আমেন'[1] বলতে লাগলো। তারপরেই আবার তারা সব নিশ্চল হয়ে গেল।]

একটা শব্দ ঃ তোমরা কী দেখার জন্যে মরুভূমিতে গিয়েছিলে ?

একজন ঃ বাতাসে টলমল করা নৌকো ? না কী দেখতে গিয়েছিলে ? অথবা মৃদুল বস্ত্র ধারণ করা মানুষকে ?[1]

অন্যজন ঃ তা' না। কী জন্যে গিয়েছিল ? একজন অবতারকে দেখতে। হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলছি অবতারের চেয়েও ভালো একজনকে দেখতে গিয়েছিল।

দু'জনে ঃ আমি আমার দূতকে তোমার আগে পাঠাচ্ছি। সে তোমার সামনে তোমার পথ তৈরী করে রাখবে।

[তারা আবার নিশ্চল হয়ে গেল]

বৃদ্ধা ঃ (একটুখানি চুপ করে থাকার পর) যাবার জন্যে কেন এই জেদ ধরেছ ?

বৃদ্ধ ঃ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। আমাকে তাদের একজন হতে হবে।

বৃদ্ধা ঃ কতদূর হাঁটতে হবে ? পা ফেললেই গর্ত।

বৃদ্ধ ঃ আমি ? আমি কখনোই পড়বো না। এই দেখ এই যে মেডেলগুলো…… আমার পেছনে দেখ।

বৃদ্ধা ঃ ওঃ ওটা……কাল্লেক্কুত্ত খেলা।

বৃদ্ধ ঃ না। আমার সৃষ্টি করা পৃথিবী।

---

1 বাইবেল থেকে উদ্ধৃত।

বৃদ্ধা ঃ তার নিশ্চয়তা কী?

বৃদ্ধ ঃ তোমার ঈর্ষা আছে।

বৃদ্ধা ঃ বাঃ বাঃ, মন্দ বলোনি।

বৃদ্ধ ঃ আমি ওদের একজন হ'য়ে গেলে?

বৃদ্ধা ঃ আমি বীর তরুণীর মত তোমার কপালে তিলক লাগাবো, মালা দেব, আশীর্বাদ করবো।

বৃদ্ধ ঃ তারপর?

বৃদ্ধা ঃ এই বালুরাশিতে বসে অপেক্ষা করবো।

বৃদ্ধ ঃ তাহ'লে এই যে সব দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভক্তরা কোথায়?

বৃদ্ধা ঃ ওরা বালির নীচে আছে বোধ হয়। বালির সঙ্গে মিশে গেছে।

বৃদ্ধ ঃ গুড্। তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি প্রিয়তমা।

বৃদ্ধা ঃ কিন্তু……

বৃদ্ধ ঃ ধ্যেৎ, আবার……

বৃদ্ধা ঃ ঠিক তো?

বৃদ্ধ ঃ সে তো তুমি এখন দেখতেই চলেছ।

বৃদ্ধা ঃ তুমি এতদিন কী করেছ?

বৃদ্ধ ঃ আমি? ষাট বছর। সুদীর্ঘ ষাট বছর। সেবায় ভরা বছরগুলি……ঘটনাবহুল বছরগুলি। আমি……আমি……

[পাহারাদার জোরে হেসে উঠলো]

বৃদ্ধা ঃ কে যেন একথা শুনে হেসে উঠলো।

বৃদ্ধ ঃ দূর, ওটা বাতাস……

বৃদ্ধা ঃ আমাদের এখানে বসে বসে ঝাঁটার কাঠি পোঁতা খেললে হয় না?

বৃদ্ধ ঃ কতক্ষণ?

বৃদ্ধা ঃ যতক্ষণ না আশা মেটে।

বৃদ্ধ ঃ আশা মেটেনি? এত বছর খেলেও?

বৃদ্ধা ঃ যত খেলি, ততই উৎসাহ বাড়ে। আর উৎসাহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলি।

বৃদ্ধ ঃ নাঃ আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আমি জয়লাভ করবই।

বৃদ্ধা ঃ ঠিক জানো?

বৃদ্ধ ঃ ঐ যে ওদিকে দেখ। দেখতে পাচ্ছ না?

বৃদ্ধা ঃ নাঃ, কিছুই……কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু কতকগুলো প্রতিমা।

বৃদ্ধ ঃ কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। কালভেরি পাহাড়, কপিলাবস্তু……বিস্তৃত বালুকারাশির জঙ্গল, সন্ধ্যাগুলি, সূর্যোদয়, দাসদের চাবুক মারা, শেকল ভাঙার বিপ্লব……তরঙ্গগুলি ঐ পাথরের প্রতিমাগুলির ওপর এসে আঘাত

করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আমি এই প্রতিমাদের মধ্যে এক হয়ে যেতে চাই।

বৃদ্ধা ঃ আমি……

বৃদ্ধ ঃ এখানে দাঁড়িয়ে থাক। ঐ মহত্ত্ব একবার দেখো। আমার হারানোর কিছু নেই শেকলগুলি ছাড়া। এইটা……এইটা রাখো। (তার হাঁটার ছড়িটাকে বালিতে পুঁতলো। কোটটা খুলে তাতে ঝুলিয়ে রাখলো।) এরা তোমার সঙ্গী হয়ে থাকুক। তোমার পথ তৈরী হোক্। বাই বাই, লাল সেলাম।

[বালির ওপর দিয়ে ঢালুর দিকে হাঁটতে লাগলো।]

পাহারাদার ঃ (চেঁচিয়ে) যেও না, যেও না। (এটা শুনতে না পেলেও বৃদ্ধ একবার থেমে গেল। ফিরে একবার বৃদ্ধাকে দেখে মৃদু হাসলো। তারপর আবার হাত নেড়ে বিদায় নিল।) হৃদয়ে যাদের শক্তি নেই, যাদের বিশ্বাসের শক্ত লাঠি নেই, দিগন্ত ভেদ করার দৃষ্টি যাদের নেই…… কেউই……কেউই শুনছে না, মনোযোগ দিচ্ছে না, আমার সতর্কবাণী…… এ যেন বধিরের কাণে গানের মত।

[গায়ক সঙ্ঘের মধ্যে আবার চৈতন্য জাগছে। তারা সকলে মিলে একটা সঙ্ঘগান গাইতে লাগল উত্তর কেরালার বীর গাথা।]

সঙ্ঘ— হে বীর
যাও জয়যাত্রায় যাও
ক'রো না কালারির[1] অপযশ
ক'রো না কালারির দুর্নাম।
রণক্ষেত্রে মৃত্যুলাভ বরং গৌরব।
শহীদের সম্মানে অন্ত্যেষ্টি অর্ঘ দেব আমরা।
হে বীর আলোক স্তম্ভের মত
উজ্জ্বল জয়ধ্বজা তোলো আকাশে।

[তারা সামনে বেঁধে রাখা বেলুনগুলো ফাটাতে লাগলো। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ তীরে আঘাত করার মত শব্দ। পাহারাদার এসব কিছুই শুনতে পেল না।]

বৃদ্ধ ঃ (চেঁচিয়ে) শুনতে পাচ্ছ না? আমি ডাকছি। শুনতে পাচ্ছ? (ভালো করে দেখে) ওখানে নেই তো……চলে গেছে……ঐ সমুদ্রের গর্ভে। এই

1 কেরালার পুরাতন সামরিক শিল্পকলা।

প্রতিমাগুলোকে ধাক্কা না দিয়ে চলে গেল। হায় হায়……ঝাঁটার কাঠি খেলা খেললেই হ'তো……আর এখন? চলে গেছে। (ছড়ি আর কোটটা নিল)……এটা……চল্লিশ বছরের শেষে এই……এই অবশিষ্ট—এইই মাত্র (ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে হাত তুললে) না……এটা ভালো করে রাখতে হবে। শুধু এটাই এখন আছে……আমার সব প্রতাপ এখন একটা ছেঁড়া কোটে আর একটা পুরোনো ছড়িতে পর্যবসিত হয়েছে!

[বোঝা রাখবার জায়গা ও ল্যাম্পপোষ্টের দিকে এগিয়ে চলল। তখন মুখোশ পরা সেই লোকগুলি দৌড়ে সেই বৃদ্ধাকে ঘিরে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগলো। তাদের তখনকার পদক্ষেপ স্বাভাবিক নয়, পুতুলের মত।]

সঙ্ঘঃ কোথায়? নায়ক কোথায়? অনশ্বর হয়ে গেছে?……বল, বল।

[বৃদ্ধা তাকে ঘেরা লোকগুলোর দিকে স্তম্ভিত হ'য়ে দেখতে লাগলো। ফ্ল্যাশ বালব জ্বলছে। পাহারাদার তার আগের জায়গাতে বসে সব কিছু দেখতে লাগলো।]

বৃদ্ধাঃ এই……শুধু এই……উনি (সমুদ্রের দিকে হাত দেখালো।)

[পাহারাদার লাফ দিয়ে নেমে ছড়িটা ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কোটটা ছিঁড়ে ফেলল, মেডেলগুলো বালিতে ছুঁড়ে ফেলল।]

বৃদ্ধাঃ আহা হা……এগুলো উনি……

পাহারাদারঃ এগুলো নিয়ে যাবে নাকি?

সঙ্ঘঃ (পাহারাদারকে ঘিরে) তুমি কে? চোর? নীচ—

পাহারাদারঃ দূরে সরে দাঁড়াও, পাজী বদমাইশের দল, দূরে সরে যাও।

বৃদ্ধাঃ দাও, দাও, ওগুলো দাও।

পাহারাদারঃ এগুলো নিয়ে চলে যাবে? এগুলো দিয়ে আর একটা নতুন ধর্মের সৃষ্টি করবে? দ্য রোব—দ্য হোলি রোব! সম্ভব নয়……

[বোঝা বইবার জায়গাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্ঘ পাহারাদারের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাকে ঘিরে ধরলো। তারা একসঙ্গে এমন একটা আওয়াজ করতে লাগলো ঠিক যেন নাচের মত।]

বৃদ্ধাঃ আমি তখনি বলেছিলাম। এই খেলা খেললে……

সঙ্ঘ ঃ কেমন করে হ'লো বলো ? বল, লুকিয়ে থাকার কারণ কি ! বল—বল—বল……

বৃদ্ধা ঃ আমি তখনি বলেছিলাম……

সঙ্ঘ ঃ আমাদের ডেকে আনা হয়েছে। খবর সব বল—বল—বল।

বৃদ্ধা ঃ আমি কি করে জানবো ?

সঙ্ঘ ঃ তা বললে চলবে না—চলবে না—চলবে না।

বৃদ্ধ ঃ ঝাঁটার কাঠির খেলা ছাড়া আর কোনো খেলাই খেলি নি। তাই, যেও না……যেও না বলাতেও……

সঙ্ঘ ঃ আমাদের এক বীর পুরুষকে চাই, চাই একজন যুগাবতারকে—দেবে কি—দেবে কি—দেবে কি ?

বৃদ্ধা ঃ আমায় ছেড়ে দাও। আমার আর ভালো লাগছে না। আমার সঙ্গে খেলা করার আর কে আছে ?

সঙ্ঘ ঃ তা হবে না, তা হবে না, তা হবে না।

বৃদ্ধ ঃ আমি তার কী করবো !

সঙ্ঘ ঃ তুমি পৃথিবীর কাছে বল এ কাহিনী……আমাদেরও বল—বল—বল।

[সঙ্ঘের একজন লোক বালি থেকে একটা জাল দিয়ে ছুঁড়ে তার মধ্যে ঐ বৃদ্ধকে ঢুকোলো। ফ্ল্যাশ বাল্‌বের আলোগুলো ম্লান হয়ে যেতে লাগলো।]

বৃদ্ধা ঃ (রেগে) আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

[সঙ্ঘ খুব খুশীর সঙ্গে বৃদ্ধাকে ঘিরে নাচতে নাচতে, 'তা হবে না, তা হবে না, তোমাকে দিয়ে বলাবো, বলাব' বলে চীৎকার করতে লাগলো। বৃদ্ধা তখন তার হাতের নাগালে পাওয়া তাদের মুখোশগুলো ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। তখন তারা সব অন্ধ হয়ে গেল। তারা দাঁড়িয়ে এক জায়গায় ঘুরতে লাগলো।]

সঙ্ঘ ঃ হায় হায়, একী হলো ? আমাদের চোখ কোথায় ? আমাদের দৃষ্টি কোথায় গেল ?

বৃদ্ধা ঃ (ছেঁড়া মুখোসগুলো হাতে নিয়ে) অ্যাঁ ?

সঙ্ঘ ঃ পিশাচী……দে, দে আমাদের চোখগুলো দে।

বৃদ্ধা ঃ অ্যাঁ ? আমি তো শুধু মুখোসগুলো ছিঁড়েছি।

সঙ্ঘ ঃ ওগুলো ছাড়া আমাদের নিজেদের কোনো দৃষ্টি নেই। দাও ফিরিয়ে আমাদের দর্শন সৌভাগ্য, দাও, দাও।

[তারা বৃদ্ধাকে আক্রমণ করতে তৈরী হতে লাগলো। বৃদ্ধা জালটা নিয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। তার পেছনে পেছনে তাদের চোখের জন্যে ভিক্ষা করতে করতে সঙ্ঘও যেতে লাগলো। এখন স্টেজে পাহারাদার মাত্র। সে ল্যাম্পপোস্টের আলো কমালো, ভেতরের গোলমাল চীৎকার সব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। ল্যাম্পপোস্টের অল্প আলো এখন স্টেজে দরকার।]

পাহারাদার ঃ (অনুকম্পাভরে মৃদু হেসে অন্যদিকে চলে যেতে যেতে)—অন্ধকে অন্ধ পথ দেখাচ্ছে। শূন্যতায় চোখ বন্ধ করে খেলা। অন্ধ নাটক ! (প্রতিমা-গুলির দিকে সোজা তাকিয়ে) সমুদ্রের আঘাত বন্ধ করার জন্যে প্রভুর রাখা কালো পাথরের মূর্তিগুলি 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—হ্যাঁ তাই, কিন্তু তাতেই বা ফল কী ? সমুদ্র এ প্রতিমাগুলোর ফাঁকের মধ্যে দিয়েই ঢুকে পড়ছে। বালিগুলো খসে খসে পড়ছে। অগাধ বিস্তৃত নীল সাগর—তার হাজার হাজার হাত দিয়ে তাদের খসিয়ে চলেছে। কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের মত...... বিস্মৃতিতে। বেচারী প্রতিমাগুলো ! খুঁটির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বেচারারা। মহাকাব্যের চরিত্রেরা......নিঃসহায় মূর্তিগুলি......(জোরে জোরে হাসতে লাগলো। তারপর নিজের আসা রাস্তায় আবার হাঁটতে হাটতে) —অনন্ত কোটি বালুকায় বাস করা ব্যর্থ আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি ! তোমাদের, নমস্কার। তীর আর সমুদ্রের মাঝে পাহারা দেওয়া নির্বিকার প্রতিমাগুলি, তোমাদের বন্দনা করি। (ওপরের দিকে দেখে) তরঙ্গের আর নক্ষত্রের প্রকাশের মধ্যে হে মহাগুরুদেব ! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

[হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্টেজ শূন্য......অস্পষ্ট আলো মাত্র। ঢেউগুলোর ওঠা-পড়ার শব্দ একটা তালের মত শোনা যেতে লাগল।]

শ্রীদেবী

এন. এন. পিল্লা

চরিত্র

পুরুষোত্তমন
শ্রীদেবী
প্রাগৈতিহাসিক মানব

কোট্টায়ম পাবলিক লাইব্রেরীতে বসে একদিন রঙীন ছবিওয়ালা একটি বই দেখছিলাম। বইটির নাম 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষ'। বইটি দেখতে দেখতে হঠাৎ বিদ্যুতের মত এই নাটকটির আইডিয়া মনের মধ্যে খেলে গেল। এই নাটকের অবতারণা করতে হ'লে এক্সপ্রেসানিস্ট প্রতীক ব্যবহার করতে হবে।

—এন. এন. পিল্লা

এন্. এন্. পিল্লার জন্ম 1918 সালে। নাট্যকলা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান লাভ করা শ্রীপিল্লার নাটকগুলি দর্শকদের কখনো ক্ষুব্ধ করে, কখনো রাগায়, কখনো হাসায়। তাঁর নাটকগুলি দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ না করে পারে না। নির্লিপ্ত মন নিয়ে দর্শকদের তাঁর নাটক দেখার সাধ্য নেই। তাঁর নিজের পরিবারের লোকদের নিয়ে গড়া একটি নাট্যসমিতির তিনি প্রেসিডেন্ট। 'প্রেতলোক' নামে তাঁর নাটকটি কেরলা সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছে। তিনি বারোখানি নাটক লিখেছেন, 'দুটি একাঙ্ক'। এই নাট্যসংগ্রহ থেকে 'শ্রীদেবী' একাঙ্ক নাটকটি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদেবী

[ভারী সুন্দর একটা বাড়ীর সম্মুখ ভাগ। স্টেজের একেবারে ডানদিকে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো সামনের দিকে এগিয়ে রাখা একটা খাট। তার ওপর তোষক। তোষকের ওপর শ্রীদেবী সোজা হয়ে শুয়ে আছে। তার মাথা সোজা দর্শকদের দিকে। সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী। হাতে একটা বড় বই খোলা অবস্থায় ধরা। রঙীন ছবিতে ভরা 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষ' নামে একটি বই। শ্রীদেবীর মনোযোগ বইতে। ভেতরে শোয়ার ঘরে শ্রীদেবীর স্বামী অসুস্থ পুরুষোত্তমন শুয়ে আছে। পুরুষোত্তমন পেটের অসুখ থেকে হাঁপানি আদি নানা রোগে জর্জরিত এক হতভাগ্য পুরুষ। সে ভেতর থেকে তার স্ত্রীকে ডাকছে।]

পুরুষোত্তমন ঃ শ্রীদেবী !

শ্রীদেবী ঃ কী ?

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি শোবে না ?

শ্রীদেবী ঃ আমি শুয়ে আছি।

পুরুষোত্তমন ঃ বাইরে ঐ ঠাণ্ডায় ?

শ্রীদেবী ঃ এখানে ঠাণ্ডা নেই।

পুরুষোত্তমন ঃ ঠাণ্ডা নেই ? এই ঘরের মধ্যেই আমি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি।

শ্রীদেবী ঃ তোমার শরীরটা ভালো নেই বলে ওরকম মনে হচ্ছে। আমায় একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না।

পুরুষোত্তমন ঃ ওঃ (নিস্তব্ধতা—আবার ডাক)—শ্রীদেবী !

শ্রীদেবী ঃ কী ?

পুরুষোত্তমন ঃ এসে শোও।

শ্রীদেবী ঃ আমি তো শুয়েই আছি।

পুরুষোত্তমন ঃ ওখানে শুতে হবে না। এখানে এসে শোও।

শ্রীদেবী ঃ আমার ঘুম আসছে না।

পুরুষোত্তমন ঃ আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়, ঘুম আসবে।

শ্রীদেবী ঃ তুমি ঘুমোও। আমার ভালো করে ঘুম এলে এসে শোবো।

পুরুষোত্তমন ঃ ওঃ।

[আবার নিস্তব্ধতা। শ্রীদেবী পাশ ফিরে হাতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুলো। হাতে ধরা বইটির ওপর আগের চেয়ে বেশী মনোযোগ। এখন শ্রীদেবীর মুখ দর্শকেরা বেশ ভালো করে দেখতে পাচ্ছে। এখন সে বই থেকে চোখ সরিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে। আবার ভেতর থেকে ডাক]

পুরুষোত্তমন ঃ শ্রীদেবী!

শ্রীদেবী ঃ কী?

পুরুষোত্তমন ঃ তাহ'লে আমি আসছি।

শ্রীদেবী ঃ না, তোমার আসার দরকার নেই। আবার হাঁপানির টান ধরবে। তুমি চাদরটা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়।

পুরুষোত্তমন ঃ আমারও ঘুম আসছে না।

[পুরুষোত্তমন বাইরে এল। শ্রীদেবী মুখ ফিরিয়ে দেখছে। পুরুষোত্তমনের গায়ে একটা সার্ট, লুঙ্গি, একটা সোয়েটার, গলায় একটা মাফলার।]

শ্রীদেবী ঃ তুমি সন্ধ্যেবেলায় কবিরাজী ওষুধ খেয়েছ। এখন তুমি পথ্যতে আছ। গিয়ে শুয়ে পড়। তিন মাস তোমায় পথ্য খেতে হবে।

পুরুষোত্তমন ঃ হুঁঃ! (শ্রীদেবীর খাটের কাছে গিয়ে একটা স্টুলে বসলো) আমার ঠাণ্ডা লাগবে, আমাকে ওষুধ খেতে হবে, পথ্য খেতে হবে, ঘুম না এলেও শুয়ে ঘুমোতে হবে।

শ্রীদেবী ঃ তোমার পেটের অসুখ, বাত, হাঁপানি......তারপর

পুরুষোত্তমন ঃ তারপর?

শ্রীদেবী ঃ তোমার শরীর বেশী নাড়াচাড়া করা উচিত না। তোমার খুব ঘুমোনো উচিত।

পুরুষোত্তমন ঃ তোমার ঠাণ্ডা নেই, ওষুধ খেতে হয় না, পথ্য নেই, শক্ত কোনো অসুখ নেই। তা সত্ত্বেও—

শ্রীদেবী ঃ তা সত্ত্বেও?

পুরুষোত্তমন ঃ তা সত্ত্বেও তোমার ঘুম আসছে না কেন? (উত্তর নেই) কেন ঘুম আসছে না তোমার?

শ্রীদেবী ঃ (একটুখানি চুপ হয়ে থেকে পরে দৃঢ়স্বরে) সেই জন্যেই ঘুম আসছে না।

[অপর দিকে হেলান দিয়ে শুলে—কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ]

পুরুষোত্তমন ঃ শ্রীদেবী !
শ্রীদেবী ঃ কী ?
পুরুষোত্তমন ঃ তুমি ওটা কী বই পড়ছ ?
শ্রীদেবী ঃ আমি পড়ছি না, ছবি দেখছি।
পুরুষোত্তমন ঃ সে আবার কী ?
শ্রীদেবী ঃ আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে—তাই না ?
পুরুষোত্তমন ঃ আরে ছিঃ (বইটা মনোযোগ দিয়ে দেখে) ওঃ ইংরিজীতে লেখা। তাহলেও তুমি একটু একটু তো বুঝতে পারছ।
শ্রীদেবী ঃ হুঁ ! ভালো করে বোঝার আগেই তুমি আমায় বিয়ে করে ফেলোনি ?
পুরুষোত্তমন ঃ তুমি কি তার জন্যে অনুতাপ করছ ?
শ্রীদেবী ঃ আমার অনুতাপ করা শেষ হয়ে গেছে।
পুরুষোত্তমন ঃ হুঁ ! কী বই এটা ? ও, হিসটোরিক ম্যান—প্রাগৈতিহাসিক মানুষ !
শ্রীদেবী ঃ (বইটা নিয়ে পাশ ফিরে আগের মতো উপুড় হয়ে শুয়ে হঠাৎ উত্তেজনা আর আবেগের সঙ্গে) দেখো, দেখো এখানে এটা কী রয়েছে ?
পুরুষোত্তমন ঃ পিতিক্যান ত্রোপাস এরকটস।
শ্রীদেবী ঃ মানে ?
পুরুষোত্তমন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে অসমর্থ আদিম মানুষ। পাঁচলক্ষ বছর আগে জাভায় বেঁচে থাকা, অর্ধমানুষদের গ্রুপে এরা পড়ে।
শ্রীদেবী ঃ (উত্তেজনায়) উঃ লোকটার স্বাস্থ্য দেখো। বুকের ছাতি দেখ। হাত পাগুলো দেখেছ ? ঘাড় দেখেছ ?
পুরুষোত্তমন ঃ ঐ ঘাড়ের ওপর মাথাটা দেখেছ ? ঐ মুখ বাঁদরের মুখ। মাথার ব্রেণ আমাদের ব্রেণের অর্ধেক।
শ্রীদেবী ঃ কিন্তু স্বাস্থ্য ? আমাদের দশগুণ। সব ঘাটতি এতেই মিটে যাবে।
পুরুষোত্তমন ঃ কিন্তু এটা একটা জানোয়ার।
শ্রীদেবী ঃ এই জানোয়ার থেকেই কি আমাদের বিকাশ হয়নি ?
পুরুষোত্তমন ঃ হুঁঃ।

[শ্রীদেবী আর একটা পাতা উল্টালো। আগের চেয়েও বেশী উত্তেজনায় উঠে বসল।]

শ্রীদেবী ঃ দেখ, দেখ, একটা পুরুষ, স্ত্রী আর বাচ্চা। এরা কারা ?
পুরুষোত্তমন ঃ ‘হমোনিয়্যান ডারতাল’ নামে এক জাতের মানুষ। এদের ইউরোপে দেখতে পাওয়া যেত।

শ্রীদেবী ঃ আগের লোকটার চেয়ে এদের বেশী ভালো দেখতে। তার চেয়ে ভালো স্বাস্থ্যও।

পুরুষোত্তমন ঃ কিন্তু এরা স্বল্পায়ু ছিল, বাঁচতো মাত্র পঞ্চাশ বছর।

শ্রীদেবী ঃ ওঃ আয়ু! এমন ভাবে কষ্ট করে টেনে-হিঁচড়ে একশ' বছর বেঁচে থাকার চেয়ে এই রকম পুরুষের মতো বেঁচে থেকে যখন খুশী মরা একটা জীবন।

পুরুষোত্তমন ঃ (রুক্ষভাবে স্ত্রীর দিকে চেয়ে) জীবন? হায়, হায় ওটা কী একটা জীবন নাকি শ্রীদেবী? ওতো বুনোপশুর জীবন!

শ্রীদেবী ঃ আমি তো খুব বেশী তফাৎ কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি না।

পুরুষোত্তমন ঃ দেখতে পাচ্ছ না? কাঁচা মাংস কচ্‌কচ করে খেয়ে, চান না করে, দাঁত না মেজে দুর্গন্ধময় জীবন।

শ্রীদেবী ঃ কাঁচা মাংস হয়তো তাদের রোস্ট করা বা রান্না করা মাংসের চেয়ে বেশী সুস্বাদু লাগতো। আর আমাদের গা থেকেও কি দুর্গন্ধ বেরোয় না? জ্বরের পর তুমি যখন ঘাম তখন কী দুর্গন্ধই না বেরোয়; স্বাস্থ্যবান মানুষের গন্ধই মানুষের ভালো লাগে।

পুরুষোত্তমন ঃ স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য! তোমার দেখছি এই কথাটা খুবই পছন্দের।

শ্রীদেবী ঃ শুধু পছন্দ নয়, ঐ কথাটা জীবনের একটা আশীর্বাদ।

পুরুষোত্তমন ঃ (অধৈর্য হয়ে) হুঁঃ! পাতা ওল্টাও।

[শ্রীদেবী পাতা উল্‌টিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল]

শ্রীদেবী ঃ দেখো, দেখো আর একরকমের মানুষ। উঃ কী সৌন্দর্য! দেখ, দেখ এর মুখটা দেখ। লম্বা নাক, বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল, চওড়া বুক—এ কে?

পুরুষোত্তমন ঃ 'ক্রোমাননি' এই জাতের মানুষ।

শ্রীদেবী ঃ ওরও স্ত্রী, ছেলেমেয়ে রয়েছে।

পুরুষোত্তমন ঃ ওটা স্ত্রী নয়, একটা মেয়ে।

শ্রীদেবী ঃ হ্যাঁ, ঐ মেয়েটাই তো ওর স্ত্রী।

পুরুষোত্তমন ঃ তখনকার যুগে বিয়ের চলন ছিল না।

শ্রীদেবী ঃ ঐ বাচ্চাটা তাহ'লে?

পুরুষোত্তমন ঃ ঐ বাচ্চাটার জন্ম দিয়েছে ঐ মেয়েটা।

শ্রীদেবী ঃ তা সত্বেও ঐ মেয়েটা ঐ বাচ্চাটার স্ত্রী নয়, ওর বিয়ে হয়নি বলে বলছ। বিয়ের পূর্ণতা সন্তানের জন্মে—স্ত্রীত্বের পরিপূর্ণতা।

পুরুষোত্তমন ঃ শোনো, তখনকার দিনে বিয়ে না হয়েই ছেলেমেয়ে জন্মাতো।

শ্রীদেবী ঃ আজকাল বিয়ের পরও ছেলেমেয়ে জন্মায় না।

পুরুষোত্তমন : এটা বুঝি আমাকে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীদেবী : বই লেখ, তুমি বুঝি ঝগড়া আরম্ভ করতে চাও?

পুরুষোত্তমন : হুঁ! তুমি তাহলে বিয়ে জিনিষটার ওপর খুব প্রাধান্য দাও না?

শ্রীদেবী : আমি কি তাই বলেছি?

পুরুষোত্তমন : (চিন্তামগ্নভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) না, তুমি বলোনি। কিন্তু না বলেও স্পষ্টভাবে বলেছ।

শ্রীদেবী : তোমার ঐ রকম মনে হয়েছে।

পুরুষোত্তমন : না; এটা সত্যি। তোমার মধ্যে আমি এখন অনেক নতুন নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

শ্রীদেবী : আমার কোনো পরিবর্তনই হয়নি। সেদিন যা ছিলাম, আজও আমি তাই আছি।

পুরুষোত্তমন : সেটা কী?

শ্রীদেবী : একটি মেয়ে।

পুরুষোত্তমন : ঐ জংলী মেয়েটার মতো?

শ্রীদেবী : হ্যাঁ, এর মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

পুরুষোত্তমন : কোনো তফাৎই নেই বুঝি?

শ্রীদেবী : হ্যাঁ আছে, একটা তফাৎ আছে। ওর যা আছে তার কিছু কিছু আমার নেই।

পুরুষোত্তমন : (চীৎকার করে) শ্রীদেবী!

শ্রীদেবী : (নির্বিকারভাবে) তোমার শরীরটা ভালো নেই বলে তোমার মিছিমিছি রাগ হচ্ছে।

পুরুষোত্তমন : আমার সে রকম কিছু একটা শক্ত অসুখ হয়নি।

শ্রীদেবী : হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি তোমার অসুখ শক্ত নয়। এখন ঐ লাল বড়িটা খেয়ে শুয়ে পড়ো গিয়ে।

পুরুষোত্তমন : আমি এখন শোব না (একটু এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে হঠাৎ ফিরে) শ্রীদেবী! বইয়েতে দেখা জন্তুগুলোর চেয়ে আজ মানুষকে বড় করে তুলেছে কী জিনিস জানো?

শ্রীদেবী : সময়।

পুরুষোত্তমন : শুধু সময় নয়—শাশ্বত কতকগুলো সাংসারিক মূল্যবোধ।

শ্রীদেবী : শাশ্বত? তাহলে এসব সেদিনও ছিল।

পুরুষোত্তমন : না, সেদিন ছিল না। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কালের নিয়মানুসারে তারা গড়ে উঠেছে।

শ্রীদেবী ঃ গড়ে উঠেছে! তাহলে শাশ্বত নয়? সময় অনুযায়ী তারা গড়ে উঠেছে?

পুরুষোত্তমন ঃ বেশ তাইই ধরে নাও, একটা সমাজের অস্তিত্বের জন্যে এটার দরকার।

শ্রীদেবী ঃ তাহ'লে এইসব বন্যজাতির এসব কিছুই ছিল না?

পুরুষোত্তমন ঃ হ্যাঁ, তাই তো তারা সব শেষ হয়ে আজ শুধু নামে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে।

শ্রীদেবী ঃ কোথায় শেষ হয়েছে? এদের থেকেই তো আমরা এসেছি—তাই না?

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি কী বলতে চাইছ?

শ্রীদেবী ঃ আমি বলতে চাইছি যে এই বন্য মানুষগুলো শেষ হয়ে যায়নি। ওরাই আমাদের মধ্যে নতুন রূপ নিয়েছে। বিয়ে না হয়ে বাচ্চার জন্ম দেওয়া এই ঠাকুমাদের থেকেই আজ বিবাহিতা কিন্তু বাচ্চার জন্ম না দেওয়া আমি হয়েছি।

পুরুষোত্তমন ঃ শ্রীদেবী! (ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার)

শ্রীদেবী ঃ কী?

পুরুষোত্তমন ঃ তোমার এতটুকু নৈতিকতা নেই?

শ্রীদেবী ঃ কেন?

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পবিত্রতা সম্বন্ধে কিছুই জানো না। (শ্রীদেবী হাসতে শুরু করলো)—কী, হাসছ যে?

শ্রীদেবী ঃ তোমার এই অর্থহীন কথাগুলো শুনে হাসছি।

পুরুষোত্তমন ঃ অর্থহীন? শ্রীদেবী, তুমি দেখছি এখনো মনে মনে সেই প্রস্তর যুগে বাস করছ। শিলাবতীর মত।

শ্রীদেবী ঃ শিলাবতী?

পুরুষোত্তমন ঃ কেন সে গল্প তুমি শোনোনি? তুমি শিলাবতীর গল্প পড়োনি?

শ্রীদেবী ঃ পড়েছি।

পুরুষোত্তমন ঃ পড়ে কী বুঝেছ?

শ্রীদেবী ঃ ওটা লিখেছে একজন পুরুষ।

পুরুষোত্তমন ঃ তাই তার কোনো মূল্য নেই?

শ্রীদেবী ঃ মেয়েদের দিক থেকে দেখলে তার বিশেষ কিছু মূল্য নেই বলেই মনে হয়।

পুরুষোত্তমন ঃ এইটাই তোমার মনের কথা—তাই নয় কি?

শ্রীদেবী ঃ সব স্ত্রীলোকেরই মনের কথা এই। তোমরা শিলাবতী জোরে জোরে পড়লে আমরা মাথা নাড়ি। সে শুধু তোমাদের খুশী করার জন্যে।

পুরুষোত্তমন ঃ আমাদের খুশী করার জন্যে?

শ্রীদেবী ঃ হ্যাঁ এইরকম মাথা নাড়ার চুক্তির নাম বিয়ে।

পুরুষোত্তমন ঃ তাই নাকি ? তাহ'লে আমাদের বিয়ের আগে বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীদেবী ঃ আমাকে এসব কিছু জিজ্ঞেস না করেই কি তুমি আমাকে বিয়ে করোনি ?

পুরুষোত্তমন ঃ তা ঠিক। (খুব উদ্বেগের সঙ্গে পুরুষোত্তমন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। শ্রীদেবী আবার বই খুলে দেখতে দেখতে নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে পড়লো। হঠাৎ ফিরে)—শ্রীদেবী !

শ্রীদেবী ঃ কী ?

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি কি ছবি দেখছ নাকি ?

শ্রীদেবী ঃ হ্যাঁ।

পুরুষোত্তমন ঃ না, তুমি ছবি দেখছ না।

শ্রীদেবী ঃ তাহ'লে কী করছি আমি ?

[উঠলো]

পুরুষোত্তমন ঃ কী করছ তুমি ? তুমি ব্যভিচার করছ। তুলি মনে মনে ঐ বন্য জন্তুকে, ঐ কাঁচা আদিম মানুষকে……

শ্রীদেবী ঃ (স্বপ্নের ঘোরে) বাস্তব জীবনে পচে যাওয়া মানুষের চেয়ে মনে মনে একজন কাঁচা পুরুষকে ভাবতে মেয়েদের ভালোই লাগে।

[এই জানোয়ার—বলে চীৎকার করে পুরুষোত্তমন শ্রীদেবীর গালে চড় মারতে গেল। শ্রীদেবী বইটা দিয়ে তাকে আটকাতে গেল। তার সামনে জলজল করা ঐ ছবিটার দিকে তাকিয়ে পুরুষোত্তমন বুকে হঠ্যাৎ একটা ব্যথা অনুভব করলো। বাঁহাতে বইটা ধরে, ডান হাতে চেপে কাশতে লাগলো।]

শ্রীদেবী ঃ (বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ঠাট্টা করে)—মারারও শক্তি নেই। সত্যি বড়ই দুঃখের কথা। প্রচণ্ড বলবান একটা লোককে মেরে ফেলে সেই মৃতদেহ কাঁধে তুলে চীৎকার করে ছুটে পালিয়ে যাওয়া এই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাল্পনিক ছবিকে পর্যন্ত তুমি ঈর্ষা করছ।

['আঃ' বলে একটা করুণ সুরে পুরুষোত্তমন মাথা তুলল। জোরে জোরে বাজনা একটা ঝড়ের প্রতীক তৈরী করছে। দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। নেপথ্য থেকে একটা গান অশরীরির মতো শোনা যাচ্ছে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে এলো।]

কোটি বছরের গর্জনে
বইছে জীবন লাভার আগুন নদীতে—
পৃথিবীর মাটিতে নতুন শেকড়ে
মরুভূমিতে আজ নতুন বাগিচা।
স্বর্গের দরজার পথে তারারা
জ্বালায় রাত আর দিনের রংমশাল—
ছায়াপথে কার গান ভাসে।

[রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হল। একই দৃশ্য—শুধু পটভূমিকা যুগযুগান্তর আগেকার একটা বন্যগুহায় পরিবর্তিত হয়েছে। একটি পুরুষ ও স্ত্রী সেই একই জায়গায় খাটেতে অর্ধোরোধাবস্থায় বসে আছে। নেপথ্যে বন্যজীবনকে প্রতিফলিত করার জন্যে শব্দ, কোলাহল, চীৎকার, গণ্ডগোল। একটা ভয়াবহ প্রাণীকে দেখে ভয় পেয়ে একজন অর্ধমানুষ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আবার চীৎকার গর্জন। তারপর আওয়াজ একটু একটু কমতে লাগলো। একটা মানুষের অবয়ব আস্তে আস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। নগ্নতা ঢাকার জন্য কোমরে তার একটু পাতার আবরণ। সেই মানুষটা রক্ত চুঁইয়ে পড়া একটা বড় মাংসের টুকরো চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। যুগযুগ ধরে তার হৃদয়ে কিছু কিছু ক্রমবিকাশ হয়েছে—তার মুকাভিনয় দেখাতে হবে। তারজন্যে কথাকলি অথবা অন্য কোনো প্রতীক ব্যবহার করা চলবে না। উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসের আঙ্গিক ভাষা শুধু ব্যবহার করতে হবে। নীচে দেওয়া কবিতাগুলি পটভূমিকায় গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠস্বরে গাওয়া হচ্ছে। কবিতার মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রকৃতিকে ছবি দেওয়া হচ্ছে তা রঙ্গমঞ্চে দেখানো হচ্ছে। এই কবিতার ভাব দর্শকদের কাছে পরিষ্কার হবার জন্যে দু'তিনবার গাওয়া হবে।]

মেঘ গর্জন করছে বৃষ্টিপাত প্রবল ধারায়
পাথরের দেয়াল ভেঙে
নেমে আসছে ঝর্ণা
সমুদ্রের লোলুপ হাসিতে—
ঝড়ে দোলে বনভূমি
আগ্নেয়গিরির শিখা জ্বালায় আকাশে।

প্রাচীন বৃক্ষের মাঝে, পর্বতের কন্দরে
আদিম মানব কাঁপে গভীর শতিকায়।
সেই ভয়ে অর্ঘ দেয় সকল সম্পদ—
বন দেবতার কাছে চায় বরাভয়।

[দৃশ্য বদলে গেছে, আবার সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগের দৃশ্য। শ্রীদেবীর স্বামী তার আগের জায়গাতেই বসে আছে। এখানে ওখানে দুটো তিনটে বড় বড় পাথর। ভীমাকৃতি প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এক কোণে বসে কোনো একটা বন্য জন্তুর হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে। কাছেই প্রাগৈতিহাসিক মানবী সেই আহারের দিকে লোলুপ দৃষ্টিত চেয়ে আছে। তাদের দেহ ঢাকার জন্যে শুধু কিছু পাতার আবরণ। খাবার লোভে সেই বন্য মানবী পুরুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ক্রুদ্ধ গর্জন করে সেই বাড়ানো হাত সরিয়ে দিয়ে পুরুষ আবার হাড় চিবোতে লাগল। তার পেট ভর্তি হলে হাতের উচ্ছিষ্ট সে মানবীর দিকে ছুঁড়ে দিল। মানবী ঘসটে ঘসটে এসে তা তুলে নিয়ে চিবোতে আরম্ভ করলো। মানুষটি তার হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলো। এই সময়ে আর একটি দীর্ঘকায় মানুষ আস্তে আস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো—একটি সুন্দর যুবক। সে আস্তে আস্তে সেই মানবীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার ঐ মানবীকে চাই। মানবীরও ঐ পুরুষটিকে চাই। কিন্তু ঐ শুয়ে থাকা মানুষটাকে ভয়। শেষে ভেবে ভেবে সে মানবীর কাছে এসে বসলো। ততক্ষণে সেই ভীমকায় আদিমানব জেগে গেছে। সে বিদ্যুতের মত লাফ দিয়ে উঠলো। দুজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। শেষে ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন যুবক ছুটে পালাতে লাগলো। কিন্তু একটা পাথরে ঠোক্কর খাওয়াতে সে পড়ে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে পালালো। জেতা সেই আদিম মানব এগিয়ে গিয়ে সেই মানবীটির মাথায় এক ঘা দিল। মানবীটি আর্তনাদ করে উঠলো। সেই ভীমাকৃতি মানুষটি আবার তার জায়গায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। সেই দীর্ঘকায় যুবকটি আবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো। তার হাতে বিরাট একটা পাথর। সে সেই বিরাট পাথরটা দিয়ে সেই ভীমাকৃতি মানবটির মাথায় আঘাত করলো। একটা চীৎকার—মাথাটা দু

ফাঁক হয়ে গেছে। যুবকটি চরিতার্থ হ'ল। সে মানবীটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বন্য ভালোবাসা দেখাতে লাগলো।]

নেপথ্যে—

জংলী মেয়ে আয় আয়
পাহাড় চূড়ায় যাই
জংলী ফুল আর মধু সেখানে
বাড়িয়ে দিয়ে হাত
দাঁড়িয়ে আছে আকাশ।

[দূরে একটা কোকিলের কূজন-ধ্বনি কূ……কূ……দুজনেই এই কূজন-ধ্বনি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আবার সেই কূজন। আদিম মানব আর মানবী খুব আগ্রহের সঙ্গে সেই শব্দের অনুকরণ করতে লাগলো। একটা গান হচ্ছে। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে তাল রেখে একটা তাণ্ডব নৃত্য করতে আরম্ভ করলো। কাছেই পাথরের ওসব শুইয়ে রাখা একটা বাচ্চার ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেলো। চমকে উঠে বন্য মানবী হাত দিয়ে শিশুর দিকে দেখালো।]

বন্যমানবী ঃ অ্যাঁ……ওটা……

বন্যমানব ঃ অ্যাঁ……কী?

[ঐ প্রশ্ন আর উত্তর ভাষার জন্মের সূচনা। মানব ভেতরে দৌড়লো, পেছনে পেছনে সেই বন্যমানবী। চীৎকার—ক্রন্দন। বাচ্চাকে বাঘে নিয়ে গেছে। আবার তারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো।]

স্ত্রী ঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে) বাচ্চা……বাঘ……নিয়ে গেছে।

পুরুষ ঃ যাক্‌গে, আবার বাচ্চা হবে।

[সে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে দিল এক ছুট।]

[ব্যাকগ্রাউণ্ডে সঙ্গীতের উচ্চ শব্দ। রঙ্গমঞ্চ আবার অন্ধকার হয়ে গেল। আবার আলোকিত হলো। জঙ্গল, বন্যমানব, মানবী কেউ নেই। শ্রীদেবীর ঘর। শ্রীদেবী আর পুরুষোত্তমন দিবাস্বপ্ন দেখার মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। একটু পরে]

পুরুষোত্তমন ঃ শ্রীদেবী!

শ্রীদেবী ঃ অ্যাঁ।

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি আর আমি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত, মার্জিত স্বামী-স্ত্রী। দশলক্ষ বছর আগেকার ঐ বন্য জীব আমরা নই।

['বাইরে' অশরীরী একটা শব্দ শুনে দুজনেই চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালো। আগের দৃশ্যের দেখা সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নেপথ্য থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে বিংশ শতাব্দীর সেই সভ্য ঘরে। পুরুষোত্তমন ভয়বিহ্বল চিত্তে তাকিয়ে আছে। শ্রীদেবী এক দিব্য অনুভূতির সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে। মানুষটি স্টেজের সামনে এসে দাঁড়ালো।]

পুরুষোত্তমন ঃ বাইরে?

প্রাগৈতিহাসিক মানব ঃ হ্যাঁ, বাইরে।

পুরুষোত্তমন ঃ ভেতরে?

প্রাগৈতিহাসিক মানব ঃ আমি।

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি?

প্রাগৈতিহাসিক মানব ঃ হ্যাঁ আমি। (পুরুষোত্তমনের দিকে হাত দেখিয়ে) তোমার ঐ পচা চামড়ার নীচে কাঁচা তাজা এই আমি ঘুমিয়ে আছি।

পুরুষোত্তমন ঃ তাহ'লে আমি?

প্রাগৈতিহাসিক মানব ঃ একটা অভিনয়। রঙ মাখানো একটা ঢাকা মাত্র।

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি একটা জানোয়ার।

প্রাগৈতিহাসিক মানব ঃ আমার চামড়াটা বদলালেই তুমি হয়ে যাবে।

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি কোত্থেকে এলে?

প্রাগৈতিহাসিক মানব ঃ তোমার থেকে।

পুরুষোত্তমন ঃ আমার থেকে? আমার ঘেন্না হচ্ছে।

মানব ঃ তোমার ঘেন্না হচ্ছে?

পুরুষোত্তমন ঃ হ্যাঁ।

মানব ঃ তুমি নিজেকেই নিজে ঘেন্না করছ।

পুরুষোত্তমন ঃ আমি নিজেকে নিজে?

মানব ঃ হ্যাঁ—দূর থেকে দেখলে পর।

পুরুষোত্তমন ঃ (আশ্চর্য হয়ে) সত্যি! এই শ্রীদেবী।

শ্রীদেবী ঃ কী?

পুরুষোত্তমন ঃ দেখ, দেখ এই বন্য মানুষটা আমি, আমি।

শ্রীদেবী ঃ (আস্তে আস্তে যেন স্বপ্নের ঘোরে উঠে দাঁড়াতে লাগলো)—তাই নাকি ? (হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো) —তাই নাকি ? (বন্য মানবের দিকে এগিয়ে গেল)

পুরুষোত্তমন ঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে) শ্রীদেবী !

শ্রীদেবী ঃ আমায় ডেকো না (সেই আদিম মানুষের আপাদমস্তক দেখতে লাগলো ।)

মানব ঃ (প্রবল উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনার সঙ্গে) তুমি আমাকে চেন ?

শ্রীদেবী ঃ তোমাকেই শুধু চিনি ।

মানব ঃ কী করে চিনলে ?

শ্রীদেবী ঃ তোমার সব লক্ষণগুলো দেখে । ঐ হাত—লোহার মত শক্ত (বাহু ধরলো, মাংসপেশীগুলোতে হাত বুলোতে লাগলো ।) ঐ বুক—পাথরের মত শক্ত (বুকে আস্তে আস্তে টোকা মারতে লাগলো)—ঐ পা । কী অদ্ভুত শক্তি । (পায়ের মাংশপেশীগুলো টেনে টেনে দেখতে লাগলো । এইসব দেখে পুরুষোত্তমন নায়ার)—ছিঃ উঃ উঃ ! শ্রীদেবী, এইসব—(বলে অসহ্য কষ্ট সহ্য না করতে পেরে আর্তনাদ করতে লাগলো ।)

মানব ঃ আমার নাম ?

শ্রীদেবী ঃ পুরুষোত্তমন ।

পুরুষোত্তমন ঃ (বাধা দিয়ে) ওটা আমার নাম—পুরুষোত্তমন নায়ার ।

মানব ঃ আমি পুরুষ, তুমি নায়ার ।

শ্রীদেবী ঃ আমার নাম জানো ?

মানব ঃ স্ত্রী ।

পুরুষোত্তমন ঃ শ্রীদেবী, শ্রীমতী পুরুষোত্তমন নায়ার ।

শ্রীদেবী ঃ উনি যা বলছেন শুনো না । ওনার শরীর ভালো না, ওনার ক্ষয় রোগ ।

পুরুষোত্তমন ঃ ওর মাথার ঠিক নেই । পাগল ।

মানব ঃ আমার শরীরও ভালো, মাথারও কোনো গোলমাল নেই ।

শ্রীদেবী ঃ আমাকে নেবে ? কোলে তুলে নেবে ? এই একটু আগে ঐ মেয়েটাকে যেমন নিয়েছিলে ?

মানব ঃ নেবো ।

পুরুষোত্তমন ঃ ওকে স্পর্শ ক'রো না ।

মানব ঃ (যেন একটা মজার কথা শুনছে এমনি ভাবে)—তাহ'লে তুমি নাও।

(পুরুষোত্তমন এগিয়ে গেল কিন্তু ভীষণ ভাবে কাশতে লাগলো ।)

—(অবহেলা ভরে)—তুমি ওকে তুলতে পারবে না, কিন্তু আমি পারবো। (শ্রীদেবীকে কোলে তুলে নিল। পুরুযোত্তমন 'পাজী বদমাইশ' বলে চীৎকার করে উঠলো। তার সমস্ত চেহারা বীভৎস হয়ে উঠলো।)

শ্রীদেবী : (হাঁপাতে হাঁপাতে) আমাকে নিয়ে যাও ·····দূরে······দূরে······ অনেক দূরে······বাইরে······যুগযুগান্তরে······সেই অরণ্যের মধ্যে।

[আদিম মানব শ্রীদেবীকে নিয়ে চললো। পুরুষোত্তমন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনে লাফ দিল কিন্তু পা ফসকে পড়ে গেল। আদি মানব শ্রীদেবীকে নিয়ে দৌড়োলো। তারপর তাকে খাটে এনে শুইয়ে দিল। দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। স্পট্ লাইট দেখা গেল, পুরুষোত্তমন হাঁপাতে হাঁপাতে 'শ্রীদেবী তোমায় আমি খুন করবো'—বলে চীৎকার করে খাটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল। ছায়ার মতো বন্য-মানব অদৃশ্য হয়ে গেল। পুরুষোত্তমন 'শ্রী···দে···বী' বলে আর্তনাদ করে উঠলো। দৃশ্য আলোকিত হয়ে উঠছে। শ্রীদেবী চমকে উঠে পড়লো। মেঝেতে পড়ে থাকা স্বামীকে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে এসে 'ও মাগো—কী হ'লো তোমার'—বলে তাকে ধরে উঠোতে চেষ্টা করলো। তারপর আস্তে আস্তে ধরে খাটে নিয়ে গিয়ে বসালো।]

শ্রীদেবী : কী হয়েছে তোমার ?

পুরুষোত্তমন : মাথাটা ঘুরে গেল।

শ্রীদেবী : আমি তোমাকে কতবার বললাম না। শরীর ভালো নেই, তখন এমনি করে কি······

পুরুষোত্তমন : ঘুমোতে পারবো না। শ্রীদেবী আমাদের কত দিন হ'লো বিয়ে হয়েছে ?

শ্রীদেবী : তিন বছর।

পুরুষোত্তমন : আমি কতদিন ধরে এরকম অসুস্থ ?

শ্রীদেবী : আমি ঠিক জানি না।

পুরুষোত্তমন : ঠিক আছে। তুমি জানো না, আমিও জানি না, কিন্তু আমি এখন নিত্যরোগী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। আমার······আমার······তোমাকে বিয়ে না করাই উচিত ছিল।

শ্রীদেবী : সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন তাই নিয়ে আর বলে কী হবে।

পুরুষোত্তমন : ঠিক। এখন তাই নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই। অন্য কিছু নিয়ে বলার দরকার শ্রীদেবী। তুমি আমার আন্তরিক একটা প্রার্থনা রাখবে ?

শ্রীদেবী : কী ?

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি শুনবে তো?

শ্রীদেবী ঃ শুনবো।

পুরুষোত্তমন ঃ তুমি আমায় ত্যাগ করে আর একবার বিবাহ করো। কী, চুপ করে আছ যে?

শ্রীদেবী ঃ কী বলবো?

পুরুষোত্তমন ঃ না, কিছু বলতে হবে......অন্তত! একবার তুমি তোমার হৃদয় খুলে আমাকে সত্যি কথা বলো।

শ্রীদেবী ঃ (নির্নিমেষে চেয়ে) বলবো?

পুরুষোত্তমন ঃ হ্যাঁ।

শ্রীদেবী ঃ তোমার মৃত্যুর পর এ নিয়ে আমি ভেবে দেখবো।

পুরুষোত্তমন ঃ হুঁ! (প্রেতের মত বসে রইল।)

শ্রীদেবী ঃ ওষুধটা খেয়ে ঘুমোও।

পুরুষোত্তমন ঃ ওষুধটা নিয়ে এসো। কাল আমি যে ওষুধটা নিয়ে এসেছি সেই নতুন ওষুধটা। আলমারির নীচের তাকের এককোণে রেখে দিয়েছি, সবুজ বোতল।

শ্রীদেবী ঃ এটা কি ভালো ওষুধ নাকি?

পুরুষোত্তমন ঃ হ্যাঁ। (আস্তে)—আমায় মরতে হবে।

[শ্রীদেবী ভেতরে গেল। পুরুষোত্তমন নিশ্চল হয়ে বসে রইল]

নবজীবন প্রেস, কলিকাতা-700 006 দ্বারা মুদ্রিত।